পুণ্যস্মৃতি

পুণ্যস্মৃতি

সীতা দেবী

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলকাতা

চিত্রসূচী

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি, গ্রন্থনাম ও লেখিকার নাম সত্যজিৎ রায়-কর্তৃক অঙ্কিত ও শ্রীসন্দীপ রায়ের সৌজন্যে এই গ্রন্থে মুদ্রিত।

শান্তিনিকেতনে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও সি. এফ. অ্যান্ড্রুজ-সহ রবীন্দ্রনাথের চিত্র শম্ভু সাহা-কর্তৃক গৃহীত ও তাঁহার সৌজন্যে মুদ্রিত।

সন্তোষচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের চিত্র তাঁহার পুত্র সুকৃৎচন্দ্র মজুমদারের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

আশুতোষ চৌধুরী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সহ গৃহীত চিত্র শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র সুহাসচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সংগ্রহ হইতে প্রাপ্ত।

পার্থিব জীবনের ভিতর আমরা নিত্য বলিয়া কি জানি? দিনের শেষে রাত্রি আসে, আবার পরদিন ভোরে সূর্যোদয় হয়। বায়ু নিত্য প্রবাহিত। আলোর ধারা কোথাও অন্ধকারের ভিতর নিঃশেষ হইয়া যায় না। আকাশ মেঘে ঢাকে, কিন্তু জানি তাহার আড়ালে নিত্যকার সূর্য তেমনি জ্যোতির্ময়রূপে বিরাজ করিতেছে। হতভাগ্যতম যে মানুষ সেও এই অমরজ্যোতিকে সমস্ত অনুভূতি দিয়া গ্রহণ করে, এ সান্ত্বনা তাহার কেহ হরণ করিতে পারে না।

তেমনি এই হতভাগ্য বাংলাদেশে জন্মিয়া যখন প্রথম চৈতন্যলোকে স্থান পাইলাম তখন এই আকাশের সূর্যেরই মতো নিত্য অক্ষয় অমর বলিয়া এক জ্যোতির্ময় মহাপুরুষকে জানিয়াছিলাম। আজ বিশ্বাস করিতে পারি না তিনি নাই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাহিরেই তিনি আছেন ইহা মনে করিয়াও সান্ত্বনা পাই না। নশ্বর জীবনের শেষ আছে, মানুষমাত্রেই মরজগতের বন্ধন ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাইবে, ইহা তো বুদ্ধি দিয়া বুঝি, কিন্তু তাঁহাকে সাধারণ নশ্বর মানুষ কোনোদিন ভাবিতে পারি নাই বলিয়াই সমস্ত অস্তিত্ব তাঁহার মৃত্যুকে অস্বীকার করে। আশি বৎসর মানুষের জীবনে দীর্ঘকাল বটে, কিন্তু অনন্তকালের তুলনায় তাহা কতটুকু? যাঁহাকে রূপ দিতে এত যুগ লাগিল, তাঁহাকে এই সামান্য এতটুকু সময়ের মধ্যেই বিধাতা কেন হরণ করিয়া লইয়া গেলেন? সৃষ্টির কোন্ গূঢ় উদ্দেশ্য ইহাতে সাধিত হইল, তাহা বুঝা আমাদের সাধ্যের অতীত।

এই দরিদ্র দেশের তিনি যে কি ছিলেন, তাহা তো ভাষায় বলিয়া বুঝানো যায় না। একাধারে তিনি ইহার স্রষ্টা, পাতা ও আনন্দধন ছিলেন। পিতার ন্যায় শাসন করিয়াছেন, মাতার ন্যায় স্নেহ দিয়াছেন, প্রেমিকের মতো ভালোবাসিয়াছেন। তাই বাংলাদেশ আজ অনাথ, ইহার মাথার মুকুট ভাঙিয়া পড়িয়াছে, ইহার দৈন্য আড়াল করিয়া যে জ্যোতির্ময় বিরাট পুরুষ দাঁড়াইয়া ছিলেন, মহাকাল তাঁহাকে হরণ করিলেন। আজ দেশের নগ্নতা দীনতা বিশ্বের নিকট উদ্‌ঘাটিত।

মানুষের আত্মা অমর, তাহার বিনাশ নাই, ইহা তো বিশ্বাস করি। কিন্তু তাহাতে আজ সান্ত্বনা পাই কই? সেই দেবোপম মূর্তি, সেই শুভ্র হাস্য, আয়তনেত্রের সেই প্রদীপ্ত দৃষ্টি, অন্তরে তো চির-উজ্জ্বল হইয়া জাগিয়া আছে। কিন্তু বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের আর কোথাও কি তাহারা নাই? একেবারে হারাইয়া গিয়াছে? বিশ্ববিধাতা এতই কি নিরাসক্ত যে এমন অকল্পনীয় সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়া তাহা একেবারে বিলুপ্তির ভিতর মিলাইয়া যাইতে দিবেন? বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।

ভাবী কালের মানুষ তাঁহাকে কিভাবে স্মরণ করিবে জানি না। হয়তো বুদ্ধদেব, খৃস্ট বা শ্রীচৈতন্যের ন্যায় তাঁহার মানবতা লুপ্ত হইয়া যাইবে, তিনি দেবতার মূর্তি ধরিবেন। কিন্তু এ চিন্তাও আমাদের সান্ত্বনা দেয় না। আমরা যে তাঁহাকে মানুষ রূপেই জানিয়াছিলাম,

পরমাত্মীয়ের মতো জানিয়াছিলাম। অথচ শুধু মানুষও ভাবিতে পারি নাই। আত্মীয়ের সঙ্গে যে যোগসূত্র, তাহা রক্তের বন্ধন ও অভ্যাসের বন্ধন দিয়া গঠিত, সেভাবে আত্মীয় তিনি ছিলেন না। তবু আজ তাঁহার বিদায়ের ব্যথা সাধারণ বিচ্ছেদ-দুঃখের অপেক্ষা এত গভীর, এত ভয়ানক কেন? শুধু মানুষ রবীন্দ্রনাথ তো চলিয়া গেলেন না, যেন এই হতভাগ্য দেশ হইতে বিধাতার আশীর্বাদ অবলুপ্ত হইয়া গেল।

ভাদ্র ১৩৪৮

পু ণ্য স্মৃ তি

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চাক্ষুষ প্রথম পরিচয় আমার যখন হয়, তখন আমার বয়স চার-পাঁচ বৎসরের বেশি হইবে না। আমরা তখন এলাহাবাদে বাস করিতাম। তখনকার সিভিল লাইনসে সাউথ রোড বলিয়া এক রাস্তার উপর একটি বাংলো-বাড়িতে আমরা ছিলাম। বিকালবেলা বাড়ির ভিতরের উঠানে খেলা করিতেছি, বাবা তখন সবেমাত্র কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় আমাদের 'মহারাজ' (পাচক ব্রাহ্মণ) ছুটিয়া আসিয়া তাহার দেহাতি হিন্দিতে মহাব্যস্তভাবে খবর দিল যে, বাহিরে দুইজন রাজা আসিয়াছেন। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহাদের কোথায় বসানো হইয়াছে ; মহারাজ বলিল, সে তাঁহাদের নিজের খাটিয়া পাতিয়া বসাইয়া রাখিয়া আসিয়াছে। বাবা ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া গেলেন, আমিও তাঁহার পিছন পিছন রাজা দেখিবার আগ্রহে ছুটিয়া গেলাম। উপকথার রাজা ও রাজপুত্রদের অলোকসামান্য রূপের বর্ণনা অনেক শুনিয়াছিলাম। রাজার চেহারা কেমন হয়, কল্পনায় তাহার একটা ছবিও ছিল। কিন্তু অভ্যাগত দুইজনের চেহারা দেখিয়া অবাক হইয়া ভাবিলাম, রাজারা যে এত সুন্দর হয় তাহা জানা ছিল না। সত্যই আমাদের বুদ্ধিমান মহারাজের দড়ি-ছাওয়া খাটিয়ার উপরেই তাঁহারা বসিয়া ছিলেন। একজনের পরিচ্ছদ কালো এবং অন্যজনের ধূসর। দুইজনই মাথায় ইরানি পাগড়ি পরিয়া আসিয়াছিলেন। অল্পক্ষণই তাঁহারা ছিলেন।

তাঁহারা চলিয়া যাইবার পর বাবা আমাদের বলিয়া দিলেন যে, কালো-পোশাক-পরা যিনি তিনিই রবীন্দ্রনাথ ও ধূসর-পোশাক-পরা ভদ্রলোক তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ।

বাল্যকাল এলাহাবাদেই কাটিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে বাঙালি হইতে বাধে নাই। বাংলা সাহিত্যের স্বাদ অতি অল্প বয়সেই পাইয়াছিলাম। প্রবাসীতে 'মাস্টারমশায়' পড়িয়া যে ভীতিমিশ্রিত বিস্ময়ের ঢেউ বুকের মধ্যে খেলিয়া গিয়াছিল তাহা এখনো মনে আছে। তাহার পর আসিল 'গোরা'র যুগ। মাসের পর মাস কি আকুল আগ্রহেই অপেক্ষা করিয়া থাকিতাম! এক মাসে যেটুকু খোরাক পাইতাম তাহাতে ক্ষুধা তো একেবারেই মিটিত না। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নানারকম আলোচনা তখনি হইত, যদিও বয়স তখন এগারো-বারোর বেশি নয়।

কিছুকাল পরে বাবা এলাহাবাদের বাস উঠাইয়া দিয়া বরাবরের মতো কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পাশে একটি বাড়িতে আমরা চৌদ্দ বৎসর বাস করিয়াছিলাম। প্রবাসী-কার্যালয়ও ইহার নীচের তলাতেই ছিল। এই বাড়ির পাশে সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ি, ইহার একতলায় ছিল 'দেবালয়'। শশিপদ বাঁচিয়া থাকিতে প্রতি সপ্তাহেই এখানে উপাসনা আলোচনা ও বক্তৃতাদি হইত। এইখানে দ্বিতীয়বার রবীন্দ্রনাথকে দেখিলাম। উহা বোধ হয় ১৩১৭ সালে। রবীন্দ্রনাথ ছোটো একটি

প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। সেকালে তাঁহার সুকণ্ঠের সংগীত শুনিবার আগ্রহ লোকের অত্যন্ত প্রবল ছিল। প্রবন্ধপাঠ শেষ হইতেই, চারি দিক হইতে অনুরোধ আসিতে লাগিল একটি গানের জন্য। গান গাহিতে বলিলে আপত্তি তাঁহাকে তখনকার দিনে কখনো করিতে দেখিতাম না। শেষ বয়সে ভগ্নস্বাস্থ্য-অবস্থায় অবশ্য কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ একটি ছোটো খাতা বাহির করিয়া গান বাছিতে লাগিলেন। 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আঁধার করে আসে' গানটি বোধ হয় তখন সম্প্রতি রচনা করিয়াছিলেন, সেইটিই তিনি গাহিলেন। বক্তৃতার খবর বেশি লোকে পায় নাই, কাজেই 'দেবালয়ে'র ছোটো ঘরখানি ভর্তি হইয়া গেলেও বাহিরে তেমন জনসমাগম হয় নাই। কিন্তু তাঁহার অপূর্ব কণ্ঠস্বর চারটি দেওয়ালের বাধা না মানিয়া বাহিরে ছড়াইয়া পড়িবামাত্র 'দেবালয়ে'র সম্মুখের গলি ও ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরের প্রাঙ্গণে লোক ভরিয়া উঠিল। আমাদের পরিচিত এক ভদ্রলোক এই গানটির ভিতরেও পৌত্তলিকতার আভাস পাইয়া রবীন্দ্রনাথকে কয়েকটি অদ্ভুত প্রশ্ন করিলেন। তিনি কোনো উত্তর না দিয়া সস্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন, ইহা এখনো মনে আছে।

ইহার পর ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়ের বাড়ি একবার রবীন্দ্রনাথকে দেখিতে পাই ; ডাক্তার মৈত্র তখন মেয়ো হসপিটালের উপরে বাস করিতেন। প্রকাণ্ড খোলা ছাদের উপর গানের আসর হয়। 'তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি', গানটি সেদিন কবির কণ্ঠে শুনিয়াছিলাম।

১৩১৭ সালের ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের নবরচিত নাটক 'রাজা' প্রথম অভিনীত হয় বোধ হয়। আমার দিদি কয়েকটি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে গিয়া এই অভিনয় দেখিয়া আসেন। অসুস্থ থাকাতে সেবার আমি তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে পারি নাই। দুইদিন পরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি যখন শান্তিনিকেতনের গল্প আরম্ভ করিলেন তখন আমার আর দুঃখ রাখিবার স্থান রহিল না। কিন্তু যাহা ঘটিয়া গিয়াছে তাহার তো আর কোনো প্রতিকার নাই। স্থির করিলাম, ২৫ বৈশাখে যে উৎসব হইবে তাহাতে যাইবই, যেমন করিয়া হোক। এক মাস আগে থাকিতে বাবা-মাকে বলিয়া-কহিয়া সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিলাম। সঙ্গিনীও কয়েকজন জুটিয়া গেলেন।

১৯১১ খৃস্টাব্দে মে মাসে জন্মোৎসবে যাওয়া স্থির হইল। ২২ বৈশাখ রাত্রির ট্রেনে আমরা একদল ছেলেমেয়ে বাবা ও স্বর্গীয়া ক্ষীরোদবাসিনী মিত্র মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে বাহির হইয়া পড়িলাম। সেই ট্রেনে আরো অনেকে শান্তিনিকেতনে যাইতেছিলেন। অধিকাংশই আমাদের পরিচিত। 'রাজা' অভিনয় এবারেও হইবে শুনিয়াছিলাম। তাহার অনেক সাজসরঞ্জাম আমাদের সঙ্গে এই ট্রেনেই চলিল দেখিলাম। অর্ধজাগ্রত অবস্থায় তিন-চার ঘণ্টা কাটিয়া গেল। রাত্রি দুইটা বা আড়াইটার সময় ট্রেন আসিয়া বোলপুর স্টেশনে থামিল। বোলপুর, বিশেষ করিয়া শান্তিনিকেতন, অনেক বদলাইয়া গিয়াছে, কিন্তু স্টেশনটি ত্রিশ বৎসর আগেও প্রায় এই রকমই ছিল। এখানে বেশিক্ষণ গাড়ি থামে না, একরকম হুড়াহুড়ি করিয়াই ট্রেন হইতে নামিতে হইল। সবাই নামিয়াছে কি না, কাহারো

জিনিসপত্র ট্রেনে পড়িয়া আছে কি না, এই লইয়া খানিক চেঁচামেচি খোঁজাখুঁজি চলিল। তাহার পর সকলে স্টেশনের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আমাদের জন্য একটি ঘোড়ার গাড়ি ও একটি বলদ-বাহিত বস্ অপেক্ষা করিতেছে দেখা গেল। আমাদের পরিচিত দুইজন যুবক শান্তিনিকেতনের কয়েকটি ছাত্রকে সঙ্গে করিয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছে দেখিলাম। আমাদের সকলের ইচ্ছা যে হাঁটিয়া যাই, তাহা হইলে দুই ধারের দৃশ্য বেশ ভালো করিয়া দেখা যায়। কিন্তু অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যেরা তাহাতে একেবারেই নারাজ, তাঁহারা আমাদের গাড়ি না চড়াইয়া কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না। ঘোড়ার গাড়িতে চারজন ও অন্য সকলে বস্-এ চড়িয়া যাত্রা করা গেল। শুক্লপক্ষের রাত্রি, জ্যোৎস্নায় চারিদিক উদ্ভাসিত। অল্পক্ষণের মধ্যেই বোলপুরের বাজার ছাড়াইয়া আমরা খোলা মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। বালিকার দৃষ্টিতে সেই আলোকপ্লাবিত প্রান্তর স্বপ্নলোকেরই মতো সুন্দর লাগিয়াছিল। এখনকার চোখে যেন আর কিছুই তত সুন্দর লাগে না। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা শান্তিনিকেতনে আসিয়া পৌঁছিলাম। ঘোড়ার গাড়ি আগে আগে আসিয়াছে, বলদের গাড়িটি কিছু পিছাইয়া পড়িয়াছে। রাস্তার উপর নামিয়া পড়িলাম। একজন চাকর আমাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। ফুলবাগানের ভিতর দিয়া গিয়া একটি চওড়া বারান্দা-ঘেরা বাড়িতে উঠিলাম। বাড়িটির চার দিকেই বাগান, কয়েকটি সুন্দর আমলকি গাছ চোখে পড়িল। শুনিলাম ইহা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ি। তিনি এবং তাঁহার পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী তখন পুরী বেড়াইতে গিয়াছেন, তাই অতিথিদের জন্য এখন এই বাড়ি ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বাড়িটির নাম শুনিলাম নিচুবাংলা। এখানে কেবল আমরা মেয়েরাই ছিলাম, একমাত্র বাবাকে কবি আমাদের অভিভাবক করিয়া সেখানে রাখিয়া দিয়াছিলেন।

একজন ভদ্রলোক আসিয়া এই সময় আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। দিদির কাছে শুনিলাম তিনি সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। আগের বার যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই ফিরিয়া গিয়া ইঁহার ভদ্রতা ও অতিথিবৎসলতার শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন। এখন দেখিলাম, তাঁহারা অত্যুক্তি তো করেনই নাই, হয়তো-বা কমাইয়া বলিয়াছেন।

সামনের চওড়া বারান্দায় শতরঞ্চি বিছাইয়া আমাদের বসিবার জায়গা করিয়া দেওয়া হইল। সঙ্গিনীরা তখনো আসিয়া পৌঁছান নাই। বসিয়া বসিয়া নানা বিষয়ে গল্প হইতে লাগিল। আরো আধ ঘণ্টা পরে বলদ-যানটি আসিয়া পৌঁছিল। শুনিলাম আরোহীরা অর্ধেক পথেই নামিয়া হাঁটিয়া আসিয়াছেন। অতঃপর জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখা ও কে কোথায় থাকিবে তাহার ব্যবস্থা করিতে খানিক সময় কাটিয়া গেল। কয়েকজন ছোটো ছোটো ছেলের উপর মেয়েদের আদরযত্ন করিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল বোধ হয়। তাহারা যত্নের আতিশয্যে আমাদের অস্থির করিয়া তুলিল। রাত্রি ভোর হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু বালকগুলির ইচ্ছা আমরা আবার এখন শুইয়া ঘুমাই। বিছানা পাতিয়া দিতে তাহারা মহাব্যস্ত। অগত্যা অল্পক্ষণের জন্য আমাদের শুইতেই হইল। সন্তোষবাবু বলিয়া গেলেন, পরদিন সকালে বিদ্যালয়ের ছেলেদের স্পোর্টস আছে। সুতরাং সকাল সকাল উঠিবার

অনেক সংকল্প করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। নিজে হয়তো যথেষ্ট ভোরে উঠিতে পারিব না, এই ভয়ে সঙ্গিনীদের একজনকে বলিয়া রাখিলাম, যেন তিনি আমাকে যথাকালে উঠাইয়া দেন। বেশিক্ষণ ঘুমানো হইল না। ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যেই উঠিয়া পড়িতে হইল। মুখ হাত ধুইয়া, কাপড়-চোপড় পরিয়া সকলে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দিনের আলোয় চারি দিকে ভালো করিয়া তাকাইয়া দেখিলাম। বাড়িটির সামনে ও দুই ধারে বাগান, কিছুদূরে তালগাছবেষ্টিত একটি দিঘির মতো দেখা যাইতেছে, পিছনে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। বাগানে তখন ফুলের হাট বসিয়া গিয়াছে।

ছেলেদের খেলা মাঠেই হওয়া সম্ভব মনে করিয়া আমরা ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইলাম। এখনকার শান্তিনিকেতনের চেহারা যাঁহাদের কাছে পরিচিত তাঁহারা কল্পনাই করিতে পারিবেন না যে, সেই ত্রিশ বৎসর আগের ব্রহ্মচর্যাশ্রম কি প্রকার ছিল। চার দিকেই মাঠ আর খোয়াই, অনেক দূরে দূরে দুই-একটি সাঁওতাল পল্লী দেখা যাইত। প্রথম যেবার গেলাম, শান্তিনিকেতনে তখন বোধ হয় দুইটির বেশি পাকা বাড়ি দেখি নাই। আর সব ছিল মাটির ঘর, খড়ের চাল। বিজলির বাতি ছিল না, মোটরকার ছিল না, বাঙালি ছাড়া বিদেশী মানুষও দু-একটির বেশি দেখি নাই। সেই মাঠগুলির অধিকাংশের উপরেই এখন ছোটো বড়ো নানা আকারের পাকা বাড়ি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, খোয়াইগুলিও অনেক স্থানে শস্যক্ষেত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে। তখনকার পরিচিত যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের ভিতর অনেকেই এখন পরলোকগত, কেহ কেহ অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। ১৩৪৬ সালে ৭ই পৌষের উৎসবে গিয়া শান্তিনিকেতনের যেরূপ দেখিলাম তাহা আমার কাছে একেবারেই নূতন। কিন্তু ছাতিমতলায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপাসনার বেদীর দিকে চাহিয়া, এবং মন্দিরে রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব কণ্ঠে উচ্চারিত বেদমন্ত্র শুনিয়া আমার মনে হইল, আমার মনের সেই শান্তিনিকেতন তো হারায় নাই, এই নূতন আবেষ্টনের ভিতরেও তো তাহাকে পাইলাম। কিন্তু আর সে সান্ত্বনা তো রহিল না। এই প্রতিষ্ঠানের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা যিনি ছিলেন, তাঁহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে শান্তিনিকেতনও যেন মনের মধ্যে অবাস্তব রূপ ধারণ করিতেছে।

সেদিনের দিকে আবার মুখ ফিরাইয়া তাকাই। মাঠের ভিতর দিয়া খানিকদূর যাইবার পরই একটি ছোটো ছেলে আসিয়া খবর দিল যে, আমাদের জন্য খেলা আরম্ভ হইতে পারিতেছে না। আমরা তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া খেলার জায়গায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। খেলা অনেক রকমই হইল, এবং ছেলেরা দর্শকদের নিকট হইতে প্রচুর প্রশংসালাভ করিল। এইখানে আসিয়া শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। শিশুকাল হইতেই আমরা তাঁহাকে ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে জানিতাম; সুতরাং তাঁহাকে দেখিয়া খুবই আনন্দিত হইলাম। তাঁহার নিকট হইতে দুইখানি হাতে লেখা প্রোগ্রাম আদায় করিলাম। শান্তিনিকেতনে তখন ছাপাখানা ছিল না। আশ্রমবাসিনী মহিলারা ও অনেকগুলি ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে আসিয়া আমাদের সঙ্গে বসিলেন। সন্তোষবাবুর পত্নী শৈলবালার সহিত আলাপ হইল। মেয়েটির সরল ব্যবহারে আমরা সকলেই তাহার দিকে আকৃষ্ট হইলাম।

রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ তখনো পাই নাই, তাঁহাকে দেখিবার জন্য উদগ্রীব হইয়াছিলাম। খেলার মাঝামাঝি একটি ছেলে বলিয়া উঠিল, 'ঐ যে, গুরুদেব আসছেন।' সকলে ফিরিয়া তাকাইলাম। গেরুয়া রঙের দীর্ঘ পোশাক-পরা তেজঃপুঞ্জ মূর্তি, ধীরে ধীরে আমাদের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। সকলে উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। মেয়েদের মধ্যে যাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার পূর্বপরিচয় ছিল তাঁহাদের সঙ্গে দুই-একটি কথা বলিয়া তিনি ছেলেদের দিকে চলিয়া গেলেন।

খেলা শেষ হইবার পর রবীন্দ্রনাথ আমাদের সঙ্গে নিচুবাংলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখি, ছেলের দল আমাদের জন্য জলযোগের বিপুল আয়োজন করিয়া বসিয়া আছে। তাহারা তখনি আমাদের খাওয়াইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু আমরা তখন খাইতে একেবারেই নারাজ। কবিবরের পিছন পিছন সব কয়জন বাহিরের ঘরে গিয়া জুটিলাম ও তাঁহার চারি দিক ঘিরিয়া বসিয়া গেলাম। তাঁহার দুই-চারটি কথা শুনিতে তখন আমরা উৎসুক, নিজে কথা বলিবার চেষ্টা বিশেষ করি নাই। তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার পরও প্রথম-প্রথম সাহস করিয়া কথা বলিতাম না। কি কথা যে বলিব তাহাই ভাবিয়া পাইতাম না। অথচ তিনি যে ভয়ানক গুরুগম্ভীর প্রকৃতির মানুষ নন তাহা সেই স্বল্প পরিচয়েই বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

আমাদের অভ্যর্থনা-সমিতিটি কিন্তু হাল ছাড়ে নাই। জলখাবারের পাত্র-সমেত তাহারা এই ঘরেই আসিয়া উপস্থিত হইল। অগত্যা আমাদের সেইখানে বসিয়াই জলখাবার খাইতে হইল, যদিও খানিকটা সংকুচিতভাবে। জলখাবারের সঙ্গে ছেলেরা দুধও আনিয়াছিল, আমাকে দুধ খাইতে বলায় আমি বলিলাম, 'আমি কোনো জন্মে দুধ খাই না।' তিনি কথাটা শুনিয়া অত্যন্ত হাসিতেছেন দেখিয়া লজ্জিত হইয়া গেলাম।

কিছুক্ষণ পরে অন্য অতিথিদের খবর লইবার জন্য তিনি চলিয়া গেলেন। আশ্রমবাসিনী কয়েকজন মহিলা আমাদের সঙ্গে খেলার মাঠ হইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারাও আর-একটুক্ষণ গল্প করিয়া নিজের নিজের বাড়ি চলিয়া গেলেন। একজন মহিলা শুধু থাকিয়া গেলেন আমাদের খাওয়া-দাওয়ার তত্ত্বাবধান করিতে। তবে আর কাহারো প্রয়োজন ছিল না, সেই ছোটো ছেলেগুলি আমাদের সত্যই এত যত্ন করিয়াছিল যে এখন সেকথা ভাবিলে অবাক হইয়া যাই। কোথা হইতে তাহারা মানুষকে এত যত্ন করিতে শিখিল? বাল্যকালে মানুষ আদর পাইতেই চায়, করিতে চায় না, জানেও না। সত্যের অপলাপ না করিয়াও বোধ হয় বলা যায় যে, পুরুষজাতির এ বালাই আরো কম। কিন্তু এই দশ-বারো বৎসরের ছেলেগুলি দিনরাত হাসিমুখে অক্লান্ত পরিশ্রম করিত অতিথিদের জন্য। দারুণ রোদে ক্রমাগত খাবার বহিয়া আনা, জল তুলিয়া আনা, এ তো সারাক্ষণ ছিল। রাত জাগিতেও তাহাদের জুড়ি মিলিত না। অতিথিদের জন্য প্রয়োজন হইলেই নিজেদের বিছানাপত্র অকাতরে ধরিয়া দিত, ইহাও দেখিতাম। ইহা শিক্ষার গুণ এবং স্থানমাহাত্ম্য ভিন্ন আর কিছু বলিয়া মনে হইত না। সন্তোষবাবুকে এখনো যেন চোখের সম্মুখে স্পষ্ট দেখিতে পাই। এতখানি পরিপূর্ণ ভদ্রতা আর কোনো মানুষের ভিতর দেখিয়াছি বলিয়া

মনে পড়ে না। কিন্তু সেই ভদ্রতার ভিতর কোনো কৃত্রিমতা, কোনো আড়ষ্টতা ছিল না, দুই-দিনের পরিচয়েই তিনি যেন আমাদের পরমাত্মীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। ছেলেগুলি ইঁহাদের আদর্শ দেখিয়াই শিখিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। না হইলে স্কুলের ছেলে, বাংলাদেশে আর যেজন্যই বিখ্যাত হোক, ভদ্রতা এবং অতিথিবৎসলতার জন্য নিশ্চয়ই নহে। ছেলেগুলির যত্নের আতিশয্যে ব্যতিব্যস্ত হইয়া আমরা একদিন সন্তোষবাবুরই কাছে নালিশ করিয়াছিলাম যে, ইহারা তো আমাদের কিছুই করিতে দিতে চায় না, সবই তাহারা করিবে। সন্তোষবাবু বলিলেন, 'এতেও গুরুদেব সন্তুষ্ট হন নি, বলছেন "মেয়েদের কষ্ট হচ্ছে"।'

কষ্ট আমাদের বিন্দুমাত্রও হয় নাই। এখন সেই ত্রিশ বৎসর আগেকার দিনকয়টির দিকে তাকাইয়া ভাবি, এইরূপ নির্মল আনন্দ জীবনে আর কোনোদিনও কি জুটিয়াছিল?

রবীন্দ্রনাথ চলিয়া যাইবার পর স্নানাহারের আয়োজন চলিতে লাগিল। শান্তিনিকেতনে তখন নিরামিষ খাওয়া চলন ছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর বাহিরের বড়ো ঘরখানিতে ঢালা বিছানা পাতিয়া সকলে বিশ্রাম করিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সকলের তখন আকণ্ঠ কথায় ভরিয়া উঠিয়াছে, বিশ্রাম করিবে কে? সকলে কথাই বলিতে লাগিলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ আবার এ বাড়িতে মেয়েদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন বলিয়া শুনিলাম, কিন্তু ঠিক কোন সময়ে আসিবেন তাহা জানিতে পারিলাম না।

হঠাৎ আমাদের কলকোলাহলের ভিতরেই তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অকস্মাৎ শান্তশিষ্ট হইয়া বসিবার চেষ্টাটা সম্পূর্ণরূপে সার্থক হইল না। যাহা হউক, সকলে উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম এবং তিনি বসিবার পর আবার সকলে বসিলাম। বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলারাও তাঁহার আগমন-সংবাদ পাইয়া বাহিরে আসিয়া বসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নানা ঘরোয়া বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন। আমরা মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিলাম। আমরা তখন তাঁহার গান বা পাঠ শুনিতে উৎসুক, ও-সব আলোচনা আমাদের ভালো লাগিবে কেন? তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতার জননী এই সময় উপস্থিত ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার সহিত নানাপ্রকার রসালাপ করিতেছিলেন। ইহাও আমাদের বিস্ময়ের খোরাক কিছু জোগাইয়াছিল। কবিবরকে আমরা পুরাকালের তপোবনের ঋষিরই মতো একটা-কিছু কল্পনা করিয়া আসিয়াছিলাম। তিনি যে আবার সাধারণ মানুষের মতো সাংসারিক বিষয়ে আলোচনা করেন বা বৈবাহিকার সঙ্গে রসিকতা করেন, ইহা দেখিয়া মুগ্ধবিস্ময়ে আমাদের মন ভরিয়া গেল।

একজন ভদ্রমহিলা শান্তিনিকেতনের দারুণ গ্রীষ্মের কথা তোলাতে তিনি বলিলেন, 'গরমের আমি একটিমাত্র ওষুধ জানি, সেটি হচ্চে কবিতা লেখা।'

ইহার ভিতর একজন শিক্ষক আসিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। মহিলারাও সভাভঙ্গ করিয়া ভিতর-বাড়িতে চলিয়া গেলেন। গান বা পাঠ না শুনিতে পাওয়ায় আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম, কিন্তু বাহিরে তাকাইয়া দেখিলাম যে কবি তখনো চলিয়া যান নাই, বারান্দায় একটি বেতের ইজি-চেয়ারে বসিয়া আছেন। পরে শুনিয়াছিলাম ঐ চেয়ারখানি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ছিল।

আমরা মেয়ের দল আবার আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলাম। আমাদের ভিতরে একজন তাঁহাকে 'খেয়া' পাঠ করিয়া শুনাইতে অনুরোধ করাতে তিনি তৎক্ষণাৎ রাজি হইলেন। তখনকার দিনের কথা যখন স্মরণ করি তখন এই ভাবি যে, কখনো তো তাঁহাকে কাহারো অনুরোধ উপেক্ষা করিতে দেখি নাই, সে যতই ক্ষুদ্র, যতই অর্বাচীন হোক-না কেন। তাঁহার যেন শ্রান্তিক্লান্তিও ছিল না। পাঁচ-ছয় ঘন্টা অম্লানবদনে এক আসনে বসিয়া গান গাহিয়াছেন, গল্প করিয়াছেন, কবিতা পাঠ করিয়াছেন। তাঁহার অর্ধেক বয়স যাঁহাদের তাঁহারা পা বদলাইয়াছেন পঞ্চাশ. বার, উঠিয়াও গিয়াছেন দুই-চারি বার। তিনি কিন্তু মর্মরনির্মিত মূর্তির মতো একইভাবে বসিয়া থাকিতেন। মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়াও সকল দিক দিয়াই তিনি যেন মনুষ্যত্বের ক্ষুদ্র সীমানার বহু উর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছিলেন, তাহা এই সামান্য জিনিসগুলি হইতেও বুঝা যায়।

কিন্তু কোন কবিতাটি পড়া হইবে? কেহই তাহা স্থির করিয়া বলিতে পারে না। তখন তিনি বলিলেন, 'তার চেয়ে আমি এক কাজ করি, সেটা তোমাদের বেশি interesting লাগবে। আমার লেখা 'জীবনস্মৃতি' তোমাদের পড়ে শোনাই।'

সকলে মহোৎসাহে 'জীবনস্মৃতি' শুনিতে প্রস্তুত হইলাম। সেদিন 'জীবনস্মৃতি'র অনেকখানিই তিনি আমাদের পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। যতদূর মনে পড়ে এই বইখানি প্রকাশিত হইবার সময় কিছু পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছিল। 'জীবনস্মৃতি'র পাণ্ডুলিপিখানি স্নেহ করিয়া তিনি আমাকে দান করিয়াছিলেন। সেটি সৌভাগ্যক্রমে এখনো আমার কাছে আছে। আরো কত অমূল্য রত্ন হাতে আসিয়াছিল। সংসারের কণ্টকময় পথে চলিতে চলিতে কিছু-বা হারাইয়া ফেলিয়াছি, কিছু এখনো কাছে আছে।

সন্ধ্যা আসিয়া পড়াতে সেদিন আর পাঠ শেষ হইল না। আর-একদিন বাকিটা পড়িয়া শুনাইবেন আশ্বাস দিয়া তিনি উঠিয়া চলিয়া গেলেন। তখন তিনি শান্তিনিকেতন ভবনে বাস করিতেন। নিচুবাংলা সেখানে হইতে কম দূর নয়। কিন্তু সর্বদাই তিনি হাঁটিয়া আসিতেন, কখনো ছাতা লইয়া, কখনো না লইয়াই। বেশ দ্রুতগতিতে হাঁটিতেন, দুই-চার বার তাঁহার সঙ্গে চলিতে চেষ্টা করিয়া দেখিতাম আমাদের সাধ্যে কুলায় না।

বিকালবেলাটা বাঁধের ধারে ও মাঠে বেড়াইয়া কাটাইয়া দিলাম। বাঁধটিতে তখন জল বেশি ছিল না। কিন্তু বৈশাখের গরমে বিদ্যালয়ের কুয়াগুলির জল শুকাইয়া উঠিতেছিল, তাই পুরুষ অতিথিদের ভিতর অনেকে এবং বিদ্যালয়ের ছেলেরা এই বাঁধের জলেই স্নান করিতে আসিতেন দেখিতাম। আমরা অবশ্য সেই ছোটো ছেলেগুলির অনুগ্রহে জলের কষ্ট কখনো অনুভব করি নাই।

বিকেলে আর-এক পালা ছেলেদের খেলা দেখা গেল। সন্ধ্যার সময় শান্তিনিকেতন-ভবনে রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমরা সকলেই তখন বালিকা, কেহ-বা স্কুলে পড়ি, কেহ-বা সবে স্কুলের গণ্ডি ছাড়াইয়াছি। কিন্তু তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা বিষয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করিলেন। সে-সব অমূল্য বাণী কেন লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি নাই, সেই ক্ষোভ এখন মনে জাগে।

শান্তিনিকেতনের তিনতলার ছাদে উঠিয়া সেদিন অনেকক্ষণ বেড়াইয়াছিলাম। মাঝে একজন যুবক আসিয়া খবর দিলেন যে, গিরিধি ও কলিকাতা হইতে মস্ত আর-একদল অতিথি আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এত লোকের আসিবার কথা ছিল না। রবীন্দ্রনাথকে এই খবরে কিঞ্চিৎ উদবিগ্ন বোধ হইল। এত লোককে যথোপযুক্ত আদরযত্ন করা বা স্থান দান করা সম্ভব হইবে কি না সে বিষয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মেয়েরাও অনেক আসিয়াছেন শুনিয়া আমাদের দলের অনেকে নিচুবাংলায় ফিরিয়া গেলেন, নবাগতদের ব্যবস্থা করিবার জন্য। এই সময় ঝড় আসিয়া পড়ায় আমরা তেতলার ছাদ হইতে নামিয়া দোতলার গাড়িবারান্দার ছাদে গিয়া বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে রবীন্দ্রনাথ চাকর এবং আলো সঙ্গে দিয়া আমাদের বাড়ি পাঠাইয়া দিলেন।

নিচুবাংলায় আরো অনেকগুলি মহিলা ও বালিকা আসিয়াছেন দেখিলাম। কেহ-বা পরিচিতা, কেহ অপরিচিতা। দিদি এই সময় অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়াতে রাত্রিটা আমাদের বড়োই উদবেগের ভিতর দিয়া কাটিল। অতিথিদের ভিতর একজন পরিচিত ডাক্তার ছিলেন, তিনি আসিয়া তাঁহাকে কয়েক বার দেখিয়া গেলেন। রাত্রিতে আরো এক পালা অতিথিসমাগম ঘটিল। নিচুবাংলায় আর তিল ফেলিবার জায়গা রহিল না। আমরা এক ঘরে বারো-চৌদ্দজন করিয়া শুইতে আরম্ভ করিলাম। একজন মহিলা ট্রেনে কাপড়ের বাক্স ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, যে কয়দিন তিনি এখানে ছিলেন, নিজের ঐ হারানো কাপড়গুলির জন্য অবিশ্রাম বিলাপ করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গিনীরা কাপড়-চোপড় ধার দিয়া তাঁহাকে সে যাত্রা উদ্ধার করিয়াছিলেন।

২৪ বৈশাখ সকালেও ছেলেদের খেলা ছিল। কিন্তু দিদির অসুস্থতার জন্য সেখানে যাইতে পারি নাই। সেদিন আর রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পাই নাই। অভিনয়ের নানা কাজে তিনি সকাল হইতে ব্যস্ত ছিলেন। অভিনেতাদের শিক্ষা দেওয়ার কাজ তো তিনি সবটাই করিয়াছিলেন, আবার তাহাদের সাজানো, make up করা, তাহাও সেকালে তাঁহাকেই করিতে হইত।

ছেলেরা কিছু ব্যস্ত ছিল বলিয়া পরিবেশনের কাজে আজ মেয়েরা কিছু কিছু সাহায্য করিল। ইহাতেও অবশ্য সন্তোষবাবু ও তাঁহার ক্ষুদ্র চেলার দল যথারীতি আপত্তি করিলেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর মহিলারা একদল রবীন্দ্র-রচনা সম্বন্ধে প্রবন্ধ শুনিতে গেলেন। প্রবন্ধটি অজিতকুমার চক্রবর্তী-রচিত। আমরা আর-একদল নেপালবাবুর সঙ্গে শান্তিনিকেতন-ভ্রমণে বাহির হইলাম। সেই দারুণ গ্রীষ্মে, নিদারুণ রৌদ্রে কিভাবে যে ঘুরিয়া বেড়াইতাম তাহা ভাবিলে এখন অবাক লাগে। ওখানকার ছেলেরা জুতা পরিত না, দেখাদেখি আমরাও খালি-পায়ে বেড়াইতাম। ছাতার বালাই তো প্রথম হইতেই ছিল না।

সন্তোষবাবু তখন একটি গোশালা খুলিয়াছিলেন। অনেকগুলি গোরু-মহিষ দেখিলাম, তাহারা বেশ যত্নেই আছে। একটি প্রকাণ্ড কালো মহিষ দেখিয়া ও তাহার

বীর ও রৌদ্র রসের বর্ণনা শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইলাম। ডেয়ারি ফার্ম দেখার পরে বিদ্যালয়ের ঘরগুলি, লাইব্রেরি, হাসপাতাল ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ছাতিমতলার বেদীও দেখিয়া আসিলাম।

একটি ছোটো ছেলেকে এই সময় দেখিলাম, তাহার ডাকনাম গুলু। ছেলেটি দেখিতে বেশ সুশ্রী, তবে মুখের ভাব অত্যন্ত গম্ভীর। ইহার অনেক গল্প আগেই শুনিয়াছিলাম। ছেলেটি আশ্রমে আসিয়া প্রথম যেদিন রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পায়, তাঁহাকে নাকি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'তুমি নাকি কবিতা লেখ?' তিনি অপরাধ স্বীকার করায় গুলু বলিল, 'আমিও লিখি।' খাতা বাহির করিয়া সে তাঁহাকে কবিতা শুনাইয়াও দিল।

বিকালবেলাটা এদিক-ওদিক বেড়াইয়াই কাটিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ অভিনয়ের জন্য মেয়েদের কতকগুলি ফুলের মালা গাঁথিয়া দিতে বলিয়াছিলেন, তাহাও খানিকক্ষণ করা গেল। নিচুবাংলার সামনে তখন বিস্তীর্ণ ফুলের বাগান ছিল, ফুলের কিছু অভাব হইল না।

সন্ধ্যার পর 'রাজা' অভিনয় আরম্ভ হইল। তখন 'নাট্যঘর'-নামক একটি বড়ো মাটির ঘরে অভিনয় হইত। ব্রাহ্মসমাজে লালিতপালিত হওয়াতে অভিনয় ইতিপূর্বে কখনো দেখি নাই। 'রাজা' অভিনয় দেখিয়া একেবারে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া গেলাম। রবীন্দ্রনাথ 'ঠাকুরদা' সাজিয়াছিলেন, আড়াল হইতে 'রাজা'র ভূমিকায়ও তিনিই অভিনয় করিয়াছিলেন। ঠাকুরদা সাজিতে তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই। সদাসর্বদা যে গেরুয়া রঙের পোশাক পরিতেন, তাহার উপর ফুলের মালা পরিয়া তিনি রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। ঠাকুরদা যেখানে রাজসেনাপতির বেশে আবির্ভূত হইলেন, সেখানে অবশ্য বেশের পরিবর্তন ঘটিল। সাদা রেশমের পোশাকের উপর চওড়া লাল কোমরবন্ধ পরিয়া তিনি বাহির হইলেন। রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ের আর কি বর্ণনা দিব! তাঁহার সব-কিছুর তুলনা একমাত্র তাঁহাতেই মিলিত। একটি জিনিস আমার সর্বদা মনে হইত, যখনি তাঁহার অভিনয় দেখিতাম— তিনি যে ভূমিকায়ই অবতীর্ণ হন, তিনি যে রবীন্দ্রনাথ ইহা কিছুতেই ভুলিতে পারিতাম না। আত্মগোপন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল, যদিও তিনি অতি উৎকৃষ্ট প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন। আকাশের সূর্যকে যেমন সাজাইয়া তারকার মূর্তি ধরানো যায় না, তাঁহাকেও তেমনি অন্য কাহারো মূর্তি ধরানো যাইত না।

দিনেন্দ্রনাথ কালিঝুলি মাখিয়া, আলখাল্লার উপর নানা রঙের ন্যাকড়ার ফালি ঝুলাইয়া, রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। তিনি পাগল সাজিয়াছিলেন। তাঁহার চেহারা দেখিয়া দুই-তিনটি শিশু কাঁদিয়া উঠিল। অজিতকুমার চক্রবর্তী রানী সুদর্শনা, ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরঙ্গমা সাজিয়াছিলেন। কাঞ্চীরাজের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন জগদানন্দ রায় মহাশয়। নাটকের ভিতর অনেকগুলি গান ছিল, তাহার কয়েকটি বাদ দেওয়া হইয়াছিল। পরে শুনিলাম, অভিনয় বেশি দীর্ঘ হইলে অতিথিরা পাছে ক্লান্ত হইয়া পড়েন, তাই এই ব্যবস্থা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই করিয়াছিলেন। ক্লান্ত অবশ্য কেহই হন নাই, হইতেনও না। ছেলেদের গানগুলি অতি সুন্দর হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যবর্তী ঠাকুরদারূপী কবিবরের

নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। তিনি অতি সুন্দর নৃত্য করিতে পারিতেন। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের মূর্তি শুধু যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা বঞ্চিত হইয়াছেন।

২৫ বৈশাখ ভোর পাঁচটার সময় আম্রকুঞ্জে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। আমরা উৎসাহের আতিশয্যে প্রায় রাত থাকিতেই উঠিয়া পড়িয়াছিলাম। আমাদের আগেও অনেকে উঠিয়াছেন দেখিলাম। ভোর হইতে-না-হইতে দলে দলে লোক বাঁধ হইতে স্নান করিয়া ফিরিতেছেন। আমরাও স্নানাদি সারিয়া আম্রকুঞ্জে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখনো বেশি লোক-সমাগম হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংও আসেন নাই। উৎসবক্ষেত্র আলপনা ও পত্রপুষ্পে অতি সুন্দর করিয়া সাজানো হইয়াছিল। আমরা না বসিয়া এদিক-ওদিক ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ পরেই দেখিলাম, কবি 'শান্তিনিকেতন' হইতে বাহির হইয়া উৎসবক্ষেত্রের দিকে চলিয়াছেন। আমরাও তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া আম্রকুঞ্জে ফিরিয়া আসিলাম। আশ্রমবাসী ও অতিথিবর্গে দেখিতে দেখিতে সভাস্থল ভরিয়া উঠিল। দিনেন্দ্রনাথ তাঁহার ছাত্রদের লইয়া গান আরম্ভ করিলেন। আচার্যের কাজ করিলেন তিনজন— শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য ও শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায়। নেপালবাবু শেষের দিকে ছাত্রদের কিছু উপদেশ দিলেন। তাঁহার কয়েকটি কথা মনে আছে। তিনি বলিয়াছিলেন, 'তোমরা সকলেই গুরুদেবকে ভক্তি করো, কিন্তু তাঁকে কখনো যেন ঈশ্বরের স্থানে বসিয়ো না।'

এখন মনে হয়, এ উপদেশের প্রয়োজন ছিল, শুধু ছাত্রদের জন্য নয়, অন্য অনেকের জন্যও। এই হতভাগ্য দেশে তিনি মূর্ত দেব-আশীর্বাদ ছিলেন, তাঁহাকে হারাইয়া মনে হয় দেবতাই আমাদের ত্যাগ করিয়াছেন। একজন মানুষের মৃত্যুতে কোনো দেশ কখনো এমন রিক্ত আর কোথাও হইয়াছে কি? আজ যদি গৌরীশৃঙ্গ ভাঙিয়া পড়িত, বা ভাগীরথী শুকাইয়া যাইতেন, তাহা হইলে কি বাঙালি ইহার চেয়ে অধিক অভিভূত হইত? এই নিরাশার মহাতমস্বিনীর ভিতর আলোকরেখা তো কোথাও দেখিতে পাই না।

রবীন্দ্রনাথকে আশ্রমের পক্ষ হইতে অনেকগুলি সময়োচিত উপহার দেওয়া হইল। তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া অল্প-কিছু বলিলেন। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় একটি অভিনন্দন পাঠ করিলেন।

রবীন্দ্রনাথ কি বলিয়াছিলেন তাহার কিছু মনে আছে: 'আমাকে আপনারা যে উপহার দিলেন সেগুলি পাবার আমি কতখানি যোগ্য তা যদি আমি মনে করতে যাই তাহলে আমাকে লজ্জিত হতে হবে। কিন্তু একটা ক্ষেত্র আছে যেখানে মানুষের কোনো লজ্জা নেই, সেটা প্রীতির ক্ষেত্র। এই-সব উপহার আমাকে আপনারা প্রীতির সহিত দিচ্ছেন, সেইজন্য এ-সব গ্রহণ করতে আমার কোনো বাধা নেই।'

কবিবরকে অসংখ্য পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হইয়াছিল। সভাস্থ অতিথিদেরও ফুলের মালা ও চন্দন দিয়া অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল। এইখানে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখিলাম।

সভার কার্য শেষ হইতেই কবিকে প্রণাম করিবার ধুম পড়িয়া গেল। প্রায় তিন শত ব্যক্তির প্রণাম গ্রহণ করিতে তাঁহাকে আধ ঘণ্টারও বেশি দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল। তিনি সমস্তক্ষণই নতমস্তকে হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। ছেলেদের প্রণামের পালা সাঙ্গ হইতেই তিনি চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আমরা এতখানি বঞ্চিত হইতে একেবারেই স্বীকার করিলাম না। সন্তোষবাবু গিয়া তাঁহাকে আবার ডাকিয়া আনিলেন। মহিলা ও বালিকাদের প্রণাম গ্রহণ করিয়া তবে তিনি যাইতে পথ পাইলেন।

নিচুবাংলায় ফিরিয়া শুনিলাম; অভ্যাগতদিগের ভিতর অনেকেই বেলা দুইটার গাড়িতে ফিরিয়া যাইতেছেন। আমাদের নিজস্ব দলটি ও আর দুই-একজন মাত্র আরো একদিনের জন্য থাকিয়া গেল।

ইহারই ভিতর একদিন সুকুমার রায় তাঁহার 'অদ্ভুত রামায়ণ' গান করিয়া শুনাইয়াছিলেন। উহা ২৪ কি ২৬ বৈশাখ হইয়া থাকিবে। এই রামায়ণ-গানটি সকলেই খুব উপভোগ করিয়াছিলেন। 'অদ্ভুত রামায়ণে' একটি গান আছে, 'ওরে ভাই, তোরে তাই কানে কানে কই রে, ওই আসে, ওই আসে, ওই ওই ওই রে।' আশ্রমের ছোটো ছেলেরা ঐ গানটি শোনার পর সুকুমারবাবুরই নামকরণ করিয়া বসিল, 'ওই আসে'। একটি ছোটো ছেলে মাঠের ভিতর গর্তে পড়িয়া গিয়া আর উঠিতে পারিতেছিল না। সুকুমারবাবুকে সেইখান দিয়া যাইতে দেখিয়া সে চিৎকার করিয়া বলিল, 'ও ঐ আসে, আমাকে একটু তুলে দিয়ে যাও তো।'

২

অতিথির দল তো বাহির হইয়া পড়িলেন। যাইবার সময় খুব হুড়াহুড়ি করিয়াই তাঁহাদের যাইতে হইল, কারণ সময় হাতে অল্পই ছিল। আমরা সকলেই আশা করিতেছিলাম যে তাঁহারা ট্রেন ফেল করিবেন। যাত্রীরা বলদের বস্-এ উঠিলেন, তাঁহাদের মালপত্র চলিল গোরুর গাড়িতে। সে গাড়িও আবার নানারকম উৎপাত শুরু করিল। কখনো রাস্তা ছাড়িয়া নালায় নামিয়া পড়ে, কখনো জিনিসপত্র গাড়ি হইতে নীচে ফেলিয়া দেয়। এক ভদ্রলোকের একটা বাক্স ভাঙিয়া সব জিনিসপত্র রাস্তায় ছড়াইয়া পড়িল। শেষে চতুষ্পদ বাহনগুলির আশা ত্যাগ করিয়া বিদ্যালয়ের ছেলের দলই গাড়ি ঠেলিতে আরম্ভ করিল এবং তাহাদের ট্রেন ধরাইয়াও দিল।

বাকি দুপুরটা কিভাবে কাটানো যায়? নেপালবাবুকে অনেক অনুরোধ-উপরোধ করিয়া রবীন্দ্রনাথের নিকট পাঠানো হইল, তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আসিয়া 'জীবনস্মৃতি'র বাকি অংশটুকু আমাদের শুনাইয়া যান। এইপ্রকার অনুরোধ করিতে বিন্দুমাত্র সংকোচও আমরা অনুভব করি নাই। কেমন করিয়া জানি না বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, আমরা বয়সে ও বুদ্ধিতে ছোটো বটে, কিন্তু তাঁহার চোখে ছোটো নয়। ছোটো বলিয়া সর্বদা প্রশ্রয়ই পাইয়াছিলাম, অবজ্ঞা কখনো কোনোভাবে পাই নাই। যে অগাধ স্নেহ এই

সদ্যপরিচিতা বালিকাগুলির উপর তিনি অজস্রধারে বর্ষণ করিতেন তাহার তুলনা পাই না। এই অমূল্য দানের যোগ্য আমরা কেহই ছিলাম না, কিন্তু একমাত্র স্নেহই জগতে যোগ্যতার বিচার করে না।

কিন্তু দূত পাঠানোটা প্রথমবার বিফলই হইল। নেপালবাবু ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, একদল ভদ্রলোক কবিকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িতে একান্তই নারাজ। কিন্তু এত অল্পেই হাল ছাড়িবার মতো মনোভাব আমাদের কাহারো ছিল না। অন্য অতিথিদের প্রতি অবিচার হইতেছে কি না তাহা ভাবিয়া দেখাও প্রয়োজন বোধ করিলাম না। আবার দূত পাঠানো গেল, এবার সন্তোষবাবুকে। এবার রবীন্দ্রনাথ আসিতেছেন দেখিলাম, তবে সঙ্গে কয়েকজন ভদ্রলোকও আসিতেছেন। তাঁহারাই বা দখল ত্যাগ করিবেন কেন? তাঁহাদিগের ভিতর সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এবং চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বলিয়া মনে পড়ে।

নেপালবাবু আমাদের শিশুকাল হইতেই জানেন, এলাহাবাদে আমরা বহুকাল একই বাড়িতে বাস করিয়াছিলাম। তিনি আদর করিয়া আমাকে 'মা' বলিয়া ডাকেন। রবীন্দ্রনাথ যখন আসিয়া বারান্দায় উঠিলেন তখন আমি দাঁড়াইয়া নেপালবাবুর সঙ্গে গল্প করিতেছিলাম। কবি আমাদের সামনে আসিয়া নেপালবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'কি, আপনার এখানে এসে মাতৃসম্মিলন হল নাকি?' চারুচন্দ্র অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিলেন, 'উনি যে কেবল নেপালবাবুরই মা তা নয়, আমারও বটে।' সত্যই তিনি আমাকে স্নেহ করিয়া মা বলিয়া ডাকিতেন, এ স্নেহ তাঁহার জীবনান্তকাল পর্যন্ত ছিল।

রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, 'তা হলে আমিও একজন candidate হলাম।' বাবার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'আপনি যে ভারি ঘরে থেকেও দাবি ছেড়ে দিয়েছেন?' বাবা হাসিমুখে কি একটা উত্তর দিলেন। আমার মুখ দিয়া কোনো কথাই বাহির হইল না। কি যে বলা যাইতে পারে তাহাই ভাবিয়া পাইলাম না।

'জীবনস্মৃতি'-পাঠের আয়োজন হইতে লাগিল। বৃষ্টি আসিয়া পড়িল, তবু ঘরে না ঢুকিয়া সকলে বারান্দায়ই বসিলাম। কয়েকজন বৃষ্টির ছাঁটে ভিজিতেছিলাম বলিয়া সস্নেহ তিরস্কার লাভ করিলাম এবং সরিয়া আসিলাম। বৃষ্টি সমানে চলিল, পাঠও চলিল। 'জীবনস্মৃতি'র সবটা সেদিনও শেষ হইল না। বর্ষার গান শুনিবার জন্য আমরা উৎসুক হইয়া উঠিলাম। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মনুষ্যোচিত দুর্বলতা কখনো লক্ষ করিতাম না বলিয়া আমরাও ভাবিতে পারিতাম না যে তাঁহারো শ্রান্তিক্লান্তি কিছু থাকিতে পারে। গান শুনিবার আবদার ধরিবামাত্রই তিনি তৎক্ষণাৎ রাজি হইলেন। মধ্যে ক্ষিতিমোহনবাবু আসিয়া বলিলেন যে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি অতিথিরা অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা শান্তিনিকেতনকে শাস্তিনিকেতন বলিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'এখানে আমার কোনো অধিকার নেই, মেয়েরা যা বলবেন তাই হবে।' আমরা অবশ্য অল্পবয়সের বিবেচনাহীনতায় তাঁহাকে যাইতে দিতে অনিচ্ছুকই ছিলাম। কিন্তু তিনি অন্য অতিথিদের একেবারে বঞ্চিত করিলেন না। কয়েকটি বর্ষার গান গাহিয়া তাঁহাদের কাছে চলিয়া গেলেন। 'বারি ঝরে

ঝরঝর ভরা বাদরে' গানটি সেদিন প্রথম শুনিয়াছিলাম। শুনিলাম পুরুষদের আসরেও 'জীবনস্মৃতি' রবীন্দ্রনাথ আর-একবার পড়িয়া শুনাইয়াছেন। দানে কখনো তাঁহার ক্লান্তি ছিল না। আকাশের সূর্যেরই মতো তিনি অজস্রধারে কিরণ বর্ষণ করিতেন, উচ্চনীচ, ছোটোবড়ো, বুদ্ধিমান বা বুদ্ধিহীন কাহারো সম্বন্ধে ব্যতিক্রম দেখিতাম না।

'আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,
তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি,
বাসিতে পারি যে ভালো।'

ইহা যেন তিনি নিজের সম্বন্ধেই লিখিয়াছিলেন।

কবি চলিয়া যাইবার পর আমরা সকলেই বেড়াইতে বাহির হইলাম। বেশিক্ষণ বাহিরে থাকি নাই। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, বাড়ি একরকম খালি, শুধু বাবা একলা বাহিরের ঘরে বসিয়া আছেন। সামনের বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম রবীন্দ্রনাথ একটি যুবককে সঙ্গে করিয়া আসিতেছেন। অতিথিরা প্রায় সকলেই বাহির হইয়া গিয়াছেন দেখিয়া তিনি একটু বিস্মিত হইয়াছিলেন বোধ হয়। বাবার কাছে আসিয়া তিনি বলিলেন, 'আপনি এই চাষাটির সঙ্গে আলাপ করুন, আমি ততক্ষণ নূতন আলাপ জমাবার চেষ্টা করি।' ঐ যুবকটি রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়, অল্পদিন হইল আমেরিকা হইতে কৃষিবিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে আসিয়া বসিলেন। আগের দিনের অভিনয় সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা বলিলেন, আমি উত্তরে কী যে বলিয়াছিলাম মনে নাই। বোধ হয় কিছুই বলি নাই। এমন সময় প্রশান্তচন্দ্রের একটি পাঁচ-ছয় বৎসরের ভগিনীর হারাইয়া যাওয়ার সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল। রবীন্দ্রনাথ ব্যস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বয়ং তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইয়া গেলেন, যদিও তাঁহার নিজের যাইবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। বালিকাটি অনতিবিলম্বে নিজেই ফিরিয়া আসিল, সে তাহার দাদা ও দিদির সঙ্গে বেড়াইতে গিয়াছিল। তাহাদের কিঞ্চিৎ বকুনি খাইতে হইল, এবং তখনি আবার কবিকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য লোক পাঠানো হইল। তিনি সৌভাগ্যক্রমে বেশিদূর যান নাই, সুতরাং কিছু পরেই নিচুবাংলায় আবার ফিরিয়া আসিলেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, সকলে বারান্দায় বসিলাম। গান শুনিবার আবেদন জানাইলাম, তাহা মঞ্জুরও হইল। 'আসনতলের মাটির পরে লুটিয়ে রব' গানটি সেইদিন তিনি গাহিয়াছিলেন।

অল্পক্ষণ পরে তিনি উঠিয়া শান্তিনিকেতনের দিকে ফিরিয়া চলিলেন, আমরাও তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। সন্তোষবাবুরা তখন একটি ছোটো পাকাবাড়িতে থাকিতেন, সেই বাড়ির ছাদের উপর গিয়া আর-একবার বসা হইল। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা রবীন্দ্রনাথকে একটি বসিবার কার্পেট উপহার দিয়াছিল। সেইটি আনাইয়া তিনি আমাদের জন্য পাতিয়া দিতে বলিলেন। আমরা কিন্তু তাহাতে না বসিয়া ছাদের সিমেন্টের উপরেই বসিলাম। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর একটি বালক আসিয়া খবর দিল যে নাট্যঘরে 'কলির ভগীরথ' ও 'বিনিপয়সার ভোজ' অভিনয় হইবে। সকলে দেখিতে গেলাম বটে, কিন্তু অভিনয় বিশেষ

ভালো লাগিল না। সেই রাত্রেই অবশিষ্ট অতিথি যে কজন ছিলেন প্রায় সকলেই চলিয়া গেলেন, বিদ্যালয়ের ছেলেরাও পরদিন যাইবে বলিয়া শুনিলাম। আমরা ছাব্বিশে বৈশাখ শেষরাত্রের ট্রেনে যাইব বলিয়া স্থির হইল।

মন অত্যন্ত মুষড়াইয়া গেল। তিনদিনের পরিচয়েই যেন এখানকার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছিলাম। এই বন্ধনে টান পড়িয়া অত্যন্ত একটা ক্লিষ্টতা মনকে অধিকার করিয়া বসিল। ইহা দুদিনের ক্ষণিক জিনিস ছিল না, তাহা তো এখন বুঝিতে পারি। মধ্যে মৃত্যু আসিয়াও এই বন্ধনের গ্রন্থি তো শিথিল করিতে পারিল না; পৃথিবীর মানুষ নশ্বর বটে, কিন্তু ভালোবাসা অমর, এই বিশ্বাসই এখন আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা ও আশ্রয়।

পরদিন সকালে ছেলেদের লইয়া রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে উপাসনা করিবেন বলিয়া শুনিয়াছিলাম। আমরাও সেখানে যাইবার উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম। ক্ষিতিমোহনবাবুকে তখন ছেলেরা 'ঠাকুরদা' বলিয়া ডাকিত, প্রথম 'রাজা' অভিনয়ে তিনি ঠাকুরদা সাজিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। শুনিলাম কাশীতেও তাঁহার 'ঠাকুরদা' নাম চলিত ছিল, পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয় শান্তিনিকেতনে আসিয়া এই নাম প্রচার করিয়া দেন। ক্ষিতিমোহনবাবুর পত্নীরও ডাকনাম ছিল 'ঠান্‌দি'। আমরা এখনো এই নামেই তাঁহাকে ডাকি। তাঁহার সঙ্গে মন্দিরে যাইব স্থির করিয়া তাঁহার ঘরে গিয়া ঢুকিলাম। ঠান্‌দি তখন নিজের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের লইয়া মহাব্যস্ত। তাহারা সব কজন মিলিয়া দড়ির আলনা ছিঁড়িয়া, কলসির জল উলটাইয়া ফেলিয়া এবং নিজেরা জলের মধ্যে আছাড় খাইয়া পড়িয়া জননীকে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছিল। তাঁহার তখনো কিছু দেরি আছে দেখিয়া আমরা অন্যান্য অধ্যাপকদের ঘরে ঘরে ঘুরিয়া খোকাখুকিদের সঙ্গে ভাব করিয়া আসিলাম। শ্রীমান শান্তিদেব ঘোষকে তখন প্রথম দেখিয়াছিলাম বোধ হয়। কালো পাথরে খোদাই করা পুতুলের মতো গোলগাল সুন্দর শিশুটিকে দেখিয়া সকলেই খুব আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। আগুন ধরিতে গিয়া তিনি তখন দুইটি কচি আঙুল পুড়াইয়া রাখিয়াছিলেন।

দেরি হইয়া যাইতেছে দেখিয়া আমরা আর পথপ্রদর্শিকার অপেক্ষা না রাখিয়া নিজেরাই বাহির হইয়া পড়িলাম। অনেকক্ষণ ঘুরিয়া শান্তিনিকেতন ভবনের (বর্তমান অতিথিশালার) সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। শুনিলাম রবীন্দ্রনাথ উপরেই আছেন। এই বাড়ির নীচের তলায় তখন দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাস করিতেন। আমরা একটু ইতস্তত করিয়া উপরেই উঠিয়া গেলাম। ইহার আগে সঙ্গে একজন কাহাকেও না লইয়া, সোজা কবিবরের দরবারে কখনো উপস্থিত হই নাই। কিন্তু তিনদিনের পরিচয়েই বুঝিয়াছিলাম আমরা গেলে তিনি বিরক্ত হইবেন না। উপরে উঠিয়া দেখিলাম, তিনি গাড়িবারান্দার ছাদে বসিয়া আছেন, পায়ের কাছে একটি বিড়াল। বুদ্ধিহীন পশুও-যেন কোন অদৃশ্য শক্তির টানে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইত, ইহা পরেও অনেকবার দেখিয়াছি।

আমরা গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিলাম। আমার একজন সঙ্গিনী একটি মালা

নিজে গাঁথিয়া আনিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথকে পরাইবার জন্য। কিন্তু আঁচল হইতে বাহির করিতে গিয়া মালাটি জট পাকাইয়া গেল। পাছে মেয়েটি লজ্জা পায় এইজন্য কবি হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া যেন বেড়াইবার উদ্দেশ্যেই ছাদের অন্য দিকে চলিয়া গেলেন। খানিক পরে মালার জট ছাড়িয়াছে দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং মালাটি গ্রহণ করিলেন।

আমরা সকালের উপাসনায় উপস্থিত থাকিতে চাই শুনিয়া বলিলেন, 'আমি তোমাদের নিয়ে একটু আলাদা উপাসনা করতে চাই, তোমাদের আমার কিছু বলবার ইচ্ছে আছে। আমি এখন আশ্রমের ছেলেদের বিদায় দিতে যাচ্ছি, তাদের নিয়ে উপাসনা শেষ হলেই তোমাদের ডাকব। আমি সন্তোষকে ব'লে যাচ্ছি এইখানেই তোমাদের জলখাবার দিতে।'

তিনি চলিয়া গেলেন, কয়েক মিনিট পরে মন্দিরের ঘণ্টাটি গম্ভীর মন্দ্রে বাজিতে আরম্ভ করিল। বাহিরের বারান্দায় আসিয়া চাহিয়া দেখিলাম, ঘণ্টা তিনি নিজেই বাজাইতেছেন। যতদিন দৈহিক সামর্থ্য অটুট ছিল, এই ঘণ্টা-বাজানোর কাজটি তিনি নিজেই করিতেন।

আমরা সেই গাড়িবারান্দার ছাদে বসিয়াই অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। জলযোগাদি সেইখানেই সম্পন্ন হইল। খানিক পরে আমাদের ডাক পড়িল। বালিকাদের লইয়া রবীন্দ্রনাথ মর্মস্পর্শী প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে দেখিলাম। উপাসনার পর আমরাও সজলচক্ষে নিচুবাংলায় ফিরিয়া আসিলাম।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর কবি আর-একবার অতিথিদের খবর লইতে আসিলেন। যে কয়দিন ছিলাম, কখনো এ কাজে তাঁহার অবহেলা দেখি নাই, সকলের সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চলিতেন। তুচ্ছ বলিয়া কোনো-কিছুকে উপেক্ষা করিতেন না। এ দিন আর গান বা পাঠ হইল না, বাবার সঙ্গে সাধারণ নানা বিষয়ে কথাবার্তা হইতে লাগিল। 'গোরা' সম্বন্ধে অনেক কথা হইয়াছিল।

রোদ পড়িলে পারুলবনে বেড়াইতে যাইবার একটা প্রস্তাব উঠিল। বিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরাই এ প্রস্তাবটা করিয়াছিলেন বোধ হয়। দিদি হাঁটিয়া যাইতে পারিবেন না বলিয়া তাহাকে গোরুর গাড়ি করিয়া লইয়া যাইবার ব্যবস্থাও হইয়া গেল। আমাদের ইচ্ছা ছিল যে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ ধরি, কিন্তু সকলে প্রস্তুত হইতে কিছু দেরি হইয়া গেল এবং শুনিলাম তিনি আগেই বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের সঙ্গেও অনেকে চলিলেন, তবে আমরা কয়েকজন কবিবরকে সঙ্গী পাইবার আশায় দ্রুতপদে হাঁটিয়া সকলকে ছাড়াইয়া অগ্রসর হইয়া চলিলাম। কিছুদূর গিয়াই তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম। তাঁহার সঙ্গে কয়েকজন মহিলা এবং বিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন। ছাত্রের দল আমাদের দেখিয়াই এক এক করিয়া পিছাইয়া গেলেন।

পথে চলিতে চলিতে নানারকম হাস্য-পরিহাস হইতে লাগিল। সাধারণ কথাবার্তার ভিতর রঙ ও রস ছড়াইবার ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথের যতখানি ছিল, এমন কখনো কাহারো মধ্যে দেখি নাই। একমাত্র ক্ষিতিমোহনবাবু এ বিষয়ে তাঁহার সুযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

ছোটো ছোটো কথা যেন আলোক-স্ফুলিঙ্গের মতো ঠিকরাইয়া পড়িত। রবীন্দ্রনাথ নিজে গম্ভীরভাবে বলিয়া যাইতেন, শ্রোতারা হাসিয়া আকুল হইত। তাঁহার সম্বন্ধে সকলের সম্ভ্রমবোধ অত্যন্ত অধিক থাকায় অন্যরা কেহ তাঁহার সামনে রসিকতা করার চেষ্টা বিশেষ করিত না, কিন্তু দৈবাৎ কাহারো কথায় কোনো হাস্যরসের উপাদান পাইলে তিনি তাহা যথেষ্টই উপভোগ করিতেন, ইহাও দেখিতাম।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছেলেদের দেখাদেখি আমরাও এখানে খালি পায়ে বেড়াইতাম, তাহা আগেই বলিয়াছি। আশ্রমের গণ্ডির ভিতর ইহা একরকম সহিয়া গিয়াছিল, পথঘাট পরিষ্কার ছিল, কাঁকর ভিন্ন অন্য কিছু পায়ে বড়ো একটা ফুটিত না। বাহিরের মেঠো পথে আসিয়া কিন্তু বিপদ হইল। কাঁটা-ভরা পথে চলিতে গিয়া নিজেরা অত্যন্ত জব্দ হইলাম, কবিবরকে ব্যস্ত করিয়া তুলিলাম। একবার তিনি পরিহাস করিয়া বলিলেন, 'এইজন্যই তো গানে আছে, "সংসার-পথ-সংকট অতি কণ্টকময় হে"।'

মেয়েদের পায়ে যাহাতে কাঁটা না ফোটে এজন্য তিনি অনেক সাবধানতা অবলম্বন করিয়া চলিলেন, অনেককে টানিয়া কণ্টকাকীর্ণ পথ হইতে ফিরাইয়াও আনিলেন।

অনেকদূর আসিয়া হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল যে, আমরা অন্যান্য সকলকে পিছনে রাখিয়া অনেকটা অগ্রসর হইয়া আসিয়াছি। আশ্রমের অধ্যাপক ও ছেলেদের কাহাকেও পিছনে বা আশে-পাশে তাকাইয়া দেখা গেল না। অজিতকুমার চক্রবর্তীর মাতা আমাদের সঙ্গে ছিলেন; তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'একটাও ছেলে যে দেখছি আমাদের সঙ্গে আসে নি, কি হবে?'

রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'কেন, আপনি কি মনে করেছেন যে আমি আপনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারব না? আপনি আমাকে এতই অজ্ঞ মনে করেন?' মুখে ও কথা বলিলেন বটে, তবে সচরাচর যে পথে তাঁহারা পারুলবনে আসিতেন, সে পথে না গিয়া নূতন একটা পথ দিয়া আমাদের বনের ভিতরে লইয়া আসিলেন। জায়গাটি অতি সুন্দর, শুক্লপক্ষের রাত্রি, জ্যোৎস্নার বান ডাকিয়া যাইতেছিল। কিন্তু বেশিক্ষণ বনের ভিতর বেড়ানো হইল না। কবি বলিলেন, 'এখানে সাপটাপ মাঝে মাঝে বেরোয়, এখানে থেকে দরকার নেই, চলো বাইরের মাঠে গিয়ে বসা যাক, এখন বেশ জ্যোৎস্না হয়েছে।'

আমরা বাহির হইয়া আসিয়া একটা খোলা জায়গায় বসিলাম। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'গান ধরা যাক, তা হলে অন্যরা বুঝতে পারবে আমরা কোথায় আছি।' তাঁহার সম্মুখে মেয়েরা কেহ গাহিতে রাজি না হওয়ায়, তিনি নিজেই একটি হিন্দি গান ধরিলেন। যাঁহারা সেকালে তাঁহার গান না শুনিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না যে তাঁহার কণ্ঠ কতখানি মধুর ও শক্তিশালী ছিল। সেই দিগন্তবিস্তৃত মাঠ তাঁহার একার কণ্ঠস্বরে কাঁপিয়া উঠিতেছিল। কতকগুলি ছেলে হঠাৎ বন হইতে বাহির হইয়া আমাদের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে মনে করিলেন ইহারা বুঝি আশ্রমেরই ছেলে, জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ দিক দিয়ে তোরা কোথা থেকে এলি রে?'

তাহারা বলিল, 'আজ্ঞে, আমরা পারুলডাঙার।'

রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, 'যা বাপু, তোদের কোনো দরকার নেই।' কিন্তু তাঁহার দরকার না থাকিলেও ছেলেগুলির দরকার ছিল দেখা গেল। তাহারা চলিয়া না গিয়া একটু দূরে সরিয়া বসিয়া গান শুনিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই আরো কতকগুলি লোক মাঠের উপর দিয়া আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখা গেল। তাঁহাদের একজনের বিরাট দেহ এবং কাঁধের উপর লম্বিত এস্রাজ দেখিয়া কাহারো মনে আর সন্দেহ রহিল না যে ইঁহারা সত্যই আশ্রমের দল। সকলেই দেখিতে দেখিতে আসিয়া জুটিলেন এবং মাঠের মধ্যে ছোটোখাটো একটি সভা বসিয়া গেল। আবার গান গাহিবার অনুরোধ চলিতে লাগিল। 'পুষ্প ফুটে কোন কুঞ্জবনে' গানটি কবিকে গাহিতে বলায় তিনি বলিলেন, 'এখানে তো খালি কাঁটা ফুটে।'

গান অনেকগুলিই পরে পরে হইল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কয়েকটি হিন্দি ও বাংলা গান গাহিলেন। দিনেন্দ্রনাথ ও অজিতকুমার চক্রবর্তী মিলিয়া আরো কয়েকটি গান করিলেন। গান আরো চলিত বোধ হয়, কিন্তু দিনেন্দ্রনাথের এস্রাজের ছড়ি রজনবিহনে হঠাৎ অচল হইয়া উঠিল। মাটিতে ঘষা এবং কাপড় দিয়া মোছা প্রভৃতি নানারকম চিকিৎসার কল্যাণে অবস্থা আরো সাঙ্ঘাতিক হইয়া দাঁড়াইল, অগত্যা তাঁহাদের গানবাজনা বন্ধই করিতে হইল।

অতঃপর মেয়েদের গান করিতে বলা হইল। সকলেই রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের সম্মুখে গান করিতে নারাজ। অনেক অনুরোধ-উপরোধের পর শ্রীমতী অরুন্ধতী সরকার (পরে চট্টোপাধ্যায়) একটি হিন্দি গান করিলেন। ত্রিশ বৎসর আগে কবে কি গান শুনিয়াছিলাম তাহা সাধারণত মনে থাকিবার কথা নয়। এই গানটি কেন জানি না মনে আছে, তাহার প্রথম লাইন--

'দুখ দে গয়ো, সুখ লে গয়ো, পরদেশী সৈঁয়া।'

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনকে কবি গান গাহিতে অনুরোধ করায় তিনি তাঁহার অতুলনীয় বাগবৈদগ্ধের সাহায্যে মুক্তিলাভ করিবার চেষ্টা করিলেন। বলিলেন, পাকা আম সামনে থাকিতে আমসি কেহ খায় না। রবীন্দ্রনাথ কোনো একটা জায়গার নাম করিলেন, সেখানে পাকা ল্যাংড়া আম থাকা সত্ত্বেও তিনি মানুষকে আমসি খাইতে দেখিয়াছিলেন। ক্ষিতিমোহনবাবুকে শেষ পর্যন্ত একটি হিন্দি গান গাহিতে হইল।

অতঃপর আমরা বাড়ি ফিরিবার জন্য উঠিয়া পড়িলাম। ফেরার পথেও সকলে একসঙ্গে আসিতে পারিলাম না, নানা দলে বিভক্ত হইয়া গেলাম। আমরা অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ ছাড়িলাম না। মাঠের ভিতর দিয়া আসিতে আসিতে হঠাৎ 'গুম' করিয়া একটা শব্দ হইল। কিসের শব্দ জিজ্ঞাসা করায় কবি গম্ভীরভাবেই বলিলেন, 'সাড়ে-ন'টার তোপ পড়ল।' তিনিও যে ঠাট্টা করিতে পারেন ইহা বার বার দেখিয়াও আমাদের বিশ্বাস হয় নাই, তিনি যাহা বলিতেন প্রথম প্রথম সমস্তই বেদবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লইতাম। একটি মেয়ে আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'তোপ কোথায় পড়ল?' রবীন্দ্রনাথ আবার তেমনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'ফোর্ট উইলিয়মে।' দুই-তিনজন মেয়ে সত্যই ঘড়ি মিলাইয়া লইল।

পরে তাঁহাকে হাসিতে দেখিয়া নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিল।

সারা পথ রবীন্দ্রনাথ গান করিতে করিতে আসিলেন, কখনো হিন্দি কখনো-বা স্বরচিত বাংলা গান। 'নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও' গানটি অনেকক্ষণ ধরিয়া করিয়াছিলেন।

নিচুবাংলার কাছে আসিয়া তিনি বলিলেন, 'তোমরা এখন বাড়ি ফেরো, আমি খেয়ে-দেয়ে আবার তোমাদের ওখানে যাব, বিদায় নিতে।'

আমরা ফিরিয়া আসিলাম। মন ভারাক্রান্ত ও বিষাদপূর্ণ। দুইদিনের জন্য বেড়াইতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু বোধ হইতে লাগিল যেন চিরজীবনের আশ্রয় ছাড়িয়া যাইতেছি। বিভিন্ন জন্মে ভগবান মানুষের বিভিন্ন ঘর নির্দেশ করিয়া দেন, কিন্তু অনন্ত আশ্রয়ও তো থাকে, তাহার সন্ধান এইখানে পাইয়াছিলাম, তাই চলিয়া আসিতে প্রাণ এত কাঁদিয়াছিল।

জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখিয়া বাগানে বেড়াইতে লাগিলাম। যদিও ট্রেন রাত তিনটায়, তবু শুইতে বা ঘুমাইতে একেবারে ইচ্ছা করিল না। রাত্রি বারোটারও পরে দেখিলাম শান্তিনিকেতনের দিক হইতে একজন কেহ আমাদের বাড়ির দিকে আসিতেছেন, সঙ্গে আলো। জগৎ-বরেণ্য মহাপুরুষ সামান্য কয়টি বালিকার নিকট বিদায় লইবার জন্য অত রাত্রে হাঁটিয়া আসিতেছেন, তখন ব্যাপারটাকে কি সাধারণই না ভাবিয়াছিলাম।

তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। আমার মাথায় ও মুখে সাদরে হাত বুলাইয়া বলিলেন, 'আমি বিদায় নিতে এসেছি বটে, কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আবার শীঘ্রই দেখা হবে।' কয়েকজন অতিথির তখনো খাওয়া হয় নাই, সেইখানে গিয়া অল্পক্ষণ দাঁড়াইলেন, দুই-চারিটা কথা বলিলেন, তাহার পর আবার হাঁটিয়াই ফিরিয়া চলিলেন।

গভীর রাত্রে শান্তিনিকেতন ছাড়িয়া চলিলাম। অত রাত্রেও সন্তোষবাবু এবং তাঁহার সহকারি ছেলের দল উপস্থিত ছিলেন, যাহাতে অতিথিরা কোনোরকম অসুবিধায় না পড়েন। চাহিয়া দেখিলাম, শান্তিনিকেতনের দিক হইতে তখনো একটি আলো দেখা যাইতেছে। অনেকেই হাঁটিয়া স্টেশনে আসিলাম। রাত তিনটার ট্রেন ধরিয়া সকালে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

মনটা বড়োই অস্থির হইয়া রহিল। আগেকার জীবন হইতে কেমন করিয়া যেন অনেকখানি দূরে সরিয়া গেলাম। নূতন একটি দৃষ্টি খুলিয়া গেল, যেন উপনয়নের পর দ্বিজত্ব লাভ করিলাম। চোখে দেখা ও কানে শোনার জগতের উপর হইতে একটি অদৃশ্য যবনিকা উঠিয়া গেল, অন্তরালে যে নিত্যসুন্দর আর-একটি জগৎ আছে তাহারই পরিচয় নানাভাবে নানাক্ষণে হৃদয়ের দুয়ারে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল।

ইহার পর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার দেখা হইল ১৯১১-র জুলাই মাসে। তখন তিনি কলিকাতায় প্রায়ই আসিতেন। নূতন কোনো লেখা হইয়াছে জানিলেই কলিকাতাবাসী ভক্তবৃন্দ তাহা শুনিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিতেন। সকলের তো ক্রমাগত শান্তিনিকেতনে গিয়া উৎপাত করিলে চলে না, সুতরাং সকলের আগ্রহাতিশয্যে তিনিই দুই-এক মাস পরে পরে কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার অনুরক্ত ভক্তবৃন্দকে কৃতার্থ করিয়া

যাইতেন। আমরা আশ্রমে গিয়া যে প্রশ্রয় পাইয়াছিলাম তাহা বহুকাল ধরিয়াই উপভোগ করিয়াছিলাম। সর্বসাধারণের জন্য যে বক্তৃতাদির আয়োজন হইত, সেগুলিতে তো উপস্থিত থাকিতামই, তাহা ছাড়া শুধু আমাদের ছোটো দলটি যাহাতে নিভৃতে তাঁহার কাছে গিয়া বসিতে পারে, তাহার আয়োজনও প্রায় প্রত্যেকবারই হইত। বন্ধুবর প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ এইগুলির ব্যবস্থা করিতে সর্বদা তৎপর ছিলেন, ইহার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা তাঁহার প্রাপ্য।

বাবার সঙ্গে চিঠিপত্র লেখা কবির প্রায়ই চলিত। সুতরাং তাঁহার খবর ও আশ্রমের খবর সারাক্ষণই পাইতাম। আবার উৎসব হইলেই আমরা শান্তিনিকেতনে যাইব এই ইচ্ছা প্রকাশ করায় বাবা সে কথা রবীন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বাবাকে লিখিলেন, 'উৎসব হলে তাঁরা আসবেন এ কোনো কাজের কথা নয়, তাঁরা যখন আসবেন তখনি উৎসব।'

'অচলায়তন' নাটকটি এই সময় রচিত হয়। তাহা শুনিবার জন্য সকলেই অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। জুলাই মাসের গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিলেন। নানাস্থানে নিমন্ত্রণের আতিশয্যে আমরা প্রথম দু-একদিন তাঁহার দেখা পাইলাম না। পরে শুনিলাম নাটকটি প্রশান্তচন্দ্রদের বাড়িতেই পড়িয়া শোনানো হইবে এবং কবি আমাদের বাড়িতে আসিয়া একবার দেখা করিয়া যাইবেন।

কি আকুল আগ্রহেই তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতাম তাহা তো এখনো ভুলি নাই। এই আগ্রহের অবসান কোনো দিনই হয় নাই, কিন্তু বিধাতা এই প্রতীক্ষার অবসান এ জন্মের মতো ঘটাইয়া দিলেন। তবু বুদ্ধির অতীত কিছু দিয়া এখনো মনে হয়, এ প্রতীক্ষারও শেষ হয় নাই, অন্য কোনো লোকে তাঁহাকে প্রণাম করিবার, তাঁহার আশীর্বাদ পাইবার সৌভাগ্য আবার ফিরিয়া পাইব।

সেদিন রবিবার ছিল। বিকাল হইতে-না-হইতে আমরা কয়জন বারান্দায় দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিলাম, কতক্ষণে তিনি আসিবেন। প্রশান্তচন্দ্রের বাড়ি ইহারই মধ্যে অনেকে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঘণ্টাখানিক পরে রবীন্দ্রনাথ আসিলেন, সঙ্গে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা দেবী। ইঁহার ডাকনাম ছিল বেলা। বহুদিন হইল ইনি ধরার বন্ধন কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ইন্দ্রাণীতুল্য রূপ এখনো আমার চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে।

কবি আসিয়া বাবাকে বলিলেন, 'রামানন্দবাবু, আপনি মনে করবেন না যে আপনিই কেবল কন্যাদের নিয়ে বেড়াতে পারেন, আমিও পারি।'

রবীন্দ্রনাথ প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র ছিলেন বটে, কিন্তু বড়োমানুষী তাঁহার ভিতর বিন্দুমাত্রও ছিল না। সাধারণ ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়িতে অনেক সময় চলিয়া আসিতেন, এমন-কি, দু-একবার জোড়াসাঁকো হইতে কর্নওয়ালিস স্ট্রিট পর্যন্ত হাঁটিয়া চলিয়া আসিতেও তাঁহাকে দেখিয়াছি। আমাদের সমাজপাড়ার সেই বাড়িটি অতি ক্ষুদ্র ও সাধারণ ছিল, কিন্তু কতবার তাঁহার চরণরেণু-স্পর্শে তাহা ধন্য হইয়াছে। প্রবাসী-অফিসের

সাজসরঞ্জাম তখন এতই দীন ছিল যে তাহার বর্ণনা করিলে এখনকার দিনে মানরক্ষা হয় না। সেই স্বল্পালোক ছোটো ঘরটিতে সাধারণ কাঠের টুলে বসিয়া কতদিন তাঁহাকে বাবার সঙ্গে ও চারুবাবুর সঙ্গে গল্প করিতে দেখিয়াছি। চারুবাবুকে তিনি স্নেহ করিতেন, অনেক সময় তাঁহার কলিকাতা-আগমনের সংবাদ চারুচন্দ্রই প্রথম পাইতেন। পোস্টকার্ডে 'অয়মহং ভো' এই কথাটি মাত্র লিখিত থাকিত, কিন্তু হাতের লেখাই লেখককে ধরাইয়া দিত।

রবীন্দ্রনাথ উপরে উঠিয়া আসিয়া অল্পক্ষণই বসিয়াছিলেন, কারণ নাটক-পাঠের তাড়া ছিল, শ্রোতার দল আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল। আমার মায়ের সঙ্গে তাঁহার ইতিপূর্বে পরিচয় ছিল না। পরিচয় হওয়ার পর কন্যাকে দেখাইয়া বলিলেন, 'আমরা তো আপনার মেয়ে-দুটিকে একরকম দখল ক'রে নিয়েছি, তাই আমার একটিকে নিয়ে এলাম।' বেলা দেবীকে স্বল্পভাষিণী বোধ হইল, দুই-চারটি মাত্র কথা বলিয়া চুপ করিয়া গেলেন।

অল্পক্ষণ পরেই তাঁহারা উঠিয়া পড়িলেন। আমরাও তাঁহাদের সঙ্গেই চলিলাম। পাঠের ব্যবস্থা যে জায়গায় হইয়াছিল, লোক তাহার তুলনায় অতিরিক্তই হইয়া গিয়াছিল। ক্রমাগতই একজনের পর একজন নূতন শ্রোতা আসিতেছেন এবং রবীন্দ্রনাথ আবার গোড়া হইতে আরম্ভ করিতেছেন। 'অচলায়তনে' অনেক গান, সবগুলি তিনি একলাই গাহিয়া গেলেন, তবে গলা একটু ভার থাকায় নিচু গলায়ই গাহিলেন। লোকের ভিড়ে আর কথাবার্তা বলিবার কোনো সুবিধা হইল না। তাহার পরদিনই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গেলেন।

ইতিপূর্বে কবিতা পড়া বিশেষ অভ্যাস ছিল না। শান্তিনিকেতন হইতে ফিরিয়া চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে সম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আগাগোড়া সব পড়িয়া ফেলিলাম। সবই যে বুঝিলাম তাহা বলিতে পারি না, তবে তাহাতে রসগ্রহণের কোনো বাধা জন্মিল না।

'অচলায়তন' প্রথমে প্রবাসীতে ছাপা হয়। পাণ্ডুলিপিখানি যখন বাবার কাছে আসিল তখন দেখিলাম কবি দুইটি গান কাটিয়া দিয়াছেন। একটি গান, 'কবে তুমি আসবে বলে রইব না বসে, আমি চলব বাহিরে।' ইহা পরে অধুনালুপ্ত 'সুপ্রভাত' মাসিকপত্রে আবার দিবালোক দেখিয়াছিল এবং প্রচুর সমাদর লাভ করিয়াছিল। দ্বিতীয়টি আর কোথাও কোনোদিন দেখি নাই। গানটি এই—

বাজে রে বাজে রে
ওই রুদ্র তালে বজ্রভেরী,
দলে দলে চলে প্রলয়-রঙ্গে বীর-সাজে রে।
দ্বিধা ত্রাস আলস-নিদ্রা ভাঙো গো জোরে,
উড়ে দীপ্ত বিজয়কেতু শূন্য-মাঝে রে।
আছে কে পড়িয়া পিছে মিছে কাজে রে।

আমাদের সর্বকনিষ্ঠ ভাই মুলুকে এই সময় হইতে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে

পাঠাইবার কথা হইতে লাগিল। বাবার সঙ্গে গিয়া সে একবার ব্রহ্মচর্যাশ্রম দেখিয়াও আসিল। রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়া সে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। বিশেষ করিয়া কবিবরের হাসি বালকের মনোহরণ করিয়াছিল। তখনি তাহার অবশ্য যাওয়া হইল না, কয়েক বৎসর পরে সে গিয়াছিল। তাহার স্বাস্থ্য ভালো ছিল না, এইজন্য অত অল্পবয়সে তাহাকে বোর্ডিঙে পাঠানো গেল না।

৩

এই সময় কলিকাতায় প্রতি বৎসর পূজার আগে 'স্বদেশী মেলা' বলিয়া একটি মেলা বসিত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরের প্রায় সামনাসামনি, একটু উত্তরে, একখণ্ড খোলা জমি ছিল। বাল্যকালে জায়গাটাকে আমরা 'পান্তির মাঠ' বলিয়া জানিতাম। এইখানে চালা বাঁধিয়া উপরি উপরি কয়েক বৎসর মেলা হইয়াছিল। মেলাতে বেড়াইতে গিয়া আর-একবার বেলা দেবীর সঙ্গে দেখা হইল। তাঁহার সঙ্গে শ্রীমতী প্রতিমা দেবীও আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে এই প্রথম দেখিলাম। অল্পকাল পূর্বেই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া অত্যন্ত খুশি হইলাম।

ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ আবার কলিকাতায় আসিলেন। আসিবার খবর আগেই পাইয়াছিলাম। ১৩ অগাস্ট ১৯১১ বোধ হয় তিনি কলিকাতায় আসেন। পরদিন সকালে শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রতিমা দেবীকে সঙ্গে করিয়া আমাদের বাড়ি একবার বেড়াইয়া গেলেন। প্রতিমা দেবী পুরাতন বন্ধুর মতো অতি সহজভাবে অনেক গল্প করিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'তোমাদের কলেজের সময় এসে সব লণ্ডভণ্ড ক'রে দিলাম না তো?'

সপ্তাহখানিক পরে প্রতিমা দেবীর নিমন্ত্রণে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বিকালবেলা আমরা দুই বোনে বেড়াইতে গেলাম। এ বাড়ি পূর্বে কখনো দেখি নাই। উহা আমাদের জাতির, আমাদের সমাজের তীর্থক্ষেত্র ; দেখিয়া মনে একটা শ্রদ্ধাজড়িত পুলকের সঞ্চার হইল।

একজন দরোয়ান আমাদের পথপ্রদর্শক হইয়া ভিতরে লইয়া চলিল। প্রায় যখন তেতলার সিঁড়ির মাঝামাঝি আসিয়াছি তখন রবীন্দ্রনাথের দেখা পাইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'একেবারে সোজা উপরে উঠবে, না মাঝে বিশ্রামের দরকার?'

বিশ্রামের কোনো প্রয়োজন ছিল না, সোজা উপরেই উঠিলাম। তেতলার একটি ঘরে বসিলাম, প্রতিমা দেবী আসিলেন। শুনিলাম এই ঘরে পূর্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বাস করিতেন। এই ঘরে তাঁহাদের পরিবারের অনেকের ছবি দেখিলাম। মৃণালিনী দেবীর বড়ো একখানি ছবি দেখিলাম। প্রতিমা দেবীর সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত বাড়িখানি দেখিয়া আসিলাম। বিরাট বাড়ি, সমস্তটা বেড়াইয়া আসিতে অনেক সময় লাগিল। তখন ইহা লোকজনে গমগম করিত সারাক্ষণ। কে কোথায় থাকেন তাহাও জানিয়া লইলাম।

মিষ্টিমুখ করার অনুরোধ আসিল। কিছু খাইতেও হইল। রবীন্দ্রনাথ এতক্ষণ

কোথায় ছিলেন জানি না, এখন আসিয়া বলিলেন, 'আমি চাই যে তোমাদের খুব ভাব হয়। কিন্তু আমি থাকলে আর কেউ কথাই বল না, সব কথা একলা আমাকেই বলতে হয়, তাই আমি তোমাদের একলা ছেড়ে দিয়েছি।' শুনিলাম সকালে দুইজন মহিলা বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা একেবারেই কথা বলেন নাই; তাই কবির এই অভিযোগ।

বেলা দেবীও শেষের দিকে আসিয়া জুটিলেন, তিনি কি একটা কাজে আটকা পড়িয়া গিয়াছিলেন, তাই এতক্ষণ আসিতে পারেন নাই। তিনিও অনেক গল্প করিলেন এবার। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কেও সেদিন প্রথম দেখিলাম।

২১ অগাস্ট ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে রবীন্দ্রনাথের একটি বক্তৃতা হয়। জনতার চাপে প্রায় মন্দিরের দরজা-জানালা ভাঙিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। অনেক আগে গিয়া বসিবার স্থান দখল করিয়াছিলাম, কিন্তু শেষ অবধি রাখিতে পারি নাই। দাঁড়াইয়াই বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম। বক্তৃতার পরদিনই রাত্রে বোধ হয় কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গেলেন। যাইবার দিনও বিকালবেলা একবার আমাদের বাড়ি বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি তখনো স্কুল হইতে ফিরি নাই, সুতরাং তাঁহার দর্শন পাইলাম না।

এই সময় হইতেই শুনিতে লাগিলাম যে রবীন্দ্রনাথ শীঘ্রই তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া বিলাত-যাত্রা করিবেন। অবশ্য ১৯১১ খৃস্টাব্দের ভিতর উহা ঘটিয়া উঠে নাই, পরের বৎসর তিনি গিয়াছিলেন। পূজার ছুটির আগেই শান্তিনিকেতনে 'শারদোৎসব' অভিনীত হইবে শুনিলাম। যাইবার জন্য জেদ ধরিলাম এবং নানা বিঘ্ন-বাধা আসিয়া জোটা সত্ত্বেও সে জেদ কিছুতেই ছাড়িলাম না। আমাদের পুরাতন দলের অনেকে এবার যাইতে পারিলেন না, তবে নূতন অনেক সহযাত্রী ও সহযাত্রিণী জুটিলেন। ইহাও ১৯১১-র শরৎকালের কথা। ২২ সেপ্টেম্বর যাত্রা করিয়াছিলাম।

ট্রেন ছাড়িবার খানিক পরেই উপরের অমলনীল আকাশ, আর দুই ধারের মাঠে বনে শারদশ্রীর উজ্জ্বল প্রাচুর্যে মনটা কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল। ধানের ক্ষেতের সেই উচ্ছল সবুজ ঢেউ আর মাঝে মাঝে কাশফুলের হাতছানি এখনো মনে পড়ে। মেমারি বলিয়া একটি ছোটো স্টেশনে নামিয়া পড়িয়া গোছা গোছা কাশফুল তুলিয়া আনিয়াছিলাম।

রাত্রি হইয়া আসিল, দেখিতে দেখিতে বোলপুর স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। এবার দেখিলাম নেপালবাবু কয়েকটি ছাত্রকে সঙ্গে করিয়া আমাদিগকে আশ্রমে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। সেই পূর্বপরিচিত বলদের বসটিও হাজির। এবার ঠিক করিয়াই আসিয়াছিলাম যে জোর করিয়া হাঁটিয়া যাইব, কিন্তু হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যাওয়াতে সে সংকল্প আর রহিল না। বস্-এ চড়িয়াই যাত্রা করিলাম, তবে অল্পক্ষণের ভিতরেই বৃষ্টি থামিয়া যাওয়াতে আবার নামিয়া পড়িয়া হাঁটিয়াই গেলাম। অমাবস্যার রাত্রি, তবু হাঁটিতে কোনো কষ্ট হইল না। নেপালবাবুর সঙ্গে গল্প করিতে করিতে কিছুক্ষণের ভিতরই নিচুবাংলার সামনে আসিয়া পৌঁছিলাম। দেখিলাম, কয়েকজন মহিলাকে সঙ্গে করিয়া স্বয়ং

কবি আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সেখানে দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী এবং দিনেন্দ্রনাথের পত্নী কমলার সঙ্গে পরিচয় হইল। শৈলবালাকেও উপস্থিত দেখিলাম।

সকলের সঙ্গে নিচুবাংলার ভিতরে প্রবেশ করিলাম। এবারেও এখানেই আমাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। তবে বাহিরের ঘরখানি আর খালি ছিল না, পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তখন ফিরিয়া আসিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথও বাবাকে সঙ্গে করিয়া ভিতরের উঠানে আসিলেন। সেইখানে কয়েকটি চেয়ার অতিথিদের জন্য পাতা ছিল। তাঁহারা সেইখানে বসিয়া কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। আমরাও কাছেই বসিয়া মৃদুস্বরে গল্প করিতে লাগিলাম। এমন সময় আর-এক পশলা বৃষ্টি আসাতে সকলে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে ঢুকিলাম। হেমলতা দেবী রবীন্দ্রনাথকে খাটের উপর বসিতে বলায় তিনি বলিলেন, 'মেয়েরা এটা invidious distinction মনে করবেন।'

অধ্যাপক যদুনাথ সরকার এই সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার চেহারা তাঁহার বয়স ও খ্যাতির তুলনায় অত্যন্ত কাঁচা দেখিয়া আমরা কিছু বিস্মিত হইয়াছিলাম। রাত্রে খাইবার সময় পুরুষ অতিথিরাও আমাদের সঙ্গে বসিলেন। অধ্যাপক সরকার যে শুধু দেখিতেই অল্পবয়স্কের মতো ছিলেন তাহা নহে, খাইতেনও অত্যন্ত কম। মেয়েরা খাওয়া শেষ করিতে দেরি করিত অনেক, কারণ গল্প করাটা হইত খাওয়ার চেয়ে অনেক বেশি। সরকার মহাশয় ততক্ষণ হাত গুটাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে সামনে ঝুকিয়া পড়িয়া দেখিতেন পরিবেশন ঠিকমতো হইতেছে কি না ও সকলের খাওয়া শেষ হইয়াছে কি না।

শুইতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল, ঘুমাইতে রাত্রি হইল তাহারো অধিক। বড়ো গরম ছিল, খানিক পরেই খাটের উপর হইতে নামিয়া পড়িয়া আমরা মাটিতেই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সকালে মন্দিরে উপাসনা হইবে শুনিয়াছিলাম, পাছে ঠিক সময় উঠিতে না পারি এই ভাবনায় আর ঘুমই হইল না।

ভোরবেলা উঠিয়া, যথাসময়ের পূর্বেই মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। আজও দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ঘণ্টা বাজাইলেন। উপাসনান্তে খানিক এদিক-ওদিক ঘুরিলাম, খানিক ফুল কুড়াইলাম। সন্তোষবাবুর গোশালাও আর-একবার দেখিয়া আসিলাম। আমাদের জলখাবার ঠিক হইয়াছে, খবর পাইলাম চাকরের মুখে ; আমরা তখন অতিথিশালার বাড়িতে ফিরিয়া আসিলাম। এইখানেই জলযোগের আয়োজন হইয়াছিল। উপাসনার পর অনেকেই এখানে আসিয়া বসিয়াছেন দেখিলাম। জলযোগের পর গান শুনিবার প্রস্তাব উঠিল। সেইদিনই রাত্রে অভিনয়, সুতরাং গায়কের দল কেহই গান করিতে রাজি হইলেন না, বলিলেন রাত্রে তাহা হইলে গলা ধরিয়া যাইবে। কিন্তু তখনকার দিনে জেদ কখনো ছাড়িতাম না, সেদিনও গান শুনিয়া তবে ছাড়িলাম। প্রথমে অজিতকুমার চক্রবর্তী একটি গান গাহিয়া শুনাইলেন। রবীন্দ্রনাথ ততক্ষণ নিজের গানের খাতার সন্ধান করিতে গেলেন। খাতা

আনিয়া তিনিও গোটা-দুই গান শুনাইয়া দিলেন, দিনেন্দ্রনাথ সঙ্গে এস্রাজ বাজাইলেন। তিনজনে মিলিয়াও গান হইল। মেয়েরাও গান গাহিতে অনুরুদ্ধ হইলেন, কিন্তু প্রথমে কাহাকেও সম্মত করা গেল না। অনেক অনুরোধের পর কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের দুই কন্যা একটি গান করিলেন। রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া আমরা বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

খাওয়া-দাওয়ার পর অনেকক্ষণ এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরিয়া সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিলাম। একবার ছাতিমতলায় গিয়া কিছুক্ষণ বসিলাম। ঠিক সেই সময় ধুলা উড়াইয়া, ডালপালা ভাঙিয়া, প্রচণ্ড ঝড় ছুটিয়া আসিল। ঝড়ের হাত হইতে রক্ষা পাইবার আশায়ও খানিকটা এবং কোনো ছাদ হইতে ঝড়ের পূর্ণ বিক্রম দেখার ইচ্ছায়ও খানিকটা, আমরা তাড়াতাড়ি সন্তোষবাবুদের বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে দেখি রবীন্দ্রনাথ বসিয়া আছেন, কাজেই ঝড় দেখা বা বৃষ্টিতে ভিজার ইচ্ছাটা পুরোপুরি মিটিল না। নানা বিষয়ে কথা হইতে লাগিল, এমন-কি আমিও সংকোচ ত্যাগ করিয়া অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম। এই সময় কবির আর-এক পরিচয় পাইলাম। তিনি যে আবার চিকিৎসকের কাজও করেন তাহা আগে জানিতাম না। তাঁহার পাশে দেখিলাম একটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স। তিন-চার মিনিট পরে পরে এক-একজন রোগী আসিয়া জুটিতে লাগিলেন এবং ঔষধ লইয়া যাইতে লাগিলেন। কাহারো মাথা ধরিয়াছে, কাহারো গলা ভাঙিয়াছে, কাহারো জ্বর, কাহারো পেটের গোলমাল। রবীন্দ্রনাথ সকলকেই ঔষধ দিতেছিলেন। সেদিন রাত্রে অভিনয় বলিয়া বোধ হয় সকলের সুস্থ থাকিবার ঝোঁকটা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

বহুকাল আগে দার্জিলিং বেড়াইতে গিয়াছিলেন— তাহার কথা, বিলাতযাত্রার কথা, অনেক গল্পই সেদিন রবীন্দ্রনাথ করিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গল্পগুচ্ছের ভিতর কোন গল্পটা তোমার সবচেয়ে ভালো লাগে?' আমি প্রথমে বলিলাম 'সবগুলিই খুব ভালো লাগে।' তাহার পর বলিলাম, 'ক্ষুধিত পাষাণ গল্পটিই সবচেয়ে ভালো।' দাক্ষিণাত্যের যে প্রাসাদটি দেখিয়া তিনি এই গল্প রচনা করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধেও অনেক কথা বলিলেন। পাঁচ-ছয়জন মিলিয়া মুখে মুখে গল্প রচনা করার একটা খেলা তাঁহারা খেলিতেন, সে কাহিনীও শুনিলাম। দলের একজন গল্পকে নানা লোমহর্ষক অবস্থায় ফেলিয়া হাল ছাড়িয়া দিতেন, উদ্ধারের ভার পড়িত রবীন্দ্রনাথের উপর। অনেক সময় গল্পের আদি ও অন্ত দুয়েরই তাল সামলাইতে হইত তাঁহাকে। 'দুরাশা', 'গুপ্তধন' প্রভৃতি অনেক গল্পই নাকি এইভাবে রচিত হইয়াছিল।

আমাদের সঙ্গে দুই-চারজন ছিলেন যাঁহারা কবির নিকটে আসিবার সৌভাগ্য ইতিপূর্বে পান নাই। তাঁহাদের ভিতর একটি বালিকার একান্ত ইচ্ছা যে তাঁহার গান শোনে। কিন্তু নিজে বলিতে সাহস না পাইয়া সে ক্রমাগত আমার কানে কানে অনুরোধটা জানাইতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন ব্যাপারটা কি। মুখ ফুটিয়া অনুরোধ জানানো মাত্রই হাসিয়া বলিলেন, 'এই পরামর্শ হচ্ছিল বুঝি এতক্ষণ?'

রাত্রে অভিনয়, সকলেই নিজের নিজের গলা সযত্নে বাঁচাইয়া চলিতেছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তবু বালিকার আগ্রহ পূর্ণ করিতে অস্বীকার করিলেন না। একটা গান গাহিয়াই নেপালবাবুকে ডাক দিয়া বলিলেন, 'নেপালবাবু, দেখুন এরা তো আমাকে ধরে গানটান করিয়ে নিচ্ছে, আপনি তো আমাকে রক্ষা করতে পারলেন না।'

নেপালবাবু ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বলিলেন, 'আমি তো গান শুনেই ছুটে এলাম।' ইহার পরেও ঘণ্টা-খানিক সেখানে বসিয়া গল্প করিয়া তবে আমরা বাড়ি ফিরিলাম।'

নিচুবাংলায় ফিরিয়া খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করিতে হইল। ইহার আগের-বার সঙ্গে অভিভাবিকা কেহ না থাকায় ইচ্ছামতো রোদে ঘুরিয়া বেড়ানো যাইত, এবার মা সঙ্গে থাকায় সে সুবিধা হইল না। বিকালে আবার বেড়াইতে বাহির হইয়া মাঠে, বনে, লাল মাটির রাস্তায় অনেকখানি ঘুরিয়া আসিলাম। সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিয়া, খাওয়া-দাওয়া সারিয়া, 'শারদোৎসব' অভিনয় দেখিতে চলিলাম। গিয়া পৌঁছিবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই অভিনয় আরম্ভ হইল। অভিনয় তখনকার দিনে সর্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া বোধ হইত, কোনো ত্রুটি তো চোখে পড়িত না। বালকদের গান ও নৃত্য এত সুন্দর লাগিয়াছিল যে ত্রিশ বৎসর পরেও উহা যেন চোখের সম্মুখে দেখিতে পাই। দুইটি গানের কথা বিশেষ করিয়া মনে পড়ে, 'আমার নয়ন-ভুলানো এলে', এবং 'আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ'। রবীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং এবারেও তাঁহাকে তাঁহার সাধারণ বেশের বিশেষ কিছু পরিবর্তন করিতে হয় নাই, শুধু মাথায় একটি গেরুয়া রঙের পাগড়ি বাঁধিয়া আসিয়াছিলেন।

এইবার লালচে কাগজের উপর ছাপা একটি প্রোগ্রাম পাইলাম। এটি এখনো আমার কাছে আছে। নূতন তিনটি গান রচিত হইয়াছে, তাহা উহাতেই দেখিলাম। একটি 'ওগো শেফালিবনের মনের কামনা', দ্বিতীয়, 'আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি', তৃতীয়, 'আমাদের শান্তিনিকেতন'। প্রোগ্রামটি কলিকাতার আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেসে ছাপানো, ইহাতে নাটকের পাত্রদের নামও ছাপা হইয়াছিল। ঠাকুরদাদা সাজিয়াছিলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী, লক্ষেশ্বর শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়। প্রমথনাথ বিশী সাজিয়াছিলেন ধনপতি। বালকদের ভিতরেও অনেকে এখন জনসমাজে সুপরিচিত।

অভিনয়ান্তে খানিকক্ষণ নাট্যঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিলাম। কিন্তু কবি অন্যত্র ব্যস্ত থাকাতে তখন আর তাঁহার দেখা মিলিল না। নিচুবাংলায় ফিরিয়া আসিয়া খাওয়া-দাওয়া সারিয়া শুইয়া পড়া গেল। পরদিনটাও আমাদের থাকিয়া যাইবার কথা। কিভাবে এই সময়টুকু কাটানো হইবে সে বিষয়ে অনেক গবেষণা হইল। রবীন্দ্রনাথের নবরচিত নাটক 'ডাকঘর' শুনিতেই হইবে এ বিষয়ে কাহারো দ্বিমত হইল না।

Visva-Bharati Quarterly-র যে Tagore Birthday Number বাহির হইয়াছে, তাহাতে 'অচলায়তন' ও 'ডাকঘর' দুইটিই ১৯১২ খৃস্টাব্দে রচিত বলিয়া লেখা আছে।

পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়তো ১৯১২-তে হইয়া থাকিবে, কিন্তু রচিত হইয়াছিল দুইটিই ১৯১১-র মধ্যে।

অভিনয়ের শেষে ছেলেরা 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গানটি গাহিয়া পালা সাঙ্গ করিল। নাট্যঘর হইতে বাহির হইয়া অনেক রাত পর্যন্ত তাহারা আশ্রমের পথে পথে এই গানটি গাহিয়া ফিরিয়াছিল।

পরদিন সকালটা মাঠে ও খোয়াইয়ে বেড়াইয়া কাটিয়া গেল। এই খোয়াইগুলিও এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন আশ্রম এত বিস্তৃতি লাভ করে নাই, চারি দিকেই এই বালখিল্য পাহাড়শ্রেণী দেখা যাইত। ভিতর দিয়া বহিয়া যাইত স্বচ্ছ জলের ধারা। ইহার মেটে লাল রঙটার কেমন একটা স্নিগ্ধতা ছিল, চোখ জুড়াইয়া যাইত।

ইহার পর অতিথিশালার বাড়ির দিকে চলিলাম। সেইখানে 'ডাকঘর' পাঠ হইবার কথা ছিল। সকলেই কিছু কিছু পুষ্প-অর্ঘ্য বহন করিয়া লইয়া গেলাম কবিকে উপহার দিবার জন্য।

অতিথিশালার দোতলার মাঝের ঘরটিতে বসিয়া 'ডাকঘর' পড়া হইল। পাঠ সাঙ্গ হওয়ার পর শ্রোতার দল একেবারে নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন, কাহারো মুখ দিয়া একটিও কথা বাহির হইল না।

এই সময় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। খুব দ্রুতগতিতে আসিলেন এবং রবীন্দ্রনাথকে কয়েকটা প্রশ্ন করিয়া ও তাহার উত্তর লইয়া, তেমনি দ্রুতগতিতে চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে এই প্রথম দেখিলাম। তাঁহার বয়স তখন সত্তর পার হইয়া গিয়াছে, তবু দেহ বেশ ঋজু ও সবল। তাঁহার চক্ষু-দুইটি বড়ো অসাধারণ ছিল, এমন প্রদীপ্ত দৃষ্টি আর কখনো দেখি নাই।

ইহার পর ফিরিয়া আসিলাম। রবীন্দ্রনাথ দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন বলিলেন। আসিয়াও ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা তখন কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছিলাম; তাঁহার সঙ্গে নামেমাত্র দেখা হইল, কথাবার্তা বলিবার সুযোগ ঘটিল না। তিনি এইমাত্র ফিরিয়া গিয়াছেন শুনিয়া দ্রুতপদে হাঁটিয়া গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম ও বিদায় লইয়া আসিলাম।

বিকালের গাড়িতে কলিকাতা যাত্রা করিলাম। গোরুর গাড়ি চড়িয়া স্টেশনে আসিলাম, পুরুষ অতিথিরা হাঁটিয়াই আসিলেন। অনেকেই নিজের নিজের ব্যাগ ও স্যুটকেস হাতে করিয়া বহন করিতেছেন দেখিয়া আমরা সেগুলি গাড়িতে তুলিয়া লইলাম। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কিছুতেই তাঁহার ব্যাগটি হাতছাড়া করিলেন না, ইহা লইয়া অনেক হাসাহাসি হইল।

স্টেশনে আসিয়া খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল, কারণ আমরা কিঞ্চিৎ আগে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। ট্রেন যথাসময়ে আসিল, সকলে উঠিয়া পড়িলাম। বিদ্যালয়ের অনেকগুলি ছাত্রও এইসঙ্গে উঠিল। সকলকে বিদায় দিতে একদল ছাত্র আসিয়াছিল, তাহারা ট্রেন ছাড়িবামাত্র সমস্বরে, 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গানটি আরম্ভ করিল। ট্রেন যখন

প্রায় প্ল্যাটফর্ম ছাড়াইয়া গিয়াছে, তখনো দেখিলাম তাহারা গাড়ির সঙ্গে ছুটিতে ছুটিতে গান করিতেছে—

'আমাদের শান্তিনিকেতন,
আমাদের সব হতে আপন।'

শাঁকটিগড় (শক্তিগড়) বলিয়া একটা স্টেশনে আমাদেরই ট্রেনের তলায় একজন মানুষ কাটা পড়িল। মৃত্যুবিভীষিকার করাল ছায়া আমাদের উৎসবের আনন্দকে একেবারে ম্লান করিয়া দিল। গাড়ির কি একটা গোলমাল হওয়াতে কলিকাতায় আসিয়াও বাড়ি পৌঁছিতে অনেক রাত হইয়া গেল।

কবিবরের সপরিবারে বিলাত-যাত্রার কথা তখনো চলিতেছে, নানাপ্রকার আয়োজনও আরম্ভ হইয়াছে। এই-সকল আয়োজনের সম্পর্কেই বোধ হয় পূজার ছুটির মধ্যে তিনি একবার কলিকাতায় আসিলেন। ২ অক্টোবর তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য জোড়াসাঁকোর বাড়িতে গেলাম। সেদিন বিজয়া দশমী, রাস্তায় প্রচুর জনতা দেখিলাম। এবারেও তিনিই আসিয়া সর্বপ্রথম আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। সেই তেতলার ঘরটিতেই গিয়া বসিলাম। বেলা দেবী আসিলেন ; প্রতিমা দেবী বাজার করিতে গিয়াছেন, এখনি ফিরিবেন বলিয়া শুনিলাম। রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমরা এ ঘরে থাকলে তোমরা কথা বলবে তো? না, চুপ ক'রে থাকবে?' বাধ্য হইয়া তখন কিছু কথা বলিতেই হইল। সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথও তখনি নিজেও কথা আরম্ভ করিলেন। তিনি যখন কথা বলিতেন তখন অন্য কাহারো কথা বলিবার ইচ্ছাই যে শুধু হইত না তাহা নহে, প্রয়োজনও অল্পই হইত। তাঁহাদের বিলাত-যাত্রার প্রসঙ্গ উঠিল, দেখিলাম তখনো পাকাপাকি কিছুই স্থির হয় নাই। আমাদেরও তাঁহার সঙ্গে যাইতে বলায় আমি বলিলাম, 'আমরা গিয়ে কি করব?'

রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'আমার রাঁধুনী ক'রে নিয়ে যেতে পারি, রাঁধতে জান তো?

রাত্রে আর-এক জায়গায় নিমন্ত্রণ ছিল বলিয়া সেদিন আমরা তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলাম।

এই সময় কলিকাতায় তিনি মাসখানেকের উপর ছিলেন বোধ হয়। অনেকবার তাঁহার দর্শনলাভের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। যাত্রার দিন পাকাপাকি কিছুতেই স্থির হয় না, নানাপ্রকার বাধা পড়িতে লাগিল। কখনো শুনিতাম তিনি দুই বৎসরের অধিক সেখানে থাকিবেন, কখনো শুনিতাম অতি অল্পদিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিবেন। বহুদিন তাঁহার অদর্শনের সম্ভাবনাটা আমাদের বড়োই কাতর করিয়া তুলিত। পার্থিব জীবনে বিচ্ছেদ-দুঃখ আছে, ইহা তখন একটা কথার কথা বলিয়া জানিতাম, অনুভব তখনো করি নাই। আজ জীবনের অনেকখানি পথ মাড়াইয়া আসিয়াছি, বিচ্ছেদ যে কতখানি ভয়ানক হইতে পারে, নিরাশা কতখানি অতলস্পর্শী হইতে পারে, সকলই ভগবান বুঝাইয়া দিয়াছেন। তবে সেইসঙ্গে বিশ্বাস দিয়াছেন যে, পৃথিবীর বিচ্ছেদটাই শেষ কথা নয়, ইহারো পরে

অনন্তজীবন অপেক্ষা করিয়া আছে। যাঁহাদের হারাইয়া প্রাণ আজ হাহাকার করিতেছে তাঁহারা সত্যই হারান নাই।

প্রশান্তচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রফুল্ল (আমাদের কাছে বুলা নামেই সুপরিচিত) শান্তিনিকেতনের ছাত্র। তিনি এই সময় কিছু অসুস্থ হইয়া বিদ্যালয় হইতে কলিকাতার বাড়িতে চলিয়া আসেন। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি ছাত্রকে রবীন্দ্রনাথ নিজের সন্তানের মতো স্নেহ করিতেন। এই বালকটিকে দেখিতে একদিন তিনি তাঁহাদের বাড়ি আসিলেন। দিনটা ১২ অক্টোবর। আমাদের বাড়ি একই পাড়ায়, কবি আসিয়াছেন শুনিয়াই ছুটিয়া গেলাম। তাঁহার চেহারা একটু খারাপ দেখিলাম, বোধ হয় অসুস্থ ছিলেন। প্রশান্তচন্দ্রের পিতামহ গুরুচরণ মহলানবীশ মহাশয় তখন জীবিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অতি দীর্ঘাকৃতি পুরুষ ছিলেন, ঘরে ঢুকিবার সময় তাঁহার মাথা প্রায় চৌকাঠে ঠেকিয়া যাইতেছে দেখিয়া বৃদ্ধ মহলানবীশ মহাশয় বলিলেন, 'আমি তো জানতাম না যে প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র কোনোদিন আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবেন, তা হলে দরজাগুলো আরো উঁচু ক'রে করতাম।'

নিজে অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ বুলার পাশে বসিয়া গল্প করিলেন। আগে যখন বিলাতে গিয়াছিলেন, তখন কেমন শীত সহ্য করিতে পারিতেন, একবার ভুলক্রমে হোটেলে কিরকম ব্যাঙের তরকারি খাইয়া ফেলিয়াছিলেন, ইত্যাদি অনেক গল্প শুনিলাম। চলিয়া যাইবার সময় কবিবর আশ্বাস দিয়া গেলেন যে শীঘ্রই আবার দেখা হইবে।

সেই সময় তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে খুব ঘটা করিয়া টাউন-হলে কবি-সংবর্ধনার একটা কথা চলিতেছিল। আয়োজন বাঙালিমতে অতি ধীর গতিতে হইতেছিল, তবু এ বিষয়ে আলোচনা প্রায়ই শুনিতাম। তিনি বিলাত চলিয়া যাইবার আগে ইহা ঘটিয়া উঠিবে কি না সে বিষয়ে সকলেরই সন্দেহ ছিল।

১৪ অক্টোবর তিনি একবার আমাদের বাড়িতে বেড়াইতে আসিলেন। অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলিয়া আর-একবার বুলাকে দেখিতে গেলেন। তাঁহার জাহাজটা যাহাতে ছাড়িতে না পারে সেইরকম কামনা আমাদের অনেকের মনে জাগিতেছে শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'তার চেয়ে তোমরা আমার সঙ্গেই চলো-না? তা হলে সব দিক দিয়েই ভালো হয়, বেশ জমেও উঠবে।'

যাইবার সময় আবার অভ্যাসমতো বলিয়া গেলেন, শীঘ্রই আবার দেখা হইবে।

আজ এ আশ্বাস কোথাও পাই না কেন? পৃথিবীর জীবনের ভিতর আর দেখা হইবে না জানি; যদি অন্য কোথাও অন্যভাবে দেখা হয় তাহাতে এই মর্ত জীবনের কোনো আনন্দের স্মৃতি থাকিবে কি?

৩০ আশ্বিন তখন মহা ধুম করিয়া রাখীবন্ধন হইত। অনেক গানের মিছিল, অনেক সভা, ইত্যাদি হইত। অনেকের বাড়ি সেদিন অরন্ধন, আমরাও তাহা পালন

করিতাম। রাখীবন্ধনের দিন পরিচিত অনেকেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে গিয়াছিলেন, আমরা যাইতে না পাওয়ায় বড়োই নিরাশ হইলাম। লাল ও হলদে রেশমিসুতা দিয়া আমরা তখন নিজেরাই বাড়িতে অতি সুন্দর রাখী তৈয়ারি করিতাম ও পরিচিত সকলের বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া রাখী বাঁধিয়া বেড়াইতাম।

এই সময় প্রায়ই তিনি আসিতেন। কখনো-বা নীচে অফিসের ঘরে বসিয়া গল্প করিতেন, কখনো উপরে উঠিয়া আমাদের সঙ্গে দেখা করিয়া যাইতেন। ভাইফোঁটার দিন একবার আসিয়াছিলেন। 'জীবনস্মৃতি'র পাণ্ডুলিপিখানি চাহিয়া লইয়া গেলেন, কিছু পরিবর্ধন করিবেন বলিয়া। তাঁহার ন'দির (স্বর্ণকুমারী দেবীর) বাড়ি ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণ ছিল বলিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন।

অল্পবয়স্কদের সঙ্গই যেন তাঁহাকে সর্বদা বেশি আনন্দ দিত। ছেলেমেয়েরাও তাঁহাকে পাইয়া বসিত। দেবতাকে মানুষ যেমনভাবে ভক্তি করে ও ভালোবাসে, সেই ভক্তি ও ভালোবাসা মানুষ হইয়া একমাত্র তাঁহাকেই পাইতে দেখিয়াছি, কিন্তু দেবতার মতো তিনি দুরধিগম্য ছিলেন না। বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, এমন-কি ছোটো শিশুও তাঁহাকে নিকটতম আত্মীয় অপেক্ষাও ভালোবাসিত। অথচ তাঁহার সামনে ছ্যাবলামি করিতে বা হুড়াহুড়ি করিতে অতি দুরন্ত ছেলেকেও কখনো দেখি নাই, তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলেই আপনা হইতে মাথা ভক্তিতে নত হইত।

রিপন কলেজে এই সময় তাঁহার একটি বক্তৃতা হয়। কর্তৃপক্ষেরা মেয়েদের বসিবার কোনো ব্যবস্থা করেন নাই বলিয়া আমাদের সেখানে যাওয়া হইল না। ইহার পরই তিনি কিছুদিনের জন্য শিলাইদহে চলিয়া গেলেন। যাইবার আগে প্রতিমা দেবী ও তিনি আমাদের বাড়ি একদিন বেড়াইতে আসিয়াছিলেন।

১৯১১ সালে নভেম্বর মাসের শেষের দিকে তিনি আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। শিলাইদহে থাকিতেও বাবার কাছে প্রায়ই চিঠি লিখিতেন, তাহাতে তাঁহার খবর পাইতাম। আমাদের পাশের বাড়ির দোতলায় তখন অজিতকুমার চক্রবর্তীর মাতা ও পত্নী বাস করিতেন, তাঁহাদের কাছ হইতেও রবীন্দ্রনাথের সংবাদ পাওয়া যাইত। অজিতবাবুর প্রথমা কন্যা তখন শিশু, তাহাকে লইয়া আমরা সারাদিন কাড়াকাড়ি করিতাম। মা তাহাকে 'পারুলদিদি' বলিয়া ডাকিতেন। সত্যই ফুলের মতোই সে সুন্দর ছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রথম যখন তাহাকে দেখেন তখন শিশু হাত বাড়াইয়া তাঁহার একটি আঙুল ধরিয়াছিল, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, 'এ যে দেখি এখনি পাণিগ্রহণ করছে।'

এই সময় রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীর একটি পুত্র জন্মলাভ করে। মীরা দেবী ইহার পর কিছুকাল অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। তখনো তাঁহাকে চোখে দেখি নাই, কিন্তু তাঁহার অসুখের খবর শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম। ইহারই কয়েক দিনের মধ্যে কলিকাতায় বেশ মাঝারি গোছের একটা ভূমিকম্প হইয়া গেল।

কন্যার অসুস্থতার সংবাদে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসাতে আবার তাঁহার দেখা পাইলাম। মীরা দেবীও ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

৪

১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসটায় রাজা পঞ্চম জর্জ কলিকাতায় আসাতে এখানে প্রচুর জনসমাগম হয়। তাহার উপর কংগ্রেসের একটি অধিবেশন এবং থীস্টিক কন্‌ফারেন্সের (একেশ্বরবাদীদের সম্মেলনের) অধিবেশন প্রভৃতিও হইয়া গেল। শুনিলাম শেষোক্ত কন্‌ফারেন্সে একদিন রবীন্দ্রনাথ আসিয়া বক্তৃতা দিবেন।

পুরাতন সিটি কলেজ গৃহে এই কন্‌ফারেন্স হইয়াছিল। এখন সেই বাড়িটিতে সিটি স্কুল হয়। বাড়িটি পুরাতন, নড়বড়ে গোছের, সিঁড়িটিও সংকীর্ণ ছিল। রবীন্দ্রনাথ আসিবেন শুনিয়া সেদিন যে কী বিপুল জনতা হইয়াছিল তাহা, যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারাই মনে করিতে পারিবেন। প্রতি মুহূর্তেই ভয় হইতেছিল যে জনতার ঠেলায় এইবার জীর্ণ বাড়িটি ধরাশায়ী হইবে, এবং আমরাও জীবন্তসমাধি লাভ করিব। ভাগ্যক্রমে সেইদিনই আবার শ্রীযুক্ত সরোজিনী নাইডুও সভাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্যও ঠেলাঠেলি পড়িয়া গেল। সেই তাঁহাকে আমি প্রথম দেখিলাম। ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা, তখন তিনি দেখিতে অনেকটাই অন্যরকম ছিলেন।

সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত উল্লাল রঘুনাথাইয়া নামে কেরল-দেশীয় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মনেতা। ইহার পূর্বে বা পরে তাঁহাকে আর কখনো দেখি নাই। তাঁহার চেহারাটি অতি অমায়িক ও ভদ্র, চোখের দৃষ্টিও স্নেহসিক্ত, বিশ্বের সঙ্গে তাঁহার যেন মৈত্রীর সম্পর্ক।

জনতা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, কোলাহলও প্রায় সাগরের গর্জনের মতো শুনাইতে লাগিল। শুনিলাম কবি আসিয়া পৌঁছিয়াছেন সপরিবারেই, কিন্তু ভক্তবৃন্দের ভিড় ঠেলিয়া উপরে আসিতে পারিতেছেন না। কিছু পরে প্রতিমা দেবী প্রভৃতি কয়েকজন কোনোমতে উপরে আসিয়া উঠিলেন। সভা হইতেছিল তিনতলার হলটিতে।

জনতার কোলাহল ক্রমেই বাড়িতেছে দেখিয়া অনুষ্ঠাতারা সভার কার্য আরম্ভ করিয়া দেওয়াই স্থির করিলেন। প্রথমে একটি গান হইল, তাহার পর সভাপতি উঠিয়া প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন। প্রার্থনার ভিতরেই প্রচণ্ড করতালিধ্বনি শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে রবীন্দ্রনাথ ভিড় ঠেলিয়া উপরে উঠিতে পারিয়াছেন। কখন করতালি দেওয়া চলে এবং কখন চলে না সে-বিষয়ে বাঙালি জনতা চিরকালই অজ্ঞ, ত্রিশ বৎসর আগেও ইহার ব্যতিক্রম ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ আসিয়া সভাপতির পাশে আসন গ্রহণ করিলেন, সভার কাজ আবার আরম্ভ হইল। বিদেশী কয়েকজন ভদ্রলোকের বক্তৃতার পর কবি একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। ঘরের ভিতর তাঁহার কণ্ঠস্বর স্পষ্টই শোনা গেল, বাহিরে তখনো পূর্ণ বিক্রমে গোলমাল চলিতেছিল। রবীন্দ্রনাথের পরে বিনয়েন্দ্রনাথ সেন বক্তৃতা করিলেন। একটি গানের পর সভাভঙ্গ হইল। গান শেষ হইবামাত্র রবীন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি নীচে চলিয়া গেলেন। জনতার কোলাহল কোনোদিনই তিনি পছন্দ করিতেন না, তবে চিরদিনই তাহা সহ্য করিয়াছিলেন।

প্রতিমা দেবীর নিকট শুনিলাম যে বিলাতযাত্রা মার্চ মাসে হইবে বলিয়া কথা চলিতেছে, তবে রবীন্দ্রনাথ হয়তো একলাই যাইবেন। ভিড় এইবার কমিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কাজেই আমরা এবার নীচে নামিবার পথ পাইলাম। কবি দোতলার একটি ঘরে গিয়া বসিয়াছিলেন, পথ একেবারে সুগম না হইলে তিনি নামিবেন না শুনিলাম। সন্তোষবাবু প্রভৃতি শান্তিনিকেতনের অনেককেই দূর হইতে দেখিতে পাইলাম। গাড়ি পাওয়া গেল না বলিয়া আমরা এক দল হাঁটিয়াই বাড়ি ফিরিলাম।

ইহার দুই-তিনদিন পরে রবীন্দ্রনাথ দুপুরবেলা হাঁটিয়াই আমাদের বাড়ি বেড়াইতে আসিলেন। স্বর্গীয়া কৃষ্ণভামিনী দাসও সেই সময় আমাদের বাড়ি বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তিনি কবিবরের সাক্ষাৎ পাইয়া বড়োই আনন্দিত হইলেন এবং ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল সম্বন্ধে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিলেন। রবীন্দ্রনাথের মুখেই শুনিলাম, ১৯১২-র মার্চ মাসে তাঁহার যাওয়া একেবারে স্থির, passage পর্যন্ত book করা হইয়া গিয়াছে। বাড়ি ফিরিবার সময়ও তিনি হাঁটিয়া যাইবারই উপক্রম করিতেছিলেন ; চারুচন্দ্র তাড়াতাড়ি সামনে যে গাড়িখানা পাইলেন তাহাই ভাড়া করিয়া আনিলেন। গাড়িটির ছাদ অতি নিচু, কবি হাসিয়া বলিলেন, 'দু-তিন পাট হয়ে কোনোমতে পৌঁছে যাব।' ইহার পরদিন তিনি শান্তিনিকেতনে চলিয়া গেলেন।

১৯১২-র জানুয়ারি মাসে একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নিমন্ত্রণ হইল। শুনিলাম মীরা দেবীর জন্মদিন উপলক্ষেই নিমন্ত্রণ, তবে সেই দিনই তাঁহার জন্মদিন ছিল কি না জানি না। তাঁহার সঙ্গে আলাপ হইল। তাঁহার পুত্রটিকেও দেখিলাম। অনেকগুলি মহিলাকে দেখিলাম, অধিকাংশই ঠাকুর-পরিবার-ভুক্তা। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী সৌদামিনী দেবীকে দেখিলাম। তাঁহার সৌদামিনী নাম সার্থক ছিল।

১৯১২ খৃস্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি টাউন-হলে বিরাট সভায় কবি-সংবর্ধনা হইয়া গেল। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশত্তম জন্মদিনের আট মাস পরে এই সংবর্ধনা হইয়াছিল।

সেদিন আবার মাঘোৎসবের উদ্যান-সম্মিলনের দিন। দুই দিক রক্ষা করিতে গিয়া সারাদিনটাই হুড়াহুড়ির ভিতর দিয়া কাটিয়া গেল। ভয় ছিল পাছে টাউন-হলে গিয়া ভালো জায়গা না পাই। টাউন-হলে পৌঁছিয়া দেখিলাম, সৌভাগ্যক্রমে ভালো জায়গা তখনো অনেক খালি রহিয়াছে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে মেয়েদের হাত দিয়া কবিকে পুষ্প-অর্ঘ্য প্রদান করা হইবে। পৌঁছিয়া শুনিলাম ফুলও আসিয়া গিয়াছে। ফুলের গুচ্ছ হাতে করিয়াই আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। সাহিত্য-পরিষদ হইতে রবীন্দ্রনাথকে একটি সাচ্চা জরির স্তবকের মালা দেওয়া হইবে, তাহার পর মেয়েরা পুষ্পাঞ্জলি দিবেন, তাহার পর পুরুষরা, এইপ্রকার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

আমরা গিয়া দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ তখনো সভাস্থলে আসিয়া পৌঁছান নাই। জনতা কখনো নীরব থাকিতে পারে না, এক-একজন করিয়া সুবিখ্যাত ব্যক্তির আবির্ভাব হয় আর করতালির মহাঘটা পড়িয়া যায়। স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রভৃতি এইপ্রকার করতালির ভিতর দিয়া সভাস্থলে প্রবেশ

করিলেন। গোখলে মহাশয়কে কলিকাতাবাসী অনেকেই দেখেন নাই, তাই তাঁহার প্রবেশের সময় মহা ঠেলাঠেলি লাগিয়া গিয়াছিল।

বিরাট টাউন-হল যখন করতালির শব্দে টলিতে আরম্ভ করিল তখন বুঝিতে পারিলাম রবীন্দ্রনাথ আসিতেছেন। তাঁহার চারি দিকে বিষম ভিড়, মঞ্চের উপর আসিয়া না বসা পর্যন্ত তাঁহাকে একরকম দেখিতেই পাওয়া গেল না। তাহার পর সভার কার্য আরম্ভ হইল ঐকতান বাদ্যের দ্বারা। তখনো এত কোলাহল চলিতেছে যে অতগুলি বাজনার শব্দ তাহার ভিতরে ডুবিয়াই গেল। সভাপতি হইয়াছিলেন সারদাচরণ মিত্র মহাশয়। তিনি যখন বক্তৃতা করিতে উঠিলেন তখন সভাস্থ লোকেরা একটু স্থির হইলেন। তিনি বিদেশী অনেক কবির উদাহরণ দিয়া বলিলেন, কবিদের সম্মান নিজেদের দেশে প্রায়ই হয় না। রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা করিয়া তাঁহারা নিজেদেরই সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন।

অতঃপর পণ্ডিত ঠাকুরপ্রসাদ আচার্য সংস্কৃতে স্বস্তিবাচন করিলেন। সাহিত্য-পরিষদ হইতে যে অভিনন্দন দেওয়া হইল তাহা পাঠ করিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়। রচনাটিও তাঁহারই। তাঁহার সেই আনন্দবিকশিত মুখ এখনো মনে পড়ে। কেমন জলদগম্ভীরস্বরে 'কবিবর, শঙ্কর তোমায় জয়যুক্ত করুন' বলিয়া, শেষ করিলেন। তাহা এখনো কানে বাজিতেছে। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী-রচিত একটি গান, তাহার প্রথম লাইন 'বাণীবরতনয়, আজি স্বাগত সভামাঝে,' এই সভায় গীত হইল গায়ক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ও একটি অভিনন্দন পাঠ করিয়াছিলেন। সকলেই কবির শতায়ু কামনা করিলেন। কিন্তু মানুষের কামনা চিরকালই বিধাতার বিধানের কাছে হার মানে তাহা তো সর্বদাই দেখিতেছি।

রবীন্দ্রনাথকে অনেকগুলি স্বর্ণ ও রৌপ্যের সুন্দর উপঢৌকন দেওয়া হইয়াছিল, তাহার ভিতর একটি সোনার পদ্মফুল ছিল। রামেন্দ্রসুন্দর কবিকে জরির স্তবকের মালা পরাইয়া এই ফুলটি উপহার দিলেন। সভার লোকেরা উপহারগুলি দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় হস্তিদন্তের ফলকে উৎকীর্ণ অভিনন্দনটি একবার উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া দেখাইলেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখনো জীবিত ছিলেন। তিনি বহু বৎসর পূর্বে বাল্মীকি-প্রতিভা নাটক অভিনয় দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের নামে একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, সেইটি এতকাল পরে তিনি পড়িয়া শুনাইলেন এবং কবিকে উপহার দিলেন। কবিতাটি এই—

উঠো বঙ্গভূমি, মাতঃ ঘুমায়ে থেকো না আর,
অজ্ঞানতিমিরে তব সুপ্রভাত হল হেরো।
উঠেছে নবীন রবি, জগতের ছবি,
নব 'বাল্মীকি-প্রতিভা' দেখাইতে পুনর্বার।
হেরো তাহে প্রাণ ভরে, সুখতৃষ্ণা যাবে দূরে,
ঘুচিবে মনের ভ্রান্তি, পাবে শান্তি অনিবার,

'মণিময় ধূলিরাশি', খোঁজ যাহা দিবানিশি,
ও ভাবে মজিলে মন, খুঁজিতে চাবে না আর।

ইহার পর রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দনের উত্তর দিতে উঠিলেন। তিনি নিজেকে উপলক্ষমাত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া সেদিনকার সভায় প্রাপ্ত সকল সম্মান ও আদর জননীবাণী ও দেশের দেবতার চরণে উৎসর্গ করিয়া দিলেন।

ইহার পরে ডাক পড়িল মেয়েদের পুষ্প-অর্ঘ্য দিবার জন্য। অনেক ঠেলাঠেলির পর একটা রাস্তা পরিষ্কার হইল এবং বালিকারা সকলে অগ্রসর হইয়া গেলাম। দুই-চারিজন মহিলাও আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। রবীন্দ্রনাথ হাস্যমুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পুষ্প-উপহার গ্রহণ করিলেন। তাহার পর সাহিত্যিকবৃন্দ তাঁহাদের পুষ্প-অর্ঘ্য লইয়া অগ্রসর হইলেন। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে এইখানে একবার মাত্র দেখিয়াছিলাম। তিনি লোকের ভিড়ে কিছুতেই অগ্রসর হইতে না পারিয়া বড়োই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। অবশেষে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া সামনে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। তিনিও কবির হাতে ফুলের তোড়া উপহার দিলেন। সংগীত ও ঐকতান-বাদ্যের পর সভাভঙ্গ হইল। প্রবল জয়ধ্বনির ভিতর রবীন্দ্রনাথ বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার গাড়ি আগাগোড়া ফুলে সজ্জিত করা হইল। টাউন-হলের এক দিকে রবীন্দ্রনাথের ফোটোগ্রাফের ছোটো একটি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল, তাহাও গিয়া দেখিয়া আসিলাম।

জনতা যেমন বন্যাস্রোতের মতো আসিয়াছিল তেমনি চলিয়াও গেল। অল্পক্ষণের ভিতরেই আমরা বাহির হইতে পারিলাম এবং ট্রামে করিয়াই বাড়ি ফিরিলাম।

পরদিন রবীন্দ্রনাথের দেখা পাইলাম। আমাদের দোতলার ঘরে আসিয়া বসিয়া আগের দিনের সভার অনেক গল্প তিনি করিয়া গেলেন। ভিড়ে আমাদের কোনো কষ্ট হইয়াছিল কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। সভাপতিমহাশয় বড়ো তাড়াতাড়ি সব চুকাইয়া ফেলিতে চাহিয়াছিলেন, সেই কথার প্রসঙ্গে বলিলেন, 'আমার ইচ্ছে ছিল দাঁড়িয়ে সকলের সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলি, কিন্তু যে President, আমাকে যেন একেবারে engine-এ জুতে দিয়েছিলেন, এক মিনিটও কোথাও দাঁড়াতে দিলেন না। কোনোরকমে টেনে বের ক'রে দিলেন।'

ইউরোপে গিয়া কিছুকাল নরওয়েতে বাস করিবেন বলিলেন। তাঁহার এক বন্ধু নাকি তাঁহাকে Land of the Midnight Sun দেখিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বাবাকেও আমাদের লইয়া বিলাত যাইতে বলিলেন। পরদিন তাঁহাদের বাড়িতে বাবাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া আমাদের বলিলেন, 'তোমাদের নিমন্ত্রণ রহিল পরিবেশন করবার।' আমাদের কি একটা কারণে সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা ঘটিয়া উঠিল না।

এই বৎসর ১১ মাঘ রাত্রে জোড়াসাঁকো বাড়ির উৎসবে রবীন্দ্রনাথ আচার্য হইবেন শুনিয়াছিলাম। ভালো জায়গা পাইবার লোভে অনেক আগে গিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, আমাদেরও আগে অনেকে আসিয়া বসিয়া আছেন। অত বড়ো দালান, উপরের চারি-

পাশ-ঘোরানো বারান্দা, সব লোকে ভরিয়া উঠিয়াছে। পরিচিত লোক প্রচুর দেখিলাম। আমাদের স্কুলের দুই-তিনজন খৃস্টান শিক্ষয়িত্রীকে সেখানে দেখিয়া বড়োই বিস্মিত হইয়াছিলাম তাহা মনে আছে। তখন অল্প বয়সের বুদ্ধিহীনতায় বুঝিতে পারিতাম না যে রবীন্দ্রনাথ কোনো বিশেষ সমাজের সম্পত্তি নহেন।

ঠাকুরদালানটি বড়োই সুন্দর করিয়া সাজানো হইয়াছিল। উপরে প্রথমে চন্দ্রাতপ ছিল, পরে তাহা সরাইয়া দেওয়া হইল। মেয়েরা যেদিকে বসিয়াছিলেন তাহার সামনাসামনি উপাসনার স্থান, গানের ব্যবস্থাও সেইখানে। অনেকগুলি বিপুল বাদ্যযন্ত্রের আবির্ভাব হইল, গায়করাও আসিয়া বসিলেন। গম্ভীর মধুর মন্দ্রে পূজার ঘণ্টা বাজিতে আরম্ভ হইল। এই সময় রবীন্দ্রনাথ ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে উপাচার্যরূপে আসিয়া বসিলেন শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ উদ্বোধন ও উপদেশের ভার লইয়াছিলেন, স্বাধ্যায়ের ভার ছিল চট্টোপাধ্যায়-মহাশয়ের উপর। উপদেশের পরে দু-লাইন গান গাহিয়া রবীন্দ্রনাথ শেষ করিলেন। গানগুলি যদিও অনেক নামকরা ওস্তাদরা গাহিলেন, তবু শুনিতে কিছু ভালো লাগিল না। রবীন্দ্রনাথ পিছন ফিরিয়া অনেক বার গানের সুর ও তাল সংশোধন করিয়া দিলেন, তাহাতেও সুবিধা হয় না দেখিয়া নিজেই গায়কদের সঙ্গে গান ধরিয়া দিলেন। 'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো', এই গানটি প্রথম শুনিলাম সেইদিন। আর শুনিলাম 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা।' এই মহা-সংগীতটি কয়দিন আগেই রচিত হইয়াছিল।

উপাসনার পর কিছুক্ষণ সেইখানেই দাঁড়াইয়া গল্প করিয়া কাটাইলাম। বাহির হইবার পথ আর কিছুতেই পাই না, এত লোকের ভিড়। অবশেষে উপরে উঠিয়া গেলাম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রবর্তিত নিয়মানুসারে তখনো ১১ মাঘ রাত্রে বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়ানো হইত। অনুরোধে পড়িয়া কিছু জলযোগও করিতে হইল। পাশের ঘরে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কয়েকজন ভদ্রলোকের খাওয়ার তত্ত্বাবধান করিতেছেন দেখিলাম। এতগুলি মেয়েকে দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া আসিয়া প্রশান্তচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এরা কে?' পরিচয় পাইয়া সস্মিত মুখে দুই-চারিটি কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন।

১২ মাঘ রাত্রে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ একটি বক্তৃতা করিলেন। এখানেও এত অধিক জনসমাগম হইল যে উদ্যোক্তারা ভীত হইয়া উঠিলেন। কবিকে হলের ভিতর আনা ও বাহির করিয়া লইয়া যাওয়াও এক সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। বক্তৃতান্তে কোনোমতে মন্দির হইতে বাহির হইয়া গিয়া তিনি কিছুক্ষণ মহলানবীশ-মহাশয়ের বাড়িতে বসিলেন। সেখানেও অবিলম্বে ভিড় জমিয়া যাইবার উপক্রম দেখিয়া, কন্যা ও পুত্রবধূকে লইয়া অল্পক্ষণ পরেই বাড়ি চলিয়া গেলেন।

৬ ফেব্রুয়ারি ১৯১২ আবার তাঁহার দেখা পাইলাম। সেদিন একলাই আসিয়াছিলেন। বাবা কি কারণে নীচে আটকাইয়া পড়িলেন, কবি উপরে আসিয়া আমাদের সঙ্গেই গল্প করিতে লাগিলেন। পাড়ার আর দুই-চারিটি মেয়েও আসিয়া জুটিল। আমাদের প্রতিবেশী এক ভদ্রলোক আসিয়া খানিকক্ষণ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিষয় তাঁহার সঙ্গে গল্প করিয়া

গেলেন। দিদির তখন আই. এ. পরীক্ষা চলিতেছিল, তাহারই উল্লেখ করিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, 'শান্তা পরীক্ষার চোটে শুকিয়ে গেছে।' রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'হ্যাঁ। আমি কিন্তু ঐ পরীক্ষা জিনিসটার থেকে খুব উৎরে গিয়েছি, যদি পুনর্জন্ম থাকে তা হলে হয়তো আমার কাছ থেকে সুদ-সুদ্ধ আদায় করে নেবে।'

বিলাত-যাত্রার গল্প আজও হইল। প্রথমে হয়তো তিনি ফ্রান্স যাইবেন বলিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, কতদিন তিনি ইউরোপে থাকিবেন। বলিলেন, 'কি জানি, এক বৎসর প্রায় হবে বোধ হয়। যদি গিয়ে দেখি যে ভালো লাগছে না তা হলে হয়তো তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। শেষ যেবার গিয়েছিলুম সেবার আমার term ফুরাবার আগেই চলে এসেছিলুম। তবে এবার বয়স ঢের বেশি হয়েছে, একটু স্থির হয়ে বসে দেখার ইচ্ছে হতে পারে।'

জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপিখানি আমি নকল করিয়া প্রেসে দিতাম, যাহাতে আসল লেখাটি পরিষ্কার থাকে। চৈত্র মাসের কিস্তি নকল হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করাতে আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ।' আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সেটাতে কি হয়েছে? আমি বিলেত গিয়েছি?' বলিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'এবারেও চৈত্রে বিলেত যাচ্ছি। বিলেতের চিঠি দেখতে পাবে তোমরা, যদি অবশ্য চিঠি লিখি। জীবনস্মৃতি আরো খানিকদূর লিখিবার জন্য অনুরোধ করায় বলিলেন, 'বিদ্যালয়ের ছাত্র আর অধ্যাপকদের কাছে মুখে মুখে আরো খানিকটা বলেছিলুম, সন্তোষ সেটার নোট রেখেছিল, যদি তার থেকে সহজে লিখবার কোনো material পাই তা হলে আবার লিখতে পারি।'

ইহার মধ্যে একটি বালিকার নিকট হইতে গান গাহিবার অনুরোধ আসিল। অনুরোধ রক্ষা না করা তখন তাঁহার স্বভাবেই ছিল না। যদিও বালিকার দিকে ফিরিয়া একবার বলিলেন, 'আমি কি আর এখন গাইতে পারি গো?' তবু একটি গান গাহিয়া শুনাইয়াও দিলেন। 'মেঘের 'পরে মেঘ জমেছে, আঁধার করে আসে,' এই গানটি গাহিলেন। গান শেষ করিয়া বলিলেন, 'একবার জগদীশের বাড়ি ঘুরে আসি।' বলিয়া নামিয়া নীচে চলিলেন। তখন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল, আমি লন্ঠন হাতে করিয়া তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছিলাম। সদর দরজার কাছে আসিয়া হাত বাড়াইয়া বলিলেন, 'এবারে আমাকে আলোটা দাও।' তাঁহাকে অবশ্য দিলাম না, দাদার হাতে আলো দিয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

তাঁহার বিলাত-যাত্রা উপলক্ষে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের অনুরক্ত ভক্তের দল 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনয় করিয়া কবিকে দেখাইলেন। শুনিলাম তাহা খুব ভালো হইয়াছিল। দেখিবার সুযোগ ঘটিল না। মেয়েরাও একদল 'বাল্মীকিপ্রতিভা' অভিনয়ের আয়োজন করিতে লাগিলেন। মাঝে কিছুদিনের জন্য তিনি শিলাইদহ চলিয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিলেন ১৯১২ মার্চ মাসের প্রথম দিকে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে তাঁহাকে দিয়া একদিন উপাসনা করাইবার চেষ্টা চলিতেছিল। মধ্যে একদিন আমাদের বাড়ি বেড়াইতে আসিলেন, তাঁহার নিকটেই এ

খবরটা পাইলাম। Mr. Myron Phelps নামক এক আমেরিকান ভদ্রলোক তাঁহার সঙ্গে গল্প করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার গল্পও কিছু শুনিলাম। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'সে ভদ্রলোক নিজে কোনো কথা তো বললেই না, তার উপর আমি যা-কিছু বললুম, তা নোটবুকে টুকে নিলে। আমার সমস্ত কথা যখন ফুরিয়ে গেল তখন আমি হতাশ হয়ে চুপ করে রইলুম, ভাবলুম দেখি এখনো কিছু বলে কি না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে কথা বললেই না, শেষে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি তো তখন বাঁচলুম। বাস্তবিক একতরফা conversation-এর মতো কষ্টকর আর আমার কাছে কিছু লাগে না।' এ কষ্ট তিনি চিরজীবন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কাছে যাঁহারা যাইতেন তাঁহাদের ভিতর অধিকাংশই তাঁহার কথা শুনিতেই যাইতেন, নিজেরা কথা বলিয়া সময় নষ্ট করিতে চাহিতেন না।

ইহার মধ্যে একদিন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া খবর দিলেন যে তিনি বলিয়াছেন, 'আমিও পিতামহের মতো ঐখানেই থেকে যাব।' শ্রোতারা এ কথা শুনিয়া প্রচণ্ড আপত্তি করাতে তাহাদের সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছেন, 'না না, ফিরেই আসব, এখনো আমার এখানে অনেক কাজ বাকি আছে।'

ইহার পরেও যে প্রায় ত্রিশ বৎসর আমাদের মধ্যে ছিলেন সেই সৌভাগ্যের স্মৃতি লইয়াই আমাদের এই হতভাগ্য দেশকে যুগ-যুগান্তর কাটাইতে হইবে। তাঁহার স্থান পূর্ণ করিবে এমন কাহাকেও বিধাতা আর পৃথিবীতে পাঠাইবেন কি? আশা হয় না।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উপাসনা করা বোধ হয় সেবার সম্ভব হইল না। ১৫ মার্চ সেখানে একটি আলোচনা-সভা হইল। বাবা সভাপতি ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রধান বক্তা। এই সভাটি ছাত্রসমাজের উদ্যোগে হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের নাম শুনিলেই যে বিপুল জনতা উপস্থিত হইত তাহা আলোচনা অসম্ভব করিয়া তুলিত। সুতরাং এই সভার কোনো বিজ্ঞাপন বাহিরে দেওয়া হয় নাই। তবু যখন সভাস্থলে গেলাম তখন হল পূর্ণই দেখিলাম। অবশ্য গেট ভাঙা বা জানালা ডিঙাইয়া ভিতরে ঢোকা, এগুলি আর এবার দেখিতে হইল না। সভার আরম্ভে আমাদের পাড়ারই এক তরুণী গান গাহিলেন। রবীন্দ্রনাথের সামনে গান গাহিতে হইবে শুনিয়াই বোধ হয় তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল, সুতরাং অর্গ্যানের শব্দই আমরা শুনিলাম, গান আর কিছু কানে আসিল না। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে ছোটো একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, তাহার পর আলোচনা আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত হীরালাল হালদার, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য প্রভৃতি প্রবীণ ভদ্রলোক কয়েকজন কিছু কিছু বলিবার পর ছাত্র-সমাজের তৎকালীন সভ্যরাও দুই-তিনজন বলিবার চেষ্টা করিলেন। ফল যাহা হইল তাহাতে মনে হয়, ভালো করিয়া প্রস্তুত না হইয়া এ চেষ্টাটা তাঁহারা না করিলেই পারিতেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও অনেক জায়গায় হাসি সংবরণ করিতে পারিতেছেন না দেখিলাম। নয়টা বাজিয়া যাইবার পর বাবা আলোচনা থামাইয়া দিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিতে উঠিলেন। খুব মৃদু কণ্ঠে কথা বলিলেন, পিছনের অনেকে শুনিতে পাইল না। সাড়ে নয়টার পর তিনি সভা ত্যাগ করিলেন।

১৬ মার্চ ১৯১২ ওভারটুন-হলে তাঁহার একটি প্রবন্ধ পাঠের ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রবন্ধটির নাম 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা'। পাড়ার কয়েকজন মেয়ে দল বাঁধিয়া বক্তৃতাস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। চারুচন্দ্র পথ দেখাইয়া ভিতরে লইয়া গেলেন এবং ভালো বসিবার জায়গা জোগাড় করিয়া দিলেন। মেয়েদের জন্য আলাদা কোনো জায়গা করা হয় নাই, সামনের লাইনের চেয়ারে গিয়া আমরা বসিলাম। সেদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের convocation ছিল বলিয়া অনেকেই বেশ দেরি করিয়া আসিলেন দেখিলাম। সভাপতি হইয়াছিলেন আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়। তিনি কিছুক্ষণ পরে তাঁহার পত্নী প্রতিভা দেবীকে সঙ্গে করিয়া সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। খুব একচোট করতালির ঘটা পড়িয়া গেল। প্রতিভা দেবীকে এই প্রথম দেখিলাম।

অল্পক্ষণের ভিতরেই রবীন্দ্রনাথ আসিয়া পৌঁছিলেন, এবং সভার কাজ আরম্ভ হইল। সভাপতিমহাশয় কেন যে ইংরেজিতে কথা বলিলেন তাহা তখন কিছু বুঝিতে পারিলাম না। পরে শুনিয়াছিলাম যে তিনি বাংলায় বক্তৃতা করিতে অভ্যস্ত নহেন। রবীন্দ্রনাথের শরীর অসুস্থ ছিল বলিয়া তিনি চেয়ারে বসিয়াই প্রবন্ধটি পড়িলেন। মাঝে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আসাতে খানিক গোলমাল হইল, কবি কয়েক মিনিটের জন্য থামিয়া গেলেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বসিলে পর আবার আরম্ভ করিলেন।

প্রবন্ধ-পাঠের পর আলোচনা হইবে শুনিয়াছিলাম। কিন্তু সভাপতি বলিলেন যে তাঁহারা যে বক্তৃতা শুনিলেন তাহার উপর আর কোনো আলোচনা চলে না। কয়েকজন ব্যক্তিকে দেখিয়া প্রথম হইতেই মনে হইতেছিল যে জিহ্বা শানাইয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের ভিতর 'নায়ক' পত্রিকার সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বলিয়া মনে আছে। ইঁহাদের ক্ষুণ্ন মুখ দেখিয়া হাসি পাইতেছিল। সভাপতিমহাশয় রবীন্দ্রনাথের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া একটি বক্তৃতা করিলেন, যদিও ইহাও বলিয়া লইলেন যে, বেশি প্রশংসা করা তাঁহার সাজে না, কারণ তিনি রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করিয়াছেন। ত্রিশ বৎসর পূর্বের একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেন, সেদিন রবীন্দ্রনাথ সংগীত সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন এবং পরদিনই বিলাতযাত্রা করেন। আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ও সেবার তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। সভাস্থ সকলকে তিনি কবিবরের শুভযাত্রা ইচ্ছা করিতে অনুরোধ করিলেন। খুব করতালিধ্বনি হইল। স্যার গুরুদাস বক্তা ও সভাপতিকে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া একটি সরস ছোটো বক্তৃতা করিলেন। তাহার পরে বলিলেন চুনীলাল বসু মহাশয়।

বক্তৃতা শেষ হইবার পর বাহিরে আসিলাম। রবীন্দ্রনাথও বাহিরে আসিয়া প্রবন্ধটি বাবাকে দিলেন। বলিলেন, 'অনেক কাটাকুটি আছে, চারুকে একবার ভালো করে দেখে দিতে বলবেন।'

ইহার পরদিনই বোধ হয় ভবানীপুর-সম্মিলন-সমাজে তাঁহার উপাসনা ছিল। এখন সম্মিলন-সমাজ-মন্দির যেখানে তাহারই নিকটে আর-একটি বাড়িতে তখন মন্দির

প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভোরে উঠিয়া ট্রামে করিয়া ভবানীপুর গিয়াছিলাম। পরিচিত অনেক লোককে ট্রামে দেখিলাম। মন্দিরে গিয়া বসিবার অল্প পরেই রবীন্দ্রনাথ আসিলেন। সেদিন তাঁহাকে বড়োই অসুস্থ দেখাইতেছিল, ভাবিলাম হয়তো বেশি পরিশ্রমে এইরূপ হইয়াছে। তাহার পরদিনই তাঁহাদের বিলাতযাত্রা করিবার কথা। সকাল হইতে মেঘলা, খানিক ঝড়বৃষ্টিও হইয়া গেল, মনও যেন কেমন মুষড়াইয়া গেল। উপাসনান্তে রবীন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন, কাহারো সঙ্গে দেখা করিবার জন্য অপেক্ষা করিলেন না। আমরাও বাড়ি ফিরিলাম। পরদিন ভোরবেলাই দাদা বাহির হইয়া গেলেন, বাবাও গেলেন কিছু পরেই। ঘরে বসিয়া কল্পনা করিতে লাগিলাম, রবীন্দ্রনাথ এতক্ষণে জাহাজে উঠিতেছেন বোধ হয়। কিছু পরে বাবা ও দাদা ফিরিয়া আসিলেন। দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, স্টিমারঘাটে কি খুব লোক হইয়াছিল? উত্তরে শুনিলাম রবীন্দ্রনাথের যাওয়াই হয় নাই। আগের রাত্রে বালিগঞ্জে এক পার্টিতে গিয়াছিলেন, ফিরিতে রাত হয়, সারারাত তাহার পর আর ঘুমাইতে পারেন নাই। সকালে যখন যাত্রার সময় আসিল তখন দেখা গেল যে তিনি এত অসুস্থ যে কোনোক্রমেই সেদিন আর তাঁহার যাওয়া সম্ভবপর নয়। তবে কিছু সুস্থ বোধ করিলে দিন-দুই পরে মান্দ্রাজে গিয়া তিনি জাহাজ ধরিতে পারেন। সমস্তদিন তাঁহার খবরের জন্য উদগ্রীব হইয়া রহিলাম এবং নানারকম আশঙ্কাজনক কথা শুনিতে লাগিলাম। বিকালে সন্তোষবাবুর পত্নী শৈলবালার সহিত দেখা হইল, তাঁহার নিকট শুনিলাম যে চিকিৎসকগণ সাতদিন অন্তত রবীন্দ্রনাথের ঘর হইতে বাহির হওয়া বা কথাবার্তা বলা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। দেশসুদ্ধ মানুষ তাহাদের প্রিয়তম কবির এই অকস্মাৎ পীড়ার সংবাদে যেন মুহ্যমান হইয়া গেল।

পরদিন শুনিলাম তিনি কিছু ভালো আছেন, এবং ডাক্তারদের কথা না শুনিয়া বই-খাতা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন। বারণ করিলে বলিতেছেন, 'কথা বললে বল, "কথা বলছ কেন?" চুপ করে থাকলে বল, "অত ভাবছ কেন?" তা হলে আমি করি কি?'

তাঁহার যাত্রায় বাধা পড়া সম্পর্কে নানারকম গল্প শুনিতে লাগিলাম, কিছু সত্য, কিছু গুজবও হইতে পারে। শুনিলাম রবীন্দ্রনাথের অসুখটা কতখানি সাঙ্ঘাতিক তাহা লইয়াও ডাক্তারদের ভিতর প্রচুর মতভেদ হইয়া গিয়াছে। একজন বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথ বলিয়াছেন, 'প্রায় Appoplexy-র মতো, এক মাস তাঁর নড়াচড়া করা একেবারেই চলবে না।' একজন অ্যালোপ্যাথ বলিয়াছেন, 'কিছুই বিশেষ হয় নি, খানিকটা brandy খাইয়ে জাহাজে তুলে দাও।'

তাঁহার অসুখ যেমনি হইয়া থাকুক, বিলাতযাত্রা কিছুদিনের জন্য পিছাইয়া গেল। রোজই তাঁহার খবর সংগ্রহ করিতাম, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে যাইবার অনুমতি কাহারো ছিল না। কখনো শুনিতাম ভালো আছেন, কখনো শুনিতাম তেমন ভালো নাই। কয়েকদিন পরে যখন চারুচন্দ্রের কাছে তিনি 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা'র প্রুফ চাহিয়া পাঠাইলেন তখন আশ্বস্ত হইয়া ভাবিলাম, নিশ্চয়ই খানিকটা ভালো তিনি আছেনই।

ভালো না থাকিলেও কাজ না করিয়া থাকিতে তিনি একেবারেই পারিতেন না, ইহা পরে দেখিয়াছিলাম। রোগ এবং শোক, এই দুইয়েরই ঔষধ ছিল তাঁহার কাজ।

কয়েকদিন পরে বাবা একবার গিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসিলেন। তাঁহার কাছে শুনিলাম, রবীন্দ্রনাথ বিশ্রাম না করিয়া সব কাজই করিতেছেন। এমন-কি আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ি গিয়া 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র গান এবং অভিনয় শিখানোও চলিতেছে। তবে দুই-তিনদিনের ভিতর তিনি শিলাইদহ চলিয়া যাইবেন, সেখানে বাধ্য হইয়া খানিকটা বিশ্রাম তাঁহাকে করিতেই হইবে। দিন-দুই পরে তিনি শিলাইদহে চলিয়া গেলেন।

বিলাত-যাত্রার ধুয়া সমানে চলিতে লাগিল। রোজই প্রায় তাঁহার যাত্রার একটা-না-একটা তারিখ শুনিতাম, আবার এমন-সব লোকের কাছে শুনিতাম যে অবিশ্বাস করিবারও উপায় থাকিত না। মধ্যে বাবার কাছে রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র আসিল, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, 'মাথাটা এখনো নলিনীদলগতজলবত্তরলং টলমল করিয়া উঠে।'

কিছুকাল শিলাইদহে থাকিয়া তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গেলেন। যাইবার পথ কলিকাতা হইয়া, সুতরাং একদিন কলিকাতা বাস করিয়া গেলেন, তবে আমরা তাঁহার দর্শন পাইলাম না। বাবার কাছে চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি শান্তিনিকেতনে যাইতেছেন, এবং সকলকে সেখানে যাইতেও নিমন্ত্রণ করিলেন।

তখনো ১৯১২-ই চলিতেছে। নববর্ষের উৎসবে একবার শান্তিনিকেতনে যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু ঘটিয়া উঠিল না। কতদিন পরে শৈলবালার চিঠিতে জানিলাম যে ১০ বৈশাখ শান্তিনিকেতনে 'রাজা ও রানী' অভিনয় হইবে। দিন-দুই পরে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই উৎসবে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। তখন যাহা-কিছু বাধাবিপত্তি ছিল তাহা প্রায় গায়ের জোরে দূর করিয়া সকলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। এবারের দলটি বিশেষ বড়ো হইল না।

ট্রেনে শান্তিনিকেতন-যাত্রী আরো দুই-চারটি মানুষের দেখা পাওয়া গেল। স্টেশনে নামিয়া দেখিলাম রীতিমতো ঝড় বহিতেছে, তবে বৃষ্টি নাই। সুতরাং হাঁটিয়াই চলিলাম। এবারেও থাকার জায়গা হইয়াছিল নিচুবাংলায়। সেখানে ঢুকিয়া দেখিলাম, অভিনয়ে যাঁহারা স্ত্রীলোকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী তাঁহাদের সাজাইতে গিয়াছেন। তাঁহার কাছে আমাদের আগমন-সংবাদ গেল, তিনি খানিক পরেই ফিরিয়া আসিলেন। খাইয়া-দাইয়া অভিনয় দেখিতে যাওয়ার প্রস্তাব উঠিল, সুতরাং আমরা তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। খাওয়া শেষ করিতে একটু দেরি হইয়া গেল, বিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্র আসিয়া খবর দিলেন যে গান আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আমরা খাওয়া ফেলিয়াই উঠিয়া পড়িলাম এবং একরকম ছুটিতে ছুটিতে নাট্যঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বাবা এবং প্রশান্তচন্দ্রের তখনো খাওয়া হয় নাই, তাঁহারা আমাদের সঙ্গে আসিতে পারিলেন না।

অভিনয় তখন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। দেবদত্ত এবং বিক্রমদেব কথাবার্তা বলিতেছেন। দেবদত্ত সাজিয়াছিলেন ক্ষিতিমোহনবাবু এবং বিক্রমদেব সাজিয়াছিলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী। রবীন্দ্রনাথ তখনো অসুস্থ, সেইজন্য তিনি এবার অভিনয়ে যোগ দেন নাই। সন্তোষবাবু সাজিয়াছিলেন কুমারসেন। মহিলাদের ভূমিকায় ছাত্ররাই বোধ হয় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কাহারো নাম মনে পড়ে না।

রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের বসিবার জায়গার সামনেই বসিয়াছিলেন। ঘরটি তখন প্রায় অন্ধকার, আলো যেটুকু তাহা স্টেজের পাদপ্রদীপ হইতেই আসিতেছিল, সুতরাং তাঁহাকে ভালো করিয়া দেখিতে পাইলাম না। তবে এইটুকু বুঝিলাম যে অসুখের জন্য অনেকটা পরিবর্তন হইয়াছে। অতদূরে বসিয়াই তিনি একরকম রঙ্গমঞ্চের কার্য পরিচালনা করিতেছিলেন। ঘরের ভিতর গোলমাল করার জন্য একবার একটি ভৃত্যকে ভর্ৎসনা করিলেন, ভুল সময়ে যবনিকা ফেলার জন্য আর-একবার দুজন ছাত্রকে বকিলেন। তিনিও যে বকিতে পারেন ইহা সেই আমরা প্রথম দেখিলাম।

অভিনয়ান্তে বাহির হইয়াই ক্ষিতিমোহনবাবু ও সন্তোষবাবুর সঙ্গে দেখা হইল। ক্ষিতিমোহনবাবু তখনি প্রস্থান করিলেন ; বলিলেন ; 'যাই, একবার নারায়ণীর খবর নিয়ে আসি।' সন্তোষবাবুও চলিয়া গেলেন। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে বাহির হইয়া আসিলেন, দেখিলাম তিনি সত্যই অনেক রোগা হইয়া গিয়াছেন, গায়ের রংও ম্লান দেখাইতেছে। তিনি তখনো অতিথিশালার বাড়িতে বাস করিতেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও সেইখানে গিয়া উঠিলাম। বাবা অভিনয় দেখার তাড়ায় খাইয়া আসেন নাই শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ খাবার আনিতে বলিলেন এবং নিজেও সেইসঙ্গে বসিলেন। খাইতে খাইতে নানা বিষয়ে আলোচনা চলিতে লাগিল।

আমার ছোটো ভাই মুলু এবার আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিল। সে কোথায় শুইবে সেই প্রশ্ন উঠিল। মুলুর অতিথিশালার বাড়িটি বড়োই ভালো লাগিয়াছিল, সে প্রথমে সেইখানেই বাবার সঙ্গে শুইতে চাহিল। শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, 'ও বেশ বোঝে যে খাবার বেলা নিচুবাংলা ভালো, কিন্তু শোবার পক্ষে ভালো এই বাড়িটা।' মুলু কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে নিচুবাংলাতেই ফিরিয়া আসিল, বোধ হয় গল্প করার লোভে।

পরদিন সকালে মন্দিরে উপাসনা হইবে শুনিলাম, সুতরাং তাড়াতাড়ি করিয়া শুইতে গেলাম, যাহাতে সময়মতো উঠিতে পারি। অবশ্য সারারাত ভালো করিয়া ঘুম না হওয়াতে যত ভোরে উঠিতে পারিব ভাবিয়াছিলাম তাহা পারি নাই। যাহা হউক, সকালেই উঠিলাম এবং একেবারে মন্দিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই বাহির হইলাম। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীকে বলিয়া গেলাম যে ঘণ্টা শুনিলেই আমরা মন্দিরে চলিয়া যাইব। রাস্তায় বাগানে মাঠে অনেকক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইলাম। মধ্যে সন্তোষবাবু ও অন্যান্য অধ্যাপকদের বাড়িও অল্পক্ষণের জন্য ঘুরিয়া আসিলাম। এই সময়ে মন্দিরের ঘণ্টা শুনিতে পাইয়া সকলে মিলিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইলাম।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সি. এফ. অ্যাণ্ড্রুজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দিনের আলোয় রবীন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলাম যে তাঁহার চেহারা কতখানি খারাপ হইয়াছে, অসুখটা নিতান্ত সামান্য হয় নাই। অসাধারণ দৈহিক ও মানসিক শক্তির জোরেই তিনি কাটাইয়া উঠিয়াছেন। উপদেশের সময় তিনি বিদ্যালয়ের সকলের কাছে বহুকালের মতো বিদায়-প্রার্থনা করিলেন শুনিয়া একটু বিস্মিত ও শঙ্কিত হইলাম। বুঝিলাম আবার বিদেশ-যাত্রার ইচ্ছাটা তাঁহার মনে উদিত হইয়াছে।

উপাসনার পর তিনি বেশিক্ষণ না দাঁড়াইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। অসুস্থ ছিলেন বলিয়া এবারে তাঁহাকে অন্যান্য বারের মতো ঘোরাঘুরি করিতে দেখিলাম না। আমাদের সেইদিন বিকালের গাড়িতেই যাইবার কথা, কিন্তু আশ্রমের সকলেই বার বার করিয়া এই দিনটা থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখনি অবশ্য কিছু স্থির হইল না। নিচুবাংলায় ফিরিয়া জলযোগাদি সারিয়া আবার বেড়াইতে বাহির হইলাম। অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর যখন রোদ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল তখন নিচুবাংলায় ফিরিয়া আসিলাম। সন্তোষবাবুর পত্নী ও ছোটো বোনগুলি আমাদের সঙ্গে বেড়াইতেছিলেন, তাঁহারাও বাড়ি ফিরিলেন। কবির কাছে আর-একবার যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তিনি তখন অধ্যাপক-সভায় ব্যস্ত আছেন শুনিয়া আর গেলাম না। খাইয়া-দাইয়া দুপুরবেলাটা ঘরের ভিতরেই কাটাইয়া দিলাম। রোদ তখন এত ভয়ানক যে বাহিরে যাইবার ভরসা হইল না। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়া সময়টা আনন্দেই কাটিয়া গেল।

তখনো স্থির ছিল যে আমরা সন্ধ্যার ট্রেনে চলিয়া যাইব। জিনিসপত্র সব গুছাইয়া রাখিয়া অতিথিশালার দিকে চলিলাম বিদায় লইবার জন্য। ঢুকিতে যাইব এমন সময় দেখিলাম যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় নামিয়া আসিতেছেন। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী আমাদের সকলের পরিচয় দিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ তখনি চলিয়া গেলেন।

দোতলায় উঠিয়া দেখিলাম, মাঝের বড়ো ঘরখানিতে রবীন্দ্রনাথ, বাবা এবং রথীবাবু বসিয়া আছেন। তাঁহাদের তখন খাওয়ার আয়োজন চলিতেছে। আমরা অন্য দিকে বসিয়া নিজেরা গল্প করিতে লাগিলাম। খাওয়ার পর কবি আমাদের কাছে আসিয়া বসিলেন। বলিলেন, 'এবার অনেক নূতন গান লিখেছি, অজিতের কাছে শুনো।'

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তখন শান্তিনিকেতনে অধ্যাপকের কাজ করিতেন। এই সময় তাঁহার বিবাহ হয়। অধ্যাপকরা একদল বরযাত্রী হইয়া চলিয়াছিলেন, তাঁহারা এই সময় রবীন্দ্রনাথের নিকট বিদায় লইতে আসিলেন। কবি বলিলেন, 'কি, সব লুচিমণ্ডার লোভে চলেছ? মিষ্টান্নম্ ইতরে জনাঃ।'

নানা প্রয়োজনে তাঁহার কাছে ক্রমাগতই লোক আসিতেছে দেখিয়া আমরা ঘর হইতে বাহির হইয়া ছাদে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মুলু এবং আমাদের সঙ্গিনী একটি বালিকা খুব ছুটাছুটি আরম্ভ করিল। খানিক পরে নামিয়া আসিলাম। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'ছাদে দেখছি তোমরা কৃত্রিম মেঘগর্জনের সৃষ্টি করেছিলে। করছিলে কি তোমরা? ছাদেই সাঁতার দিচ্ছিলে নাকি?'

আশুতোষ চৌধুরী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল শৈলেশচন্দ্র মজুমদার

আবার কিছুক্ষণ Mr. Myron Phelps-এর গল্প হইল। রবীন্দ্রনাথ মধ্যে স্থির করিয়াছিলেন যে শিলাইদহে কতকগুলি কুঁড়েঘর বাঁধিয়া তাঁহার একদল বন্ধু-বান্ধবকে সেখানে লইয়া যাইবেন। তাহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, 'আমার চম্বে কুঁড়ে বাঁধার প্ল্যান তো গেল, বিঁলেত যাওঁয়ার এক মিথ্যা হুজুকে সব মাটি হল।'

শিলাইদহে বোটে বেড়ানোর এবং সাঁতার দিবার খুব সুবিধা। কবি বলিলেন, 'আমি ছেলেবেলায় খুব সাঁতার দিতে পারতুম। তোমরা কেউ সাঁতার জান?' একজন মেয়ে বাদে সবাই বলিল, 'না।' রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'বৌমার কিন্তু খুব সাহস আছে। সাঁতার দিতে না জানলেও তিনি life-belt প'রে দুবার এপার-ওপার হলেন, অন্য মেয়েরা কেউ জলে নামতেও চাইলে না।'

এই সময় বেশ জোরে ঝড় উঠিল। আমরা আবার ছাদে উঠিবার উপক্রম করিতেছি দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'আর তোমাদের ধ'রে রাখে কে?' একজন ছাত্র সেখানে বসিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিতে লাগিল, দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'যখন বালিগুলো চোখে ঢোকে তখনি বুঝি, কেন "চোখের বালি" লিখেছিলুম।'

খানিক পরে ছাদ হইতে নামিয়া আসিলাম। দুতলার মাঝের ঘরে তখনো তিনি বসিয়াছিলেন। আরো দুই-চারজন আসিয়া জুটিলেন। চুঁচুড়ায় ঠিক ইহার পূর্বে একটি সাহিত্য-সম্মিলন হইয়া গিয়াছিল, তাহার অনেক গল্প হইল। সুরেশ সমাজপতি মহাশয় কিরকম কথায় কথায় ঝগড়া বাধাইতেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাহার বর্ণনা করিলেন। কে একজন অক্ষয়বাবু নাকি চুঁচুড়ায় রক্ষণশীলতা প্রমাণ করিবার জন্য বক্তৃতার ভিতর বলিয়াছিলেন যে, কেশবচন্দ্র সেন সেখানে ১২২ বার আসিয়াছিলেন, কিন্তু একজনকেও ব্রাহ্ম করিতে পারেন নাই। এই গল্পটি অন্য কে একজন বলিলেন। রবীন্দ্রনাথ শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, '১২২ বার! এ যে একেবারে অচলায়তন!' তখনকার দিনের সাহিত্যিকদের বিষয় খানিক আলোচনা হইল। শ্রীমতী নিরুপমা দেবী ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই দুইজনের লেখার রবীন্দ্রনাথ প্রশংসা করিলেন। শরৎকুমারী চৌধুরানীর বর্ণনাশক্তির খুব প্রশংসা করিলেন, তাঁহার কন্যাকে আমরা চিনি কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। কবির বন্ধু লোকেন পালিত বাঁকুড়ার জজ হইয়াছেন, তিনি তাঁহার বাল্যবন্ধুকে সেখানে যাইতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন শুনিলাম। বাবা বলিলেন, 'বেশ তো, চলুন না?' রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'এখন তো শিলাইদহ যাচ্ছি, দেখি পরে যদি হয়।'

ইহার পর আসিল গানের অনুরোধ। তিনি পূর্বের মতো বলিলেন, 'ও, এতক্ষণ এই পরামর্শ হচ্ছিল বুঝি?' অজিতকুমার চক্রবর্তীর খোঁজ করিলেন, কিন্তু তখন তাঁহাকে পাওয়া গেল না। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'তা হলে আমার দ্বারা যতটা হয় তাই শোনো। আমার কিন্তু ঢের ভুল হবে। আমি গান কাউকে শিখিয়ে না রাখলে সুরই ভুলে যাই। যতদিন দিনু এখানে ছিল, বেশ সুবিধে ছিল।' অন্য ঘর হইতে তিনি গানের খাতা লইয়া আসিলেন এবং পরে পরে অনেকগুলি গান গাহিলেন। একটি গান মনে আছে, 'তুমি

একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে।' গানগুলি একটি খাতায় তুলিয়া আনিয়াছিলাম, দুর্ভাগ্যক্রমে সেটি হারাইয়া গিয়াছে। কয়েকটি গান গাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমাদের ক্লান্ত লাগছে না তো? সব সময় আবার গান শুনতে ভালো লাগে না।' তাঁহাকে একটু বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করা হইল, তাহাতে তিনি বলিলেন, 'আমার বিশ্রামের কিছু দরকার নেই।'

রোদ পড়িয়া গেলে বাহির হইয়া নিচুবাংলায় ফিরিয়া আসিলাম। জলযোগের পর বেড়াইতে যাইবার প্রস্তাব হইল। সাথী জুটাইতে গিয়া খানিক দেরি হইয়া গেল। সন্ধ্যার পর বাহির হইয়া অনেকদূর বেড়াইয়া আসিলাম। বোলপুর হইতে কয়েক মাইল দূরে কোপাই বলিয়া একটি ছোটো নদী আছে, তাহাই ছিল আমাদের লক্ষ্য, কিন্তু পথপ্রদর্শক দুইজন থাকাতে অনেকবার ভুল পথে গিয়া ভ্রমণটা বড়োই দীর্ঘ হইয়া পড়িল। দু-একজনের জলপিপাসা পাওয়ায় আরো বিপদ বাড়িল। ভাগ্যে চাঁদের আলো প্রচুর ছিল, না হইলে অন্যপ্রকার বিপদও ঘটিতে পারিত। অনেকক্ষণ হাঁটাহাঁটির পর কোপাইয়ে অবশ্য পৌঁছিলাম, কিন্তু অতিশয় ক্লান্ত অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে বেশ রাত হইয়া গেল। রাত্রে ঘুম অল্পই হইল। শেষ রাত্রে উঠিয়া ট্রেন ধরিবার জন্য রওনা হইলাম। বিদ্যালয়ের কতকগুলি ছেলেও এইসঙ্গে গেল। ট্রেনে অসম্ভব ভিড়, একরকম দাঁড়াইয়াই সারা পথ কাটাইয়া দিলাম।

১৯১২-র এপ্রিল মাসের একেবারে শেষে রবীন্দ্রনাথ একবার কলিকাতায় আসিলেন। বিদ্যালয় সম্বন্ধে সেদিন আমাদের বাড়ি আসিয়া বাবার সঙ্গে অনেক আলোচনা করিলেন। নূতন কিছু নিয়ম করিতে চাহিলেই কত দিক দিয়া বাধা আসে তাহাই বলিতেছিলেন। অনেক ছেলেকে অধ্যাপকরা দুষ্টামির জন্য তাড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু তিনি তাহাদের নিজের দায়িত্বে রাখিয়াছেন, এবং কখনো তাহাতে কুফল হয় নাই। ছেলেদের বলিয়া দিয়াছিলেন যে তিনি স্বয়ং তাহাদের জামিন হইতেছেন, ইহার পর তাহারা আর কোনো অপরাধ করে নাই। কথায় কথায় বলিলেন, 'এ-সব তো একরকম গড়ে তুলেছি, এখন আমি চলে গেলে সব ঢিলে না পড়ে যায়। আপনি যখন ওখানে যাবেন, সব একটু দেখে আসবার চেষ্টা করবেন।' আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'আমাদের যাওয়া আবার স্থির হয়ে গেছে, ২৯ শে যাব। বৌমা, রথীও যাবেন। বার বার আমাকে নিয়ে এক ঠাট্টা চলবে না, এবার যাবই। স্কুল যখন খুলবে একবার গিয়ে দেখে এসো আমাদের ছেলেদের খাওয়াটা, খুব আনন্দ করে তারা খায়, নিজেরা আবার কতরকম ফরমাস করে।' আর-এক জায়গায় যাইতে হইবে বলিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন।

বিলাত যাইবার আগে তাঁহার সঙ্গে যে আর দেখা হইবে তাহা আশা করি নাই, কারণ আমাদেরও কয়েকদিনের মধ্যে দার্জিলিং চলিয়া যাইবার কথা হইতেছিল। কিন্তু ৪ মে সকালে বাবার কাছে একখানা চিঠি আসিল, তাহাতে শুনিলাম যে, রবীন্দ্রনাথ তখনো কলিকাতায় আছেন এবং সন্ধ্যাবেলা আমাদের এখানে আসিবেন।

সেদিন গোখলে মহাশয়ের Elementary Education Bill সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইল। বিপিনচন্দ্র পালের দল ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন শুনিয়া তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, আমাদের দেশে যদি এখন শিক্ষাবিস্তারের কোনো উপায় থাকে তো ঐ একমাত্র। ইহার কিছুদিন আগে টাইটানিক জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছিল ; জলে ডুবিয়া যাঁহারা মারা যান তাঁহাদের অসাধারণ শৌর্যের প্রশংসা করিয়া তিনি বলিলেন, 'এই জিনিসটি আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। ছোটো একটা নৌকাডুবি হলেও ভীরুতার যে পরাকাষ্ঠা দেখা যায় তা শোচনীয়। আমাদের দেশের লোকদের মধ্যে কোথাও খুব বড়ো একটা গলদ থেকে গিয়েছে, তা না হলে এরকম হত না। এ কথা বললে লোকে রাগ করে, কিন্তু বাস্তবিকই বলবার সময় এসেছে।' তাহার পর উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, 'আমি এখন পালাই, কিছু এখনো গোছানো হয় নি, সব ঠিক করে নিতে হবে।' বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এবার বোধ হয় আর আপনি যাত্রার আগে বেশি সময় থাকতে কলকাতায় ফিরছেন না?' রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, 'এবার ঠিক দুদিন আগে আসব, আর কাউকে কিছু করবার অবসর দিচ্ছি নে। আর লোকেরাও এবারে বেশ বুঝে নিয়েছে যে আমার ক্ষমতা কতখানি।' তিনি চলিয়া গেলেন। আমরাও ইহার দুই তিনদিনের ভিতর দার্জিলিং চলিয়া গেলাম।

১৫ কিংবা ১৬ মে ১৯১২ তিনি শিলাইদহ হইতে বাবাকে একখানি চিঠি লেখেন এবং 'জীবনস্মৃতি' এক কিস্তি ডাকে আমার নামে পাঠাইয়া দেন। আমি পাণ্ডুলিপিটি রাখিতেছি তাহা শুনিয়াছিলেন, তাই আমার নামে মনে করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার হাতে নাম ও ঠিকানা লেখা খামখানি আমি সযত্নে রাখিয়া দিলাম। চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, তিনি ১০ জ্যৈষ্ঠ বোম্বাই যাত্রা করিবেন। কয়েকদিন পরে চারুচন্দ্রের পত্রে তাঁহার যাত্রার খবর পাইলাম। ইংল্যান্ডে পৌঁছিবার পর চিঠিপত্র খুবই কম আসিত, তবু মধ্যে মধ্যে খবর পাইতাম। সর্বত্রই যে তিনি অতিশয় সমাদর ও সম্মান পাইতেন, ইহা শুনিয়া সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইতাম, গর্বও অনুভব করিতাম অনেকখানি।

এই সময় 'রোগীর নববর্ষ' লেখাটি প্রবাসীতে বাহির হয়। আমি স্বয়ং তখন রোগে ভুগিতেছিলাম, তাই লেখাটি যেন বিশেষ একটি অর্থ লইয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য়ও তাঁহার বিলাতের চিঠি মধ্যে মধ্যে বাহির হইত। বাবার কাছে যখনি পত্র আসিত তখনি আমাদের দুই বোনকে আশীর্বাদ পাঠাইতেন।

জীবনের ওপার হইতেও এই আশীর্বাদ পাইবার জন্য মন কাঙাল হইয়া থাকে। কিন্তু আশীর্বাদ বহন করিয়া আনিবে কে?

৫ সেপ্টেম্বর দাদা বিলাতে চলিয়া গেলেন। লন্ডনে ও ইংল্যান্ডের অন্যান্য স্থানে রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কারণ ইহার পরের চিঠিগুলিতে প্রায়ই দাদার উল্লেখ থাকিত। সন্তোষবাবু কিছুদিন পরে কলিকাতায় আসিলেন, তাঁহার কাছে রবীন্দ্রনাথের অনেক খবর পাইলাম। শুনিলাম, আশ্রমে প্রায়ই চিঠি আসে, খুব বর্ণনাবহুল

চিঠি। প্রতিমা দেবী তখন ইংরেজি ভালো জানিতেন না, তবু জাহাজ-সুদ্ধ লোকের সঙ্গে ভাব করিয়া ফেলিয়াছিলেন, দুই-তিনটা ভাষার সাহায্যে— ইহাতে কবি খুবই আনন্দিত হইয়াছিলেন। চারুচন্দ্রের নিকট মধ্যে মধ্যে পত্র আসিত, তাহাও দেখিতাম। লন্ডনের সাহিত্যিক-জগতে যে তাঁহার উপস্থিতি খুব প্রচণ্ড বিস্ময়ের ঢেউ তুলিয়াছিল তাহার খবর নানা দিক দিয়া আসিত। ইংরেজি গীতাঞ্জলি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে শুনিয়াছিলাম। তিনি যাওয়াতে লন্ডনে যেরকম সাড়া পড়িয়াছিল তেমন ব্যাপার সেখানকার সম্পাদকদের নাকি আর মনে পড়ে না। তাঁহার সম্বন্ধে William Rothenstein লিখিয়াছিলেন, 'He stands easily the first poet of the world'। তাঁহার গৌরবে বাঙালি মাত্রই গৌরবে আত্মহারা হইত, তাহা বালিকা বয়সেও বুঝিতাম। Rothenstein যখন প্রথমে রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকিবার চেষ্টা করেন তখন খানিকক্ষণ চেষ্টা করিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, 'আপনাকে আঁকা যায় না।'

২১ সেপ্টেম্বর বোধ হয় চারুচন্দ্রের কাছে কবির একখানি চিঠি আসে, সেটি তিনি আমাদের দেখিবার জন্য উপরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পত্রের শেষে ছিল, 'রামানন্দবাবুকে আমার নমস্কার দিয়ো এবং শান্তা-সীতাকে বোলো যে এই দৈত্যপুরীর সদর রাস্তার সামনে বসে তাদের শীর্ণ নিভৃত গলিটির কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে।'

এই সময় আমরা দুই বোনে মিলিয়া একটি উপকথার বই বাহির করি, বইটির নাম 'হিন্দুস্থানী উপকথা'। একখানি বই লন্ডনে রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হইল উত্তরে তিনি ভারি সুন্দর একটি চিঠি লিখিয়াছিলেন, আমার অতি দুর্ভাগ্য যে চিঠিখানি হারাইয়া গিয়াছে। তাহার একটি লাইন কেবল মনে পড়ে। বইখানার ভিতর 'সহানুভূতি' কথাটা ছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, 'সহানুভূতির উপর আমার বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি নেই।'

ইংরেজি গীতাঞ্জলি প্রথম প্রকাশিত হইল, ইন্ডিয়া সোসাইটির জোগাড়েই বোধ হয়। আমাদের দুই বোনের নামে একখানি বই আসিয়াছিল। সাদা রেশমে বাঁধানো, সোনার জলে নাম লেখা, বইটি দেখিতে ভারি সুন্দর হইয়াছিল।

ইংল্যান্ড হইতে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় চলিয়া যান। Urbana-তে কিছুকাল ছিলেন বলিয়া শুনিয়াছিলাম। প্রতিমা দেবী সেখানে কলেজে ভর্তি হইয়াছেন বলিয়া খবর পাওয়া গেল। শুনলাম তাঁহারা আরো দুই বৎসর থাকিয়া তবে দেশে ফিরিবেন। আবার পরে শুনিলাম, জুলাই-অগাস্ট মাসের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিবেন।

অবশেষে ১৯১৩-র সেপ্টেম্বর মাসে সত্যই তিনি ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু তখনি তাঁহার দেখা পাইলাম না। কলিকাতায় অপেক্ষা না করিয়া তিনি সোজা শান্তিনিকেতনে চলিয়া গেলেন। আমরাও মাস-দেড়েকের জন্য দার্জিলিং চলিয়া গেলাম। স্যার নীলরতন সরকার ও তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত গিয়াছিলাম, বাবা মা ও ভাইরা কলিকাতায়ই ছিলেন। বাবার চিঠিতে জানিলাম যে, রবীন্দ্রনাথ মধ্যে একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

আমাদের বাড়িও একদিন আসিয়াছিলেন। আমরা কলিকাতায় নাই শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি যে তাদের দেখতে এসেছিলুম।'

১৪ নভেম্বর ১৯১৩ কলেজ হইতে ফিরিবামাত্র শুনিলাম যে রবীন্দ্রনাথ Nobel Prize পাইয়াছেন। কলিকাতা শহরে মহা হৈ চৈ বাধিয়া গেল। শুনিলাম কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সর্বপ্রথম কবিকে এই খবর টেলিগ্রামে জানাইতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে টেলিগ্রাম লিখিতে জানিতেন না, অন্য কাহাকেও দিয়া লিখাইতে গিয়া দেরি হইয়া গেল, তাঁহার আগেই আর-একজন টেলিগ্রাম পাঠাইয়া দিলেন। শান্তিনিকেতনে সেদিন মহা উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল, এমন-কি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও নাকি নিচুবাংলা হইতে ছুটিয়া আসিয়া ভ্রাতাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিলেন, 'রবি, তুই নোবেল প্রাইজ পেয়েছিস!' এগুলি শোনা গল্প। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অবিচলিতই ছিলেন শুনিয়াছি। টেলিগ্রামখানি উপস্থিত এক অধ্যাপকের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, 'আপনাদের বাড়ি তৈরি হল।' বিদ্যালয়ের জন্য কি একটি বড়ো বাড়ি তখন হওয়ার কথা চলিতেছিল, অর্থাভাবে আরম্ভ হয় নাই।

কলিকাতা হইতে স্পেশ্যাল ট্রেনে শান্তিনিকেতনে গিয়া রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করার প্রস্তাব চলিতে লাগিল। আমরা যাইব স্থির করিয়া রাখিলাম।

২৩ নভেম্বর স্পেশ্যাল ট্রেনে করিয়া বোলপুর যাওয়া হয়। সেদিন রবিবার ছিল। হঠাৎ কি কারণে জানি না সেদিন হাওড়ার পুল অতি অসময়ে খোলা হইয়া গেল। যাঁহারা স্পেশ্যাল ট্রেনে যাইতেছিলেন সকলেই ভুগিলেন বিস্তর, ফেরি স্টিমারে করিয়া গঙ্গা পার হইয়া তবে স্টেশনে পৌঁছিতে হইল। যাঁহারা যাঁহারা টিকিট কিনিয়াছিলেন, সকলে আসিয়া জুটিতে প্রায় দুই ঘণ্টা দেরি হইয়া গেল। ট্রেনটি পতাকা দিয়া সাজানো হইয়াছিল, একটি রসনচৌকির ব্যান্ডও উঠিয়াছিল গাড়িতে, তাহারা ব্যান্ডেল পার হইবার আগে বাজনা শুরু করে নাই। স্টেশনে প্রচুর জনসমাগম দেখিলাম। স্যার জগদীশচন্দ্রের সভাপতি হইবার কথা ছিল, তিনি আর আসেনই না, অবশেষে শেষ মুহূর্তে আসিয়া পৌঁছিলেন। ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য মহাশয় এই ট্রেনে যাইতেছিলেন, তিনি পণ্ডিতব্যক্তিদের সাংসারিক জ্ঞানহীনতা সম্বন্ধে অনেক রসিকতা করিতে লাগিলেন। গাড়ি ছাড়িয়া দিল, যাত্রীর দল মহানন্দে গান ও গল্প করিতে করিতে চলিলেন। ব্যান্ডেল জংশন ছাড়াইবার পর যখন ট্রেনে রসুনচৌকি বাজিতে লাগিল তখন রেল-লাইনের দুই ধারে লোক জমা হইয়া এই অপূর্ব ব্যাপার দেখিতে লাগিল। বর্ধমানে গাড়ি থামিলে অনেকে নামিয়া পড়িয়া সেখানকার সুবিখ্যাত সীতাভোগ ও মিহিদানার সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এই সময় দেখা গেল যে আমরা যে গাড়িতে ছিলাম সেটির চাকায় আগুন লাগিবার উপক্রম ঘটিয়াছে। তাড়াতাড়ি আমাদের নামাইয়া অন্য গাড়িতে তুলিয়া দেওয়া হইল। প্রাণকৃষ্ণ আচার্য মহাশয় বলিলেন, 'এই স্পেশ্যাল ট্রেনটি পুড়িয়া গেলে ব্রাহ্মসমাজ সমূলে ধ্বংস হইত।' বাস্তবিক ট্রেনে যাঁহারা সেদিন যাইতেছিলেন তাঁহাদের ভিতর অনেকেই ছিলেন ব্রাহ্ম। শান্তিনিকেতনে গিয়া কি গান হইবে তাহাও গাড়িতে বসিয়া অভ্যাস করা হইতে লাগিল।

বোলপুর স্টেশনেও খুব ভিড় দেখিলাম। কেহ আসিয়াছেন আগন্তুকদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য, কেহ-বা আসিয়াছেন স্পেশ্যাল ট্রেন দেখিবার জন্য। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও ছেলেরা, যাঁহারা স্টেশনে আসিয়াছিলেন, সকলেই প্রায় গেরুয়া পোশাক পরিয়াছিলেন। মেয়েরা যাহাতে ভিড়ে কষ্ট না পান তাহার জন্য অনেক ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদের স্টেশনের বাহিরে আনা হইল। অত লোককে গাড়ি চড়াইবার মতো ব্যবস্থা তখনকার শান্তিনিকেতনে ছিল না, তবু যতগুলি সম্ভব গাড়ি স্টেশনে আসিয়াছিল। যাঁহাদের বেশি হাঁটার অসুবিধা ছিল তাঁহাদের গাড়িতে তুলিয়া, আমরা অল্পবয়স্কা মেয়ের দল হাঁটিয়াই চলিলাম। রোদের প্রাখর্যে প্রথমে একটু কষ্ট হইয়াছিল, পরে অল্প মেঘ করায় সে কষ্টও রহিল না। বোলপুরের লোক একসঙ্গে এত মানুষের আবির্ভাব ইতিপূর্বে আর দেখে নাই, তাহারা মানুষ দেখিবার উৎসাহে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ঘরের বাহির হইয়া আসিল। যখন আশ্রমের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছি তখন পত্রপুষ্পে রচিত একটি তোরণ চোখে পড়িল, উপরে লেখা ‘স্বাগতম’। অতিথিদের এখানে চন্দনচর্চিত করিবার চেষ্টা করা হইল, অনেকে অবশ্য অচর্চিত অবস্থায়ই তোরণ পার হইয়া গেলেন। শান্তিনিকেতনে আরো দুই-চারটি নূতন ঘর উঠিয়াছে দেখিলাম।

মীরা দেবী, কমলা দেবী প্রভৃতির সঙ্গে এইখানে দেখা হইল। তাঁহাদের সঙ্গে সভাস্থলে চলিলাম। প্রতিমা দেবীও অল্প পরে আমাদের দলে আসিয়া যোগ দিলেন। মেয়েদের জন্য আলাদা বসিবার জায়গা করা হইয়াছিল, কিন্তু ভালো করিয়া দেখিবার শুনিবার আশায় অনেকে সেখানে না বসিয়া প্রকাশ্য সভাস্থলেই বসিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখনো সভাস্থলে আসেন নাই। সভাপতি মনোনীত করা, অভিনন্দনপত্র সর্বসমক্ষে উপস্থিত করা ও তাহা মঞ্জুর হওয়া, প্রভৃতি নানা কাজ চলিতে লাগিল। ক্ষিতিমোহনবাবু, দিনুবাবু ও বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া অতিথিদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাহার পর সভাস্থ ব্যক্তিদের ভিতর পাঁচজন প্রতিনিধি মনোনীত হইলেন, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে আনিতে গেলেন। কয়েক মিনিট পরে কবি তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়া সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। বহুদিন পরে তাঁহাকে দেখিলাম, প্রবাসে স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকার জন্য তাঁহার স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। তাঁহার বসিবার স্থান হইয়াছিল একটি মাটির বেদীতে, তাহার উপর পদ্মপাতা বিছানো। চারি দিক অতি সুন্দর আলপনায় চিত্রিত। কবিবরকে মাল্যচন্দনে ভূষিত করা হইল, তাহার পর জগদীশচন্দ্র অভিনন্দনলিপি পাঠ করিলেন এবং ছোটো মাটির টবে বসানো একটি লজ্জাবতী লতা তাঁহাকে উপহার দিলেন। স্বর্গীয় পূরণচাঁদ নাহার মহাশয়ই বোধ হয় কবিকে একটি জরির স্তবকের মালা পরাইলেন, আতর উপহার দিলেন এবং হিন্দি একটি কবিতার দুই লাইন আবৃত্তি করিলেন, তাহার অর্থ এই যে, আকাশের রবিরও যেখানে প্রবেশাধিকার নাই কবি সেখানেই প্রবেশ করিতে পারেন। অতিথিরা অনেকেই ক্যামেরা লইয়া গিয়াছিলেন। ছবি তোলা মহোৎসাহে চলিতে লাগিল। দুই-চারখানি ছবি পরে দেখিয়াও ছিলাম। একজন মুসলমান ভদ্রলোক এবং জন-দুই ইংরেজও বক্তৃতা করিলেন।

সকলের বলা শেষ হইবার পর রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন। আগে শুনিয়াছিলাম তিনি বক্তৃতা করিবেন না, অভিনন্দনের উত্তরস্বরূপ কিছুকাল পূর্বে রচিত 'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে' গানটি গাহিবেন। বোধ হয় আর কিছু বলিবার সংকল্প প্রথমত তাঁহার ছিল না। কিন্তু তাঁহাকে প্রিয়তমের মতো ভালোবাসিয়াছে এমন বাঙালিরও যেমন অভাব নেই, এবং ছিলও না, তেমনি চিরকাল তাঁহাকে বিদ্বেষ করিয়াছে এবং লোকচক্ষে হীন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, এমন বাঙালিরও অভাব তখন ছিল না। এইরকম কয়েকটি ব্যক্তি সভাস্থলে খুব সামনে আসিয়া বসিয়াছিলেন। ইঁহাদের দেখিয়াই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের মত পরিবর্তিত হইয়া গেল। কপটতা ও অসত্যের প্রতি তাঁহার যে মর্মান্তিক ঘৃণা ছিল তাহা অনলবর্ষী ভাষায় রূপ ধরিয়া বাহির হইয়া আসিল।

সভাস্থ সকলে যে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন তাহা এখনো মনে আছে। তাঁহার যথার্থ অনুরাগী যাঁহারা তাঁহারা মনে অতিশয় আঘাত পাইয়াছিলেন। আমাদের নিজেদের বিস্ময়-বিমূঢ়তার স্মৃতি এখনো মনে জাগিয়া আছে।

রবীন্দ্রনাথ কি বলিয়াছিলেন তাহা আমার পুরাতন ডায়েরির পাতায় এখনো কিছু কিছু লেখা আছে। তখন বালিকা ছিলাম, তাঁহার অনবদ্য ভাষা হয়তো ঠিক তুলিয়া রাখিতে পারি নাই, কিন্তু কথাগুলি খানিকটা এই ধরনের— 'দেশের বহু লোকেরই আমার প্রতি যথার্থ কোনো ভালোবাসা নেই সেটা আমি জানি। আজ একটা আকস্মিক আনন্দের জোয়ারে অনেকে ভেসে চলেছেন, কিন্তু এ স্রোত চলে গেলেই আবার ধাপে ধাপে পাঁক বেরিয়ে পড়বে। গীতাঞ্জলি আমি যাঁকে নিবেদন করেছিলুম তিনি যে তা গ্রহণ করেছেন এতেই আমি ধন্য। পুরস্কার যদি কিছু পেয়ে থাকি তা আমার অন্তরেই সঞ্চিত হয়ে আছে। অন্য কোনো পুরস্কারে নিজের চিত্তকে উচ্ছ্বসিত করে তোলার দুর্ভাগ্য যেন আমার কখনো না হয়। যাঁরা আজ আমাকে অভিনন্দিত করতে এসেছেন, তাঁদের সম্মানার্থে তাঁদের প্রদত্ত অভিনন্দন আমি গ্রহণ করলুম, কিন্তু অন্তরের সঙ্গে নয়।'

অতঃপর আরো কিছু উপহার প্রদান এবং কবিকে প্রণাম করার পর সভা ভঙ্গ হইল। সকলে হাঁটিয়া আবার স্টেশনে ফিরিয়া গেলাম। অভ্যাগতদের জলযোগের আয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু জলযোগ করার উৎসাহ আর কাহারো ছিল না। কিন্তু বিদ্যালয়ের ছেলেরা সব খাবার বহন করিয়া স্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইল এবং গাড়িতে গাড়িতে তুলিয়া দিল। যতদূর মনে পড়ে খাদ্যদ্রব্যগুলির সদ্‌গতিই হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথও এই স্পেশ্যাল ট্রেনে আমাদের সঙ্গে কলিকাতা চলিয়া আসিলেন।

বর্ধমানে যখন গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল তখন রেলওয়ে-কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করিলেন যে যত লোক কলিকাতা হইতে আসিয়াছিলেন তাহার চেয়ে দেড় শত লোক বেশি ফিরিয়া চলিয়াছেন। অনেকের সততার এই একটি প্রমাণ হাতে হাতে পাইয়া মনে হইল, রবীন্দ্রনাথ যে সকলকে তিরস্কার করিলেন তাহা নিতান্ত অকারণে নয়। এই দেড় শত লোককে মাঝপথে নামাইয়া দিবার প্রস্তাবও হইল। কিন্তু ট্রেন রিজার্ভ হইয়াছিল শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুর নামে, তিনি ভদ্রতা করিয়া সেটা করিলেন না। এই দেড় শত লোকের

টিকিটের দাম শেষ পর্যন্ত তাঁহাকেই গনিতে হইয়াছিল কি না জানি না। বেশ রাত করিয়া কলিকাতায় পৌঁছিলাম।

কলিকাতায় কয়েকদিন এই ব্যাপার লইয়া বিষম হৈ চৈ চলিল। কাগজে কাগজে কত বিষই যে উদ্‌গীরিত হইল তাহার ঠিক নাই। কালের স্রোতে ফেনার মতো সে-সব কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। যাঁহারা যথার্থ তাঁহার অনুরাগী ভক্ত তাঁহারাও দুঃখ করিতে লাগিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর বিদ্বেষটাই খালি দেখিলেন, ভালোবাসাটা দেখিলেন না। আমাদের পরিচিত এক ভদ্রলোক এত মর্মাহত হইয়া ফিরিয়াছিলেন যে, ইহার পরে দুইদিন তিনি আহার গ্রহণ করেন নাই।

২৫ নভেম্বর বিকালের দিকে কবি হঠাৎ আমাদের বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নেপালবাবু সঙ্গে ছিলেন। তিনিই প্রথমে উপরে আসিয়া খবর দিলেন। রবীন্দ্রনাথ উপরে আসিয়া বলিলেন, 'সেদিন তোমরা গিয়েছিলে, আমি কিচ্ছু দেখি নি। কে যে সামনে এল, কে প্রণাম করল, কারুরই মুখের দিকে তাকাই নি। তোমাদের বোধ হয় যেতে আসতে খুব কষ্ট হয়েছে।' ট্রেনে গাড়ির চাকায় আগুন ধরিয়াছিল শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোন কামরায়?' আমাদেরই গাড়িতে, শুনিয়া বলিলেন, 'কি বিপদ!' দাদা কিছুদিন আগে লন্ডন হইতে একখানি ফোটোগ্রাফ পাঠাইয়াছিলেন, মধ্যে বসিয়া রবীন্দ্রনাথ, তাঁহার চারি দিকে লন্ডন-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রের দল। মা সেই ছবির উল্লেখ করাতে কবি আমাকে বলিলেন, 'আনো তো ছবিখানা একটু দেখি।' আমি লইয়া আসিলাম। ছবি হাতে করিয়া বলিলেন, 'বেশ তো উঠেছে।' আমি বলিলাম, 'আপনার ছবি তত ভালো হয় নি।' বলিলেন, 'কেন, বেশ তো গম্ভীর শান্ত হয়ে বসে রয়েছি, মন্দ কি হয়েছে?' আমার মা বলিলেন, 'একটু বেশি বয়স দেখাচ্ছে।' রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, 'আপনারা কি-যে মনে করেন, আমার তো সত্যি অনেক বয়স হয়েছে।' লন্ডন-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের সম্বন্ধে আরো কিছু কথাবার্তা বলিয়া তিনি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বাড়ি যাইবার জন্য উঠিলেন। কবি যেদিন শান্তিনিকেতন হইতে আসেন সেই রাত্রেই তাঁহাকে তাঁহার এক আত্মীয়কন্যার বিবাহে পৌরোহিত্য করিতে হয়। তাঁহার অনেক দেরি হইতেছে দেখিয়া কর্মকর্তারা অন্য পুরোহিতের দ্বারা বিবাহ দিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু কবি স্বয়ং আসিয়া বিবাহ না দিলে বর বিবাহ করিতেই অস্বীকার করে। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'সে বরিশালের ছেলে, শক্ত হয়ে বসে রইল। অত রাত্রে আমি যাবার পর তবে সব হল।' স্পেশ্যাল-ট্রেন-যাত্রীদের কথা আবার উঠাতে বলিলেন, 'আমি সেদিন কাউকেই চেয়ে দেখি নি, বড়ো পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলুম। মনটা যে কোথায় ছিল জানি না।' উপর হইতে একতলায় নামিয়া তিনি চারুচন্দ্রের আপিস-ঘরটিতে গিয়া ঢুকিলেন। আমরা চলিয়া আসিলাম। তাঁহার যথার্থ অনুরাগী ও ভক্তদের মনে যে আঘাত দিয়াছিলেন, সেই বেদনা দূর করিবার জন্যই যে তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া আসিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। চারুবাবুকে সেই মর্মে কয়েকটি কথাও বলিয়াছিলেন, পরে শুনিয়াছিলাম। দেশের লোকে যে তাঁহাকে যথার্থই ভালোবাসে তাহা প্রমাণ করিতে গিয়া

চারুচন্দ্র বলিলেন, 'উনি সেদিন ফুটপাথে নেপালবাবুর জন্য দু-সেকেন্ড দাঁড়িয়েছিলেন, তারই মধ্যে দুশো লোক দাঁড়িয়ে গেল, ওঁকে দেখবার জন্যে।' ভিড় করিয়া দাঁড়ানোই অনেক লোকের স্বভাব। তাহা যে সর্বদাই ভালোবাসার পরিচায়ক নয় তাহার মর্মান্তিক পরিচয় তো কবির মহাপ্রস্থানের দিনও পাওয়া গেল। হুজুকপ্রিয় লোকেরা হুজুকের কোনো উপলক্ষকে অগ্রাহ্য করে না। অবশ্য ইহাও ঠিক যে, তাঁহাকে প্রাণের অধিক ভালোবাসিত এবং এখনো বাসে, এমন লোকও বাংলাদেশে কম নয়। চারুচন্দ্র নিজের কথাই বলিলেন, 'সেদিন ওঁকে আলো দেখাবার জন্যে লন্ঠন নিয়ে বেরিয়েছিলাম। আমি প্রণাম করাতে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতে গিয়ে লন্ঠনটায় ওঁর একটা আঙুলে ছ্যাঁকা লেগে গেল। সারারাত আমার মনে হচ্ছিল যেন ঐ ছ্যাঁকাটা আমার বুকের মধ্যে লেগে রয়েছে।'

আমার ছোটো ভাই অশোক তখন বালক মাত্র। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে দেশবাসী তাঁহাকে ভালোবাসে না, ইহা শুনিয়া সে মহা চটিয়া বলিল, 'না, ভালোবাসে না! শুধু শুধুই আমার ঠ্যাংটা ভেঙে গেল সেবার সমাজে লোক আটকাতে গিয়ে।' শারীরিক শক্তির জন্য সমাজ-পাড়ায় অশোক বিখ্যাত ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা বা উপাসনা হইলে দরজা আগলাইবার ভার অনেক সময় অশোকের উপর পড়িত।

এই বৎসর অর্থাৎ ১৯১৩-র ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি বোধ হয় সুকুমার রায়ের বিবাহ হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন শিলাইদহে ছিলেন শুনিয়াছিলাম। বিবাহ প্রায় আরম্ভ হইতে যাইতেছে এমন সময় গেটের কাছে করতালিধ্বনি শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইয়া গেলাম। পরক্ষণেই দেখিলাম কবি আসিয়া সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। পরে শুনিয়াছিলাম, এই বিবাহে উপস্থিত থাকিবার জন্যই তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সুকুমারবাবুকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

মাঘ মাসে উৎসবের সময় রবীন্দ্রনাথ তখন প্রায়ই কলিকাতায় আসিতেন, এ বৎসরও (১৯১৪) জানুয়ারিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের বাড়িতে ইহার ভিতর একদিন নিমন্ত্রণে গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা হইল। কি উপলক্ষে নিমন্ত্রণটা ছিল তাহা এখন মনে পড়িতেছে না। স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়া অভ্যাগত অনেকেই আসিয়াছিলেন। এইবারের উৎসবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার একটি বক্তৃতার আয়োজন হইতেছিল। তাঁহার বক্তৃতা বা উপাসনার সংবাদ শুনিলেই এমন ভীষণ জনতা হইত যে তাহা সংবরণ করা মানুষের অসাধ্য হইয়া উঠিত। এইজন্য এবার প্রস্তাব উঠিয়াছিল যে বক্তৃতাটা টাউন-হলে করার ব্যবস্থা হউক। কিন্তু মাঘোৎসব টাউন-হলে করার প্রস্তাব বিশেষ কাহারো মনঃপূত হইল না। কথাটা কেমন করিয়া জানি না রবীন্দ্রনাথের কানে গিয়াছিল। তিনি সেদিন আমাদের দেখিয়া কাছে আসিয়া সম্ভাষণ করিলেন এবং মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমাকে টাউন-হলে বক্তৃতা দেওয়াবার ব্যবস্থা হচ্ছে নাকি?' মা বলিলেন যে, কিছু স্থির হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'দেখুন, তা হলে আমি পারব না, আমার আর আগেকার মতো চেঁচাবার শক্তি নেই।'

'চেঁচাবার শক্তি' অবশ্য তখন কেন, মৃত্যুর দু-এক বৎসর পূর্বে পর্যন্ত তাঁহার অক্ষুণ্ণই ছিল।

১১ মাঘ রাত্রে জোড়াসাঁকোর উৎসবে এবার আশ্রমের ছেলেরাই গান করিবে শুনিয়াছিলাম। এই সময় তাহাদের রিহার্সাল আরম্ভ হওয়ায় আমরা তাড়াতাড়ি গান শুনিবার জন্য ছুটিলাম। যে ঘরে গান হইতেছিল তাহার সম্মুখের বারান্দায় গিয়া বসিলাম। দিনেন্দ্রনাথ গান শিখাইতেছিলেন, কবি স্বয়ংও মাঝে মাঝে যোগ দিতেছিলেন; খানিক পরে গান করিতে করিতেই উঠিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন।

১১ মাঘ রাত্রে সেবার মেয়েদের দিকে অত্যন্ত ভিড় হইয়াছিল, অনেকক্ষণ তো দাঁড়াইয়াই ছিলাম। গান অতি সুন্দর হইয়াছিল, শান্তিনিকেতনের ছেলেরাই করিয়াছিল। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী এবং নলিনী দেবীর নেতৃত্বে কয়েকটি গান মেয়েরাও করিয়াছিল। বিদ্যালয়ের ছেলেরা সকলে মাথায় হলদে পাগড়ি বাঁধিয়া আসিয়াছিল। এবার আচার্যের কাজ করিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং ক্ষিতিমোহনবাবু মিলিয়া। গানগুলির ভিতর একটির কথা মনে পড়ে, 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।' এই গানটি ছেলেমেয়ে দুই দল মিলিয়া গাহিয়াছিল। শ্রীমতী সাহানা গুপ্ত একলা 'যদি প্রেম দিলে না প্রাণে' গানটি গাহিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ উপদেশ দিলেন। উপাসনান্তে প্রায় ঘণ্টা-দেড় জোড়াসাঁকোতেই আটকাইয়া থাকিতে হইল। ভিড় একটু কমিলে পর বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা না করিয়া ১৫ মাঘ রাত্রে রবীন্দ্রনাথ উপাসনা করিলেন। ইহা লইয়াও ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীনপন্থীদের সঙ্গে নবীনপন্থীদের কিঞ্চিৎ কলহ হইয়া গেল। নবীনরাই তাহাতে জয়লাভ করিলেন। ইহার কয়েকদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা হইতে চলিয়া গেলেন। আবার ফিরিলেন ফাল্গুন মাসে। এই সময়ে ১ ফেব্রুয়ারি ১৯১৪ রামমোহন লাইব্রেরিতে ছোটো একটি সভা হয়। সভাটি যত ছোটো করিবার ইচ্ছা উদ্যোক্তাদের ছিল তাহা অবশ্য হইল না, কারণ কাগজে বিজ্ঞাপন না দিলেও, রবীন্দ্রনাথ আসিতেছেন এ খবর লোকের মুখেই শহরময় ছড়াইয়া পড়িত। তাহার পর ভিড়, ঠেলাঠেলি, জানলা বাহিয়া ওঠা, সব পুরাদমে আরম্ভ হইয়া যাইত। এবারেও অনেকটা তাহাই হইল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। এই সভায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে দেখিয়াছিলাম। দেখিতে তিনি অতি সুপুরুষ ছিলেন, বাঙালিদের ভিতর তেমন উজ্জ্বল গৌরবর্ণ প্রায় দেখা যায় না।

গান হইয়া সভার কাজ আরম্ভ হইল। বক্তৃতা না হইয়া কথোপকথন হয়, ইহাই ছিল কবির ইচ্ছা, কিন্তু তিনি উপস্থিত থাকিলে কথা বলিতে কেহই রাজি হইত না, সুতরাং ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত বক্তৃতাই হইয়া দাঁড়াইল। প্রথমে তিনি তাঁহার ইংরেজি গীতাঞ্জলি লেখার ইতিহাস খানিকটা দিলেন। তাহার পর ২৩ নভেম্বর শান্তিনিকেতনে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার কারণ সম্বন্ধে কিছু বলিতে আরম্ভ করিলেন। যাহা বলিয়াছিলেন তাহার কোনো রিপোর্ট লওয়া হইয়াছিল কি না জানি না, কোনো কাগজে কিছু বাহির হইয়াছিল কি না তাহাও মনে পড়ে না। তাঁহার বক্তৃতার সংক্ষিপ্তসার

এইরূপ ছিল—

কবি চিরদিনই দেশের লোকের প্রীতি কামনা করেন। দেশের লোকের ভালোবাসা তাঁহার প্রেয় নয় ইহা বলিলে ঠিক কথা বলা হয় না। অন্য দেশের লোকের নিকট হইতে এই প্রীতি অজস্রধারায় লাভ করিলেও যথেষ্ট বোধ হয় না, কবির হৃদয় উপবাসীই থাকিয়া যায়। কিন্তু মানুষ এ ধরনের উপবাস সহ্য করিতে পারে না বলিয়া একটি বিশিষ্ট দলের আদর বা বিদেশে প্রাপ্ত সম্মান দিয়া নিজেকে ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে। তেমনি রবীন্দ্রনাথও বিদেশে বহু সম্মান পাইয়াছেন, কিন্তু তাহা তিনি নিজের বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, ভারতবর্ষের সম্মান বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু দেশবাসীর কাছে সেই বিদেশে প্রাপ্ত সম্মানের প্রতিধ্বনিই তিনি চাহেন নাই। মায়ের ও ভাইয়ের সহিত তো মানুষের সম্মানের সম্পর্ক নয়, ভালোবাসার সম্পর্ক। কিন্তু ইহা এমন জিনিস যে ভিক্ষা বা দাবি করিয়া পাওয়া যায় না, পাইবার সৌভাগ্য থাকিলেই একমাত্র পাওয়া যায়। বিদেশে তিনি যে সম্মান পাইয়াছেন তাহা তিনি সকলকে ভুলিয়া যাইতে বলিলেন, উহাকে মায়া বা স্বপ্ন মনে করিতে অনুরোধ করিলেন। এগুলি ভুলিয়া গিয়া, তাহার পর যদি দেশবাসী তাঁহাকে কিছু দিতে পারেন, তাহা হইলে সেইটুকুই তিনি চান। সম্মান তাঁহার কাম্য নয়। এই কারণে দেশের লোক যখন তাঁহাকে সম্মান দিতে আসিয়াছিলেন তখন তিনি তাহা প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। দেশবাসী তাঁহাকে ভুল না বোঝেন, এই তাঁহার অনুরোধ। তিনি জানেন যে দেশের লোকের সঙ্গে তাঁহার অনেক জায়গায় বিরোধ আছে, তাহা না থাকিলে এতদিন ধরিয়া এত অপমান এবং লাঞ্ছনা তাঁহার অদৃষ্টে জুটিত না। সে বিরোধের কারণ এই যে, দেশের লোকের প্রীতি সর্বান্তঃকরণে কামনা করিয়াও, জনসাধারণ যাহা শুনিতে চায়, তিনি সেইটুকু বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারেন না। তিনি নিজে যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছেন তাহা তাঁহাকে বলিতে হয়। দেশের লোকের প্রীতির চেয়েও যে বড়ো জিনিস তাহার খাতিরে তিনি নীরব থাকিতে পারেন না। ইহাতে অনেকে আঘাত পাইয়াছেন, কিন্তু কবিকে এই পথেই চিরদিন চলিতে হইবে। এই-সব সত্ত্বেও, যদি তিনি কোনোদিন দেশবাসীকে আনন্দ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহারই পুরস্কার তিনি চান, সে যেটুকু হোক। এই পুরস্কার যদি দেশবাসী তাঁহাকে না দিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে টাউন-হলে লইয়া গিয়া সংবর্ধনা করিলে বা অন্যভাবে সম্মান দিলে কোনো লাভ নাই। ছেলে একটা খেলনা চাহিলে আর-একটা দিয়া তাহাকে ভুলানো যায়, কিন্তু পূর্ণবয়স্ক মানুষ যাহা চায় তাহার পরিবর্তে অন্য জিনিস দিয়া তাহাকে ভুলানো যায় না। যে ঈশ্বর এবং তাঁহার প্রতিনিধিস্থানীয় যে মানুষ, কবিকে তিরস্কার এবং পুরস্কার দুই দিয়াই গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া এবং সভাস্থ সকলকে নমস্কার করিয়া কবি আসন গ্রহণ করিলেন।

করতালিধ্বনি খুব প্রচণ্ডভাবেই হইল, যদিও এই জিনিসটিতে রবীন্দ্রনাথের আজীবন বিতৃষ্ণা ছিল। কিন্তু শ্রোতারা আর কোনো উপায়ে আপনার মনোভাব প্রকাশ করিতে তো শিখে নাই।

ইহার পর সংগীতের পালা। শ্রীমতী সুপ্রভা রায় একলা একটি গান গাহিলেন, এবং পরে আরো কয়েকজন তরুণী মিলিয়া 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর' গানটি করিলেন। অতঃপর সভাপতি পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উঠিয়া রবীন্দ্রনাথের মাথায় হাত দিয়া উচ্ছ্বসিত আশীর্বাদ করিলেন, এবং সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে কবিবরকে প্রত্যভিবাদন করিতে অনুরোধ করিলেন। সকলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহার অনুরোধ পালন করিল। তাহার পর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের অনুরোধে ইংরেজি গীতাঞ্জলি হইতে কিঞ্চিৎ পাঠ হইল। বই কাছে নাই বলিয়া প্রথমে রবীন্দ্রনাথ অনুরোধ এড়াইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বই তৎক্ষণাৎ একখানা জুটিয়া গেল। ইংরেজি শুনিয়া সকলের মন ভরিল না, সুতরাং বাংলা কবিতাও দুই-তিনটি তিনি পড়িয়া শুনাইলেন। ইহার পর সভাভঙ্গ হইল।

বাহিরে আসিয়া রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পাইলাম। বাবাকে দিবার জন্য একটি প্রবন্ধ আমাদের হাতে দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

বৈশাখ মাসে (এপ্রিল ১৯১৪) গ্রীষ্মের ছুটির জন্য বিদ্যালয় বন্ধ হইবার পূর্বেই 'অচলায়তন' অভিনয় হইল। আমরা এবার গিয়া শান্তিনিকেতন-ভবনে উঠিলাম। রবীন্দ্রনাথ এই সময় 'দেহলী'-নামক ছোটো দুইতলা বাড়িতে বাস করিতেছিলেন, সুতরাং শান্তিনিকেতনের উপরতলা খালিই পড়িয়াছিল। এবার অনেকগুলি নূতন সঙ্গী ও সঙ্গিনী জুটিলেন।

অচলায়তন অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ সাজিয়াছিলেন আচার্য অদীনপুণ্য, সন্তোষবাবু সাজিয়াছিলেন উপাচার্য। দিনেন্দ্রনাথ পঞ্চকের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন এবং জগদানন্দ রায় মহাশয় সাজিয়াছিলেন মহাপঞ্চক। ক্ষিতিমোহনবাবু দাদাঠাকুর সাজিয়াছিলেন। অভিনয়ের ভিতর এক জায়গায় আচার্য দাদাঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন এই দৃশ্য আছে। আমরা যেন কেমন চকিত হইয়া উঠিলাম। যিনি বিশ্বের প্রণম্য তিনি কাহাকেও প্রণাম করিতেছেন, ইহা অভিনয়ের মধ্যেও ভালো লাগিল না।

অচলায়তন অভিনয়ের সময় স্বর্গীয় পিয়ার্সন সাহেব শোনপাংশু সাজিয়া কেমন উদ্দাম নৃত্য করিতেছিলেন তাহা এখনো মনে আছে। তিনি তখন বাংলা শিখিয়াছিলেন, যদিও উচ্চারণের অনেক ত্রুটি তখনো ছিল। কিন্তু তাহাতে তিনি বিন্দুমাত্র দমেন নাই।

আচার্য অদীনপুণ্য-রূপী রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক সুন্দর মূর্তি এখনো চোখে ভাসিতেছে। সাজটা একটু নূতন ধরনের হইয়াছিল। একটি সাদা রেশমের চাদর বুকের উপর দিয়া ঘুরাইয়া পিছনে গ্রন্থি বাঁধিয়া তিনি পরিয়া আসিয়াছিলেন। আমার ছোটো ভাই মুলু ইহার পর কিছুদিন ঐভাবে চাদর বাঁধিয়া গায়ে দিয়া ঘুরিত বলিয়া কথাটা ভালো করিয়া মনে আছে।

ইহার পর আসিল 'সবুজ পত্র'র যুগ। নূতন লেখা হইলে প্রায়ই তিনি কলিকাতায় আসিয়া শুনাইয়া যাইতেন। 'হালদারগোষ্ঠী', 'হৈমন্তী', এবং 'বলাকা'র কয়েকটি কবিতা এইভাবে শুনিয়াছিলাম। ১৯১৫ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে 'ফাল্গুনী' নাটক রচিত হয়।

কিছুদিন পরেই, ইস্টারের ছুটিতে উহা শান্তিনিকেতনে অভিনীত হইল। প্রথম প্রথম যখন শান্তিনিকেতনে যাইতাম তখন বাহিরের মহিলা অতিথির সংখ্যা কমই দেখিতাম, এখন ক্রমেই তাহা বাড়িতেছিল। ফাল্গুনী দেখিতে যেবার গেলাম সেবার মহিলা, তরুণী ও বালিকা মিলিয়া এমন একটি দল উপস্থিত হইল যে থাকার জায়গারই টানাটানি পড়িয়া গেল। গ্রীষ্মের দিন বলিয়া গাড়িবারান্দার-ছাদ প্রভৃতি স্থানগুলিকেও শুইবার জায়গারূপে ব্যবহার করা হইতে লাগিল। পুরুষ অতিথিও অনেক আসিয়াছিলেন। এত জনসমাগমে কবিকেও কিঞ্চিৎ বিব্রত হইতে হইয়াছিল। তবু ইহারই ভিতর সময় করিয়া আমাদের নূতন গান শুনাইয়া গেলেন।

তখন শুক্লপক্ষ ছিল, বাহিরে জ্যোৎস্নার জোয়ার। চন্দ্রালোকে একদিন খোলা আকাশের তলায় ছোটো একটি ইংরেজি নাটিকা অভিনয় হইল। নাটিকাটি আইরিশ কবি এ. ই. লিখিত, নাম বোধ হয় *The King*। অভিনয় যাঁহারা করিয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই এখন পরলোকে। অ্যান্ড্রুজ সাহেব, পিয়ার্সন সাহেব, সন্তোষবাবু ও কালীমোহনবাবুর নাম অভিনেতাদিগের ভিতর মনে পড়িতেছে। King সাজিয়াছিল একটি অল্পবয়স্ক সিন্ধুদেশীয় বালক, নাম যতদূর মনে পড়ে গিরিধারীলাল কৃপালানি। বালকটির গলা অতি মিষ্ট। প্রায় মন্দিরের পাশেই এক জায়গায় একটি পুকুর কাটানো হইয়াছিল। খানিকটা মাটি তোলার পরই উহা পরিত্যক্ত হয়, ঐ আধকাটা পুকুরটির ধারেই অভিনয় হয়। আইরিশ গানগুলি দুর্বোধ্য ছিল, চন্দ্রালোকিত দৃশ্যগুলি এখন স্বপ্নালোকের ছবির মতো মনে পড়ে।

'ফাল্গুনী' অভিনয় জমিয়াছিল খুব। রঙ্গমঞ্চ তো ফুলে পাতায় একেবারে ঢাকিয়া গিয়াছিল, দুই ধারে ছিল দুইটি দোলনা। 'ওগো দখিন-হাওয়া, ও পথিক হাওয়া' গানটি যখন হইল তখন দুইটি ছোটো ছেলে এই দুইটি দোলনায় বসিয়া মহানন্দে দোল খাইতে খাইতে গান আরম্ভ করিল। সঙ্গী তাহাদের অনেকগুলিই ছিল, তাহারা স্টেজে দাঁড়াইয়াই গান করিতেছিল। ঐ ছেলে দুইটির ভিতর একটি সন্তোষবাবুর ভাগিনেয়, ডাকনাম 'বুনী', আর-একটি ছেলের নাম সমরেশ। পাখির কাকলিতে যেমন বনস্থল প্রতিধ্বনিত হয়, বালকদের গানেও তেমনি নাট্যঘরখানি প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। রবীন্দ্রনাথ অন্ধ বাউল সাজিয়াছিলেন, 'ঘরছাড়ার দলে' ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ, সন্তোষবাবু, অজিতকুমার চক্রবর্তী, অসিতকুমার হালদার প্রভৃতি। জগদানন্দবাবু 'দাদা' সাজিয়া যা চৌপদী আওড়াইয়াছিলেন তাহা এখনো মনে আছে।

'অন্ধ বাউলের' গান এখনো যেন কানে বাজিতেছে— 'ধীরে, বন্ধু গো, ধীরে ধীরে' ও 'চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে'।

এই বিপুল অতিথি-সমাগমের ভিতরেও কবি রোজ দুই বেলা আসিয়া আমাদের খবর লইয়া যাইতেন, গান শোনানো, কবিতা পড়িয়া শোনানোও বাদ যায় নাই।

এই বৎসর (সেপ্টেম্বর ১৯১৫) রাজা রামমোহন রায়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধবাসরে রবীন্দ্রনাথ একটি বক্তৃতা করেন। পুরাতন সিটি কলেজ গৃহের সেই তিনতলায়

সভা হয়। সেই বিষম জনতা, ঠেলাঠেলি, প্রায় মারামারি, সবেরই পুনরভিনয় হইয়া গেল।

অন্যান্য বৎসরের মতো ১৩২২-এর (জানুয়ারি ১৯১৬) মাঘোৎসবেও রবীন্দ্রনাথ পৌরোহিত্য করিলেন। মাঘোৎসবের পরেই জোড়াসাঁকোর বাড়ির বিস্তৃত ঠাকুরদালানে আবার 'ফাল্গুনী'র অভিনয় হইল। বাঁকুড়ায় তখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ চলিতেছে, তাহারই সাহায্যকল্পে এই অভিনয় হইয়াছিল। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অভিনয় করা লইয়া কিছু বিরুদ্ধ সমালোচনা হইল, পরে তাহা থামিয়াও গেল।

রবীন্দ্রনাথ এই সময় 'বৈরাগ্যসাধন' নামে একটি ক্ষুদ্র নাটিকা লিখিয়া তাহা 'ফাল্গুনী'র গোড়ায় জুড়িয়া দেন, দুইটি একসঙ্গেই কলিকাতায় অভিনয় হয়।

'বৈরাগ্যসাধনে' রাজসভার দৃশ্যটি হইয়াছিল অপরূপ। যেন কালিদাসের কাব্য হইতে একটি দৃশ্য জীবন্ত হইয়া উঠিল। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এই দুই ভ্রাতাকে যশস্বী চিত্রকর বলিয়াই এতদিন জানিতাম, তাঁহারা যে আবার এত ভালো অভিনয় করেন তাহা কোনোদিন শুনি নাই। অবনীন্দ্রনাথের শ্রুতিভূষণের অভিনয় যাঁহারা দেখিয়াছিলেন তাঁহারা কোনোদিনও ভুলিতে পারিবেন না। প্রহরীর ভূমিকায় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে আবিষ্কার করিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলাম। তাঁহারা যে আসরে নামিতেছেন তাহা জানিতাম না।

রবীন্দ্রনাথ যখন কবিশেখর সাজিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন তখন দর্শকেরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলেন। কোন মন্ত্রবলে যে তিনি নিজের বয়স হইতে ত্রিশটা বৎসর খসাইয়া ফেলিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা গেল না। এলাহাবাদে তাঁহাকে যখন প্রথম দেখিয়াছিলাম, এ মূর্তি যেন তাহারো চেয়ে নবীন। চিরদিন তাঁহাকে গৈরিক বা সাদা পোশাকেই দেখিয়াছি, বিচিত্র মহার্ঘ সজ্জায় সজ্জিত কবিশেখরের ভিতর আমাদের সুপরিচিত রবীন্দ্রনাথকে খুঁজিয়া পাইতেই অনেক সময় কাটিয়া গেল। দর্শকেরা অনেকক্ষণ ধরিয়া নিজেদের আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিলেন।

'বৈরাগ্যসাধন' অবশ্য চক্ষুকে ধাঁধাইয়া দিল, কর্ণকেও পুলকিত করিল কম নহে; কিন্তু 'ফাল্গুনী'র অভিনয় শান্তিনিকেতনে যেমন দেখিয়াছিলাম, এখানে তেমন যেন দেখিলাম না। বালকেরা আর তত প্রাণ খুলিয়া গান গাহিতে পারিল না। দোলনাও তেমন সতেজে দুলিল না। রবীন্দ্রনাথ এখানেও 'অন্ধ বাউল' সাজিয়া গান গাহিয়া গেলেন।

ইহার পর আবার কবির জাপান-যাত্রার একটা কথা উঠিল। কবে যাইবেন, কোথায় কোথায় যাইবেন, সঙ্গে কে কে যাইবে, তাহা লইয়া পূর্বের মতো নানা জল্পনা-কল্পনা চলিতে লাগিল।

১ মে ১৯১৬ বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ জাপান-যাত্রা করিলেন। এপ্রিল মাসের শেষের দিকে কলিকাতায় আসিলেন যাত্রার আয়োজন করিতে। ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের বাড়ি ২৭ কি ২৮ এপ্রিল কবিকে লইয়া একটি গানের আসর হয়। সেইখানে উপস্থিত ছিলাম। কয়েকটি গান হইল, 'বলাকা'র কবিতাও কয়েকটি পড়া হইল।

তাহার পরদিন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে গেলাম। গিয়া দেখি ফোটো তোলার ধুম লাগিয়া গিয়াছে। বাড়ির মেয়েরা নিজেরা সাজিতে এবং ছোটোদের সাজাইতে ব্যস্ত, রথীন্দ্রনাথ নিজের একটি ক্যামেরা ঠিক করিতেছেন এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এক ছাত্রকে 'সিটিং' দিতেছেন। খানিক পরে তিনি উঠিয়া আসিলেন। একটি ছবিতে তিনি বসিলেন, চারি দিক ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন তাঁহার নাতি নাতনী ও নাতবৌয়ের দল। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একটি শিশুকন্যা কবির কোলে গিয়া বসিল। আর-একটি ছবিতে তাঁহার পুত্র কন্যা ও পুত্রবধূও যোগ দিলেন। ছবি তোলা শেষ হইবামাত্র খবর আসিল যে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় রবীন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। কবি নাতনীকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া উঠিয়া পড়িলেন। আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'আমি তা হলে ব্রজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি, তোমরা একটু বসতে পারবে কি?'

আমরা সেইখানেই বসিলাম, তিনি নীচে নামিয়া গেলেন। খানিক পরে সেইখানেই আমাদের আহ্বান আসিল। সেখানে গিয়াও কিছুক্ষণ বসিলাম। রবীন্দ্রনাথ এবারেও তাঁহার সহিত জাপান যাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম। তাঁহার জাপান-যাত্রার আগে আর তাঁহার সঙ্গে দেখা হইল না।

জাপান এবং আমেরিকা ঘুরিয়া রবীন্দ্রনাথ ১৯১৭-র মার্চ মাসে দেশে ফিরিয়া আসিলেন। চিঠিপত্রে প্রায়ই খবর পাওয়া যাইত। জাপানে কবি অনেক বিচিত্র ও সুন্দর উপহার পাইয়াছিলেন, তাহার অনেকগুলি আগেই দেশে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে সেগুলি অনেকদিন সাজানো ছিল, আমরা কয়েকবার গিয়া দেখিয়া আসিয়াছিলাম।

রবীন্দ্রনাথ আসিয়া পৌঁছিবার আগেই রব উঠিয়া গেল যে তিনি আসিয়া পড়িয়াছেন। মহা ছুটাছুটি লাগিয়া গেল যথার্থ খবরের জন্য; তাহার পর শোনা গেল যে তিনি আসিয়া পড়েন নাই বটে, তবে অতি শীঘ্রই আসিতেছেন। ১৩ মার্চ তিনি কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। ঠিক খবরটা জানা না থাকাতে Outram ঘাটে ভিড়টা কিছু কমই হইয়াছিল। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাহার ভিতর অধিকাংশই তাঁহার আত্মীয়ের দল; অনুরক্ত ভক্তবৃন্দের ভিতর যাঁহারা খাঁটি খবর বাহির করিতে পারিয়াছিলেন তাঁহারা অবশ্য আসিয়াছিলেন।

ঘাটের উপরে দোতলায় যেখানে বসিবার ও চা খাইবার স্থান, সেইখানেই বসিয়া আমরা অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। জাহাজ আর আসেই না, অনেক পরে দূরে একটি জাহাজ দেখা গেল। অনেকে আশ্বাস দিলেন ঐটিই ঠিক জাহাজ। সামনে একটি পাইলট বোট খুব দ্রুতগতিতে আসিতেছিল। জাহাজটির নাম 'বাঙ্গালা'। দূর হইতেই জাহাজের ডেকের উপর দাঁড়াইয়া কে একজন দুই-এক বার রুমাল নাড়িলেন। অপেক্ষাকারীদের ভিতর মহা কোলাহল শুরু হইল। তাঁহারাও ছাতা লাঠি রুমাল টুপি প্রভৃতি নাড়িয়া প্রত্যভিবাদন করিতে লাগিলেন। এক দিকে গেরুয়া ধরনের রঙের পোশাকপরা কাহাকে যেন দেখা গেল; দুই-চারিজন বলিয়া উঠিলেন, 'ঐ গুরুদেব!' কিন্তু জাহাজ আর-একটু

অগ্রসর হইয়া আসিতেই দেখা গেল যে মূর্তিটি গুরুদেবের নয়, একটি খাকি-পোশাক-পরা গোরার। আরো কিছু নিকটে আসিলে, জাহাজের ডেকের উপর দণ্ডায়মান রবীন্দ্রনাথ ও মুকুলচন্দ্র দে-কে দেখা গেল। দ্বিতীয় ভদ্রলোকের সমবয়স্ক বন্ধু, যাঁহারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা মুকুলচন্দ্রের পোশাক-পরিচ্ছদ, মাথায় টুপি, লম্বা চুল প্রভৃতি সব-কিছুরই সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ তীরে দণ্ডায়মান জনতাকে লক্ষ্য করিয়া হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন।

তরুণের দল 'Three cheers for Mukul San, hip hip, hurrah!' করিয়া চিৎকার দিলেন। রবীন্দ্রনাথ পরিহাস করিয়া মুকুলচন্দ্রের মাথার টুপিটা খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন।

জাহাজ ঘাটে লাগিবামাত্র মহা ছুটাছুটি ধাক্কাধাক্কি লাগিয়া গেল। আমরা আর তাহার ভিতর ঢুকিতে ভরসা না করিয়া দোতলায় বসিয়াই রহিলাম। নীচে তাকাইয়া দেখিলাম রবীন্দ্রনাথকে অসংখ্য ফুলের মালায় ভূষিত করা হইতেছে। ছবি তুলিবার চেষ্টাও মন্দ হইতেছে না। মেয়েরা ভিড়ের ভয়ে নীচে নামিতে পারিতেছে না দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ এবারে উপরে উঠিয়া আসিলেন। সকলে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। আমাদের দেখিয়া বলিলেন, 'তোমরা সবাই যে এসেছ দেখছি, আমি ভেবেছিলুম কাউকে জানতে না দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে চ'লে আসব।'

একটি উৎসাহী যুবক এখানেও ক্যামেরা-হস্তে উপস্থিত দেখিয়া তিনি ভর্ৎসনার সুরে বলিলেন, "দূর ও আবার কি!" বলিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। ছবি উঠিয়াছিল কি না জানি না।

অতঃপর সকলে মিলিয়া Outram ঘাট হইতে বাড়ি ফিরিয়া চলিলাম।

১৪ মার্চ বোধ হয় বিচিত্রা-ভবনে তাঁহার ফিরিয়া আসা উপলক্ষে ছোটোখাটো একটি সভা হয়। পাঁচটার সময় যাইবার নিমন্ত্রণ ছিল, তখন গিয়া দেখিলাম, কেহই বিশেষ আসেন নাই। যাহা হউক, আগে গিয়া ঠকি নাই, দুইটি বালক-বালিকা আমাদের সারা বাড়ি কেমন সাজানো হইয়াছে তাহা দেখাইয়া লইয়া বেড়াইল এবং পাখির কাকলির মতো অনর্গল কথা বলিয়া চলিল। বালিকাটি সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা, বালকটি মীরা দেবীর পুত্র নীতু। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাপানি জিনিস আসিয়াছিল অসংখ্য, সেগুলিও তাঁহার বসিবার ঘরে গিয়া দেখিয়া আসিলাম। এই সময় তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আমাদের স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। কিছু পরে বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে 'বিচিত্রা'র উপরের ঘরটিতে গিয়া বসিলাম। নিমন্ত্রিতের দল ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিলেন। রবীন্দ্রনাথের সেজোদিদিকে এ সভায়ই দেখিয়াছিলাম। তাঁহার তখন বয়স অনেক হইয়াছিল, তবু দৈহিক সৌন্দর্য ছিল অসাধারণ।

গান অনেকগুলি হইয়াছিল। প্রথমে মেয়েরা অনেকে গান করিলেন, তার পর রবীন্দ্রনাথ নিজে দুইটি গান করিলেন। প্রোগ্রাম হিসাবে আর তেমন কিছু ছিল না, তবে গল্পসল্প অনেক হইল। ভোজনের আয়োজন প্রচুর ছিল, অতিথিরা তাহারো সদ্ব্যবহার

করিলেন মন্দ নয়। এই সভায় ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়কে দেখিয়াছিলাম। ইহার দুই-তিনদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে চলিয়া গেলেন।

তখন ১৯১৭ খৃস্টাব্দ, বর্ষশেষ ও নববর্ষের উৎসব উপলক্ষে ইহার কয়দিন পরেই শান্তিনিকেতনে গেলাম। এবারের দলটি নেহাত ছোটো, পুরুষ যদি-বা দুই-চারজন ছিলেন, মেয়ে আমরা দুই বোন বাদে আর একজন মাত্র ছিলেন। তিনি প্রশান্তচন্দ্রের ভগিনী নীলিমা। গাড়িতে ভিড় খুব বেশি ছিল না। বেলা চারটার সময় বোলপুর স্টেশনে পৌঁছিলাম। আমরা যে যাইতেছি সে খবর সঠিক কাহাকেও দেওয়া হয় নাই, সুতরাং আমাদের লইতে কেহ স্টেশনে আসে নাই। যাহা হউক, দিনের বেলা, ইহাতে কিছু অসুবিধা হইল না। একখানি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিয়া যাত্রা করা গেল, ছেলের দল হাঁটিয়াই চলিল। তখনকার দিনে শান্তিনিকেতন নামটা গাড়োয়ানদের কাছে পরিচিত ছিল না, তাহাদের বলিতে হইত 'কাঁচবাংলা'। শান্তিনিকেতনের মন্দিরটিকে তাহারা এই নাম দিয়াছিল। গাড়িতে বসিয়া জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিলাম, আমাদের দেখিয়া সকলে কিরকম অবাক হইয়া যাইবেন, থাকিবার স্থান কোথায় জুটিবে, ইত্যাদি। শেষে সমস্যার উত্তর গাড়োয়ানই স্বয়ং সমাধান করিয়া দিল। তাহাকে রাস্তার উপর গাড়ি দাঁড় করাইতে বলা সত্ত্বেও সে গাড়ি হাঁকাইয়া সোজা রবীন্দ্রনাথের তখনকার ছোটো বাড়ির সামনে গিয়া দাঁড়াইল। তিনি বোধ হয় তখন চা খাইতেছিলেন, গাড়ির চাকার শব্দে কেহ আসিয়াছে বুঝিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীও বাহির হইয়া আসিলেন। গাড়ি হইতে নামিয়া তাঁহাদের প্রণাম করিলাম। রবীন্দ্রনাথকে কিছু অসুস্থ দেখিলাম ; গালে ও কানের কাছে eczema-র মতো কি বাহির হইয়াছিল। কিন্তু সেই চিরপ্রফুল্ল মূর্তিকে কোনো রোগে ম্লান করিত না। আমাদের সঙ্গে দুই-একটি কথা বলিয়া তিনি বড়োমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'বউমা, তুমি এঁদের ফলটল কিছু খাইয়ে দাও', বলিয়া নিজের খাইবার ঘরে ফিরিয়া গেলেন। অগত্যা খাইতে বসিতে হইল, কারণ তাঁহার অনুরোধ লঙ্ঘন করা যায় না। বাড়ির অন্যান্য মেয়েরাও এই সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে যাঁহারা পদব্রজে আসিতেছিলেন তাঁহারাও আসিয়া পড়িলেন। রবীন্দ্রনাথ এই দলটিকেও নিজের খাইবার ঘরে আহ্বান করিয়া আনিলেন। আমরা এই সুযোগে বাহির হইয়া বারান্দায় বসিলাম। অতিথিদল জলযোগ সারিয়া যখন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন নেপালবাবুকে সেই স্থানে দেখা গেল। তাঁহাকে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, 'দেখুন তো মশায়, আপনি কি কাণ্ড করেন! লোককে নিমন্ত্রণ করে তার পর আর আপনার দেখাই নেই! ভাগ্যে আমি ছিলুম, তাই এখনকার মতো কোনোরকমে ফলমূল দিয়ে অতিথিসৎকার করলুম।' অন্যান্য নানা কথার পর নেপালবাবু আমাদের বলিলেন, 'চলো তোমাদের জায়গা দেখিয়ে দিয়ে আসি।' রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'জায়গা ওদের বেশ ভালো করেই চেনা আছে।'

অতিথিশালার বাড়িতে আসিয়া উঠিলাম। সন্ধ্যার সময় বর্ষশেষের উপাসনা হইবে শুনিলাম। সুতরাং তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখিয়া, স্নানাদি সারিয়া প্রস্তুত হইতে

লাগিলাম। নীচে নামিয়া আসিয়া দেখিলাম উপাসনা আরম্ভ হইতে তখনো কিছু দেরি আছে। এই সময়টা অধ্যাপকদের বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া দেখা সাক্ষাৎ সারিয়া আসিলাম। নেপালবাবুর ঘর হইতে বাহির হইতেই দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ শালবীথিকার ভিতর দিয়া মন্দিরের দিকে চলিয়াছেন। আমরাও তাঁহার পিছন পিছন চলিলাম। আরো দুই-চারজন সঙ্গিনী আসিয়া পড়াতে আমাদের গতি একটু মন্থর হইয়া গেল, কবি চোখের অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ঘণ্টাধ্বনি আরম্ভ হইল। মন্দিরে পৌঁছিয়া আমরা আচার্যের আসনের পিছনে যে বারান্দাটি সেইখানে গিয়া বসিলাম। গায়কেরা যেখানে বসেন সেইখানে মোমবাতির মৃদু আলো, আর কোথাও আলো নাই। শিক্ষকরা, ছাত্রের দল এবং স্বল্পসংখ্যক অতিথি, একে একে সকলেই আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। ঘণ্টাধ্বনি থামিয়া গেল, রবীন্দ্রনাথ আচার্যের আসনে আসিয়া বসিলেন।

প্রথম গান হইল, 'মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছ, তোমায় করি গো নমস্কার।' দিনেন্দ্রনাথ ও রমা দেবী মিলিয়া গানটি করিলেন। উপাসনার সমস্ত কাজ একলা রবীন্দ্রনাথই করিলেন। মানবজীবনে দুঃখের যথার্থ স্থান কি সেই বিষয়ে উপদেশ দিলেন। পৃথিবী হইতে দুঃখকে দূর তো করা যায় না। তাহাকে নমস্কার করিয়া বরণ করিয়া লইতে হইবে, কারণ সে শুধু আঘাতই করে না, সে অমৃতলোকের বাণীও বহন করিয়া আনে।

শেষেও দুইটি গান হইল। একটি দিনেন্দ্রনাথ ও রমা দেবী করিলেন, দ্বিতীয়টি বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা করিল।

উপাসনার পর একজন ভদ্রলোক আলো দেখাইয়া আমাদের শান্তিনিকেতনে পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন। তিনজনে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলাম। মীরা দেবী আসিয়া খানিক পরে আমাদের ডাকিয়া লইয়া গেলেন। 'দেহলী'র দোতলার অতি ছোটো ঘরখানিতে তখন কবি বাস করিতেন। লিখিবার স্থান ছিল তাহার পাশের একটি খুপরিতে। বসিবার ঘরের কাজ করিত সরু বারান্দা ও ছাদ। নীচে তখন মীরা দেবী সপরিবারে বাস করিতেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের উপরে ডাকিতেছেন শুনিয়া উপরে উঠিয়া গেলাম। ছাদও তখন অন্ধকার, কিন্তু আলোর অভাব কেহই অনুভব করিতেছিলেন না। অতিথিদের ভিতর অনেকেই আসিয়া বসিয়াছেন দেখিলাম, আমরাও এক কোণে বসিয়া গেলাম। শুনিলাম, Cult of Nationalism বিষয়ে কথা হইতেছে। আমেরিকা হইতে তিনি তখন সদ্য ফিরিয়াছেন, সে দেশের যাহা-কিছু তাঁহার ভালো লাগে নাই তাঁহার উল্লেখ করিলেন। Collectivism ও Individualism সম্বন্ধে খানিক আলোচনা হইল। অজিতকুমার চক্রবর্তী মাঝে মাঝে তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিলেন।

গানও একটি শুনিবার সৌভাগ্য হইল। তখনকার দিনে যখনি যে কারণেই রবীন্দ্রনাথকে লইয়া সভা বসুক, অন্তত একটি গান না শুনিয়া কেহ তৃপ্ত হইতেন না। 'তোমার ভুবনজোড়া আসনখানি হৃদয়-মাঝে বিছাও আনি' গানটি সেদিন প্রথম

শুনিলাম। আশ্রমের ছেলের দল তখন গানের সুরে দিনের কাজ আরম্ভ করিত, গানেই শেষ করিত। তাহারাও এই সময় নীচে গান গাহিয়া চলিয়া গেল।

এই সময় খাওয়ার ডাক আসাতে আমরা বাধ্য হইয়া নামিয়া গেলাম। খাওয়া হইতেছিল দিনুবাবুর বাড়ি, শ্রীমতী কমলা দেবীর তত্ত্বাবধানে। নামিয়া দেখি পুরুষ-অতিথির দল আহারে বসিয়া গিয়াছেন। আমরা অন্য দিকের বারান্দায় গিয়া বসিলাম। রবীন্দ্রনাথ ছাদের সভা ভঙ্গ করিয়া এই সময় নামিয়া আসিলেন। আমাদের কাছে আসিয়া বলিলেন, 'কি গো, তোমরা বুঝি পরের দলে? মেয়ে হওয়ার ঐ তো মজা, সকলকে পরিবেশন করে পরে যা থাকে তাই খেতে হয়।' কিন্তু মেয়েরা যে পরে খাইবে ইহা তাঁহার ভালোও লাগিল না। কমলা দেবীর কাছে গিয়া বলিলেন, 'জায়গা তো অনেক রয়েছে, মেয়েদের এইসঙ্গে বসিয়ে দিলে ক্ষতি কি?' কমলা সেইরূপই ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে আসিয়া বলিলেন, 'এই দেখো, আমার এত বক্তৃতা মাটি হয়ে গেল।' বক্তৃতা মাটি করার ব্যবস্থাটা অবশ্য নিজেই করিলেন।

খাওয়া শেষ হওয়ার পর নেপালবাবুর সঙ্গে আমাদের আড্ডায় ফেরা গেল। শুনিলাম ভোর সাড়ে-চারটায় নববর্ষের উপাসনা হইবে। পাছে সময়মতো না উঠিতে পারি এই চিন্তায় খানিকটা, এবং গরমেও খানিকটা, রাত্রে ঘুমই হইল না। অতিথিশালার চারি দিকে তখন বড়ো বড়ো গাছ ছিল, এখন কিছু কিছু কাটিয়া ফেলা হইয়াছে মনে হয়। ভোর হইতে-না-হইতেই এইখান হইতে অসংখ্য পাখির বৈতালিক কাকলি শুনিয়া উঠিয়া পড়িলাম, এবং তাহার কয়েক মিনিট পরেই ছাত্রদের প্রভাতী গান কানে ভাসিয়া আসিল —'আমারে দিই তোমার হাতে, নূতন ক'রে নূতন প্রাতে।'

তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া মন্দিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। বাহিরের দিকে তাকাইয়া দেখি তারার আলো ম্লান হইয়া আসিতেছে, পূর্বাকাশে অরুণোদয়ের আভাস।

সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতেই ঘণ্টার শব্দ শুনিলাম। এটি যে নূতন ঘণ্টা তাহা শব্দেই বুঝিলাম। মন্দিরের কাছে আসিয়া দেখিলাম উহা জাপানি গং। কবি ওটি জাপান হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন।

'পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে' গানটি নববর্ষের উৎসবে হইয়াছিল মনে আছে। গান অনেকগুলি হইল, আশ্রমের ছেলের দলই বেশির ভাগ গান করিল। উপাসনান্তে রবীন্দ্রনাথ একটু দ্রুতপদেই মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে প্রণাম করিতে না পাইয়া আমরা অনেকেই বিশেষ ক্ষুণ্ন হইলাম।

সকালের জলযোগ সারিয়া খানিক এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইলাম। দেখিলাম কবি পুরুষ-অতিথির দলকে লইয়া চা খাইতে বসিয়াছেন। শৈলবালা অসুস্থ ছিলেন শুনিয়াছিলাম, তাঁহার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিয়া আসিলাম। সেখান হইতে ফিরিয়া দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ তখনো তাঁহার খাইবার ঘরে বসিয়া আছেন, অতিথির দল চলিয়া গিয়াছেন। নববর্ষের প্রভাতে তাঁহাকে প্রণাম করিতে না পাওয়ায় এতক্ষণ নিজেকে বড়োই বঞ্চিত বোধ করিতেছিলাম, এই সুযোগে ঘরে ঢুকিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ

হইলাম। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'দুপুরে তোমাদের To Women লেখাটা শুনিয়ে দেব এখন।' এই লেখাটি বিদেশে কোনো মেয়েদের সভায় পাঠ করিবার জন্য তিনি লিখিয়াছিলেন। বিকালে দিনুবাবুর বাড়িতে ইহা পড়া হইবে স্থির হইল। আমরা নিজেদের দুদিনের ঘরের দিকে চলিতে চলিতে দেখিলাম একদল ছেলে শালগাছের তলায় বসিয়া মহোৎসাহে গান জুড়িয়াছে, 'তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে।' একটি সাঁওতাল ছেলে মাথায় জবাফুলের মালা পরিয়া তাহাদের দলে বসিয়া বাঁশি বাজাইতেছে। আমাদের দাঁড়াইতে দেখিয়া ছেলেরা তাড়াতাড়ি শতরঞ্চি বাহির করিয়া পাতিয়া দিল। আমরা সেখানে বসিয়া আরো কয়েকটি গান শুনিয়া চলিয়া আসিলাম।

স্নানাদি সারিয়া আবার কমলা দেবীর বাড়িতেই গিয়া ওঠা গেল, কারণ সেখানেই আহারের ব্যবস্থা। বিকালে সেইখানেই পাঠাদি হইবে শুনিয়াছিলাম, সুতরাং অত গরমে আর 'শান্তিনিকেতনে' না ফিরিয়া গিয়া ঐখানেই কোথাও একটু গড়াইয়া লইবার চেষ্টা দেখিলাম। মীরা দেবী আহ্বান করাতে তাঁহার ঘরেই গিয়া জুটিলাম। দুটি বাড়ি প্রায় সামনাসামনিই ছিল।

খানিক পরে সন্তোষবাবু হঠাৎ আসিয়া বলিলেন, 'বাঃ, আপনারা এখানে? গুরুদেব আপনাদের জন্যে শান্তিনিকেতনে অপেক্ষা করছেন, প্রবন্ধ পড়া হবে বলে। আর সকলেও সেইখানেই রয়েছেন।' আমরা তো শুনিয়া অবাক, এমন ব্যবস্থা তো ছিল না! যাহা হউক, সন্তোষবাবুর সঙ্গে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া চলিলাম।

গিয়া দেখিলাম আমাদেরই অপেক্ষায় রবীন্দ্রনাথ তখনো পড়া আরম্ভ করেন নাই। আমরা গিয়া বসিবামাত্র পড়া আরম্ভ হইল। লেখাটি বেশি বড়ো নয়, শেষ হইবামাত্র তাহা লইয়াই আলোচনা আরম্ভ হইল। প্রবন্ধটির ভিতর পুরুষদের উল্লেখ আছে 'The big creatures' বলিয়া। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'দিনু এই লেখাটা শুনলে বড়োই লজ্জা পায়।'

অজিতকুমার চক্রবর্তী অতঃপর মেয়েদের বিরুদ্ধে কি কি অভিযোগ আছে সে বিষয়ে অনেক কথা বলিয়া গেলেন। রবীন্দ্রনাথ কথাগুলিকে খানিকটা হালকা করিবার জন্য বলিলেন, 'দেখো তো তোমাদের কিরকম নিন্দে করছে, ওকে আর নেমন্তন্ন ক'রে কখনো খাইয়ো না।' বিলাতে একবার অসুস্থ হইয়া কবি একটি nursing home-এ ছিলেন, সেখানকার কয়েকটি নার্সের কথা বলিলেন এবং অজস্র প্রশংসা করিলেন।

তাহার পর Cult of Nationalism প্রবন্ধটি পড়া হইল। পড়া শেষ হইলে এই প্রবন্ধটি সম্বন্ধেও কিছুক্ষণ আলোচনা হইল। উহা *Modern Review*-এ প্রকাশ করা চলে কি না, সে প্রশ্নও উঠিল।

সন্ধ্যার সময় দিনুবাবুর বাড়ির বারান্দায় গানের বৈঠক হইবে কথা দিয়া রবীন্দ্রনাথ তখনকার মতো সভা ভঙ্গ করিলেন। তাঁহারা চলিয়া যাইবার পর আমরা খানিক বেড়াইতে বাহির হইলাম। যতক্ষণ না একেবারে অন্ধকার হইয়া গেল ততক্ষণ পথে ও মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইলাম নেপালবাবুর সঙ্গে। তাহার পর ফিরিয়া গিয়া লাইব্রেরি

দেখিতে ঢুকিলাম। গান শোনাটা নানা গোলমালে ঘটিয়া উঠিল না। একবার শুনিলাম গান হইবে না। পরে শুনিলাম গান হইয়াছে বটে, তবে আমাদের খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। পরদিন সুদ-সুদ্ধ আদায় করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া তখনকার মতো শুইতে গেলাম। আগের রাত্রে গরমে ঘুমাইতে পারি নাই বলিয়া আজ আর ঘরে না ঢুকিয়া গাড়িবারান্দার ছাতে শুইলাম।

ভোরবেলা উঠিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। ভাবিয়াছিলাম সুরুলের দিকে যে 'চিপ্ সাহেবের কুঠি' আছে তাহাই দেখিয়া আসিব। কিন্তু বেলা বাড়িয়া চলিয়াছে, রোদও অতি প্রখর, কাজেই সে দিকে না গিয়া পারুলবনের দিকেই চলিলাম। সন্তোষবাবু মাঝপথে আসিয়া যোগ দিলেন। পথে একটি পীড়িত পথিককে ঘিরিয়া আশ্রমের ছেলেরা শুশ্রূষা করিতেছে দেখিলাম। পারুলবনটি আশ্রম হইতে কয়েক মাইল দূরে, পৌঁছিতে-না-পৌঁছিতে বেশ রোদ উঠিয়া পড়িল। বনটি স্বাভাবিক কুঞ্জবনের মতো, মাঝে খানিকটা পরিষ্কার ফাঁকা জায়গা। শুনিলাম কিছুদিন আগে আশ্রমের ছেলেরা এখানে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' অভিনয় করিয়াছিল।

রোদ দেখিয়া তাড়াতাড়ি ফিরিলাম। দেখি দিনুবাবুর বারান্দায় গানের মজলিশ ইতিমধ্যে বসিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সেইখানেই বসিয়া আছেন। আমরাও গিয়া জুটিলাম। গান বেশির ভাগ দিনুবাবুই করিলেন, কবিও দুই-চারটি গাহিলেন। মধ্যে আর-একবার আমাদের উঠিতে হইল প্রাতরাশ সারিবার জন্য। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম বৈশাখের 'প্রবাসী' আসিয়া পৌঁছিয়াছে, উহা সকলের হাতে হাতে ঘুরিতেছে। 'রবিদাদা'-নামক একটি গল্পের বইয়ের বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে, উহা দিনুবাবুকে দেখাইয়া রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'ওরে দিনু, এই দেখ, বিপদ হয়েছে।'

তখনকার নবীন বাংলা লেখকদের লইয়া অনেক আলোচনা হইল। কেহই বিশেষ পাত্তা পাইলেন না। শরৎচন্দ্রের নাম একবার হইল। রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত 'পরগাছা' উপন্যাসটির প্রশংসা করিলেন। কে একজন বলিলেন, 'শরৎচন্দ্রকে তাঁহার এক স্তাবক নাকি বলিয়াছিলেন যে তিনি রবীন্দ্রনাথের চেয়েও ভালো লেখেন; তাহাতে শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, "আরে মশাই, আমি আফিম খাই বলে কি এতই বোকা? নিজের দাম কত তা কি আমি জানি না?" '

সেইদিন বীরভূমের তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট গুরুসদয় দত্ত মহাশয় ও তাঁহার পত্নীর আশ্রমে আসিবার কথা ছিল। দিনেন্দ্রনাথ যাইতে ছিলেন তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য। দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একটি জুড়িগাড়ি ছিল, তখন সেইটিই ওখানকার সেরা গাড়ি। সেই গাড়িটি প্রস্তুত হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। দিনেন্দ্রনাথ উঠিতে যাইবেন এমন সময় রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'আরে, তাঁরা দুইজন আসবেন, তার উপর তুইও চলেছিস? ওটাকে কি মালগাড়ি পেয়েছিস নাকি?' দিনেন্দ্রনাথ তাঁহার রবিদাদার রসিকতা সর্বদাই হাসিমুখে উপভোগ করিতেন; বলিলেন, 'কি করি, যেতেই হবে, উপায় নেই,' বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সাহিত্য-আলোচনা চলিতেই লাগিল। 'ঘরে-বাইরে'র কিছু সমালোচনা হইল। অজিতকুমার চক্রবর্তী বলিলেন, 'ওটা কেমন যেন একটু unfinished লাগে।' রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন যে উহা অসম্পূর্ণ নয়। তখনো তর্ক থামে না দেখিয়া বাবার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'দেখছেন মশায়, কিরকম সাঙ্ঘাতিক লোক, নাকের সামনে বসে সমালোচনা করে।'

লেখিকাদের কথাও উঠিল, স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সমালোচনাও কিছু হইল। রবীন্দ্রনাথ কোনো দলেই ঠিক ভিড়িলেন না। নিজের লেখা-প্রসঙ্গে বলিলেন, 'যখনি লেখা আরম্ভ করি, একটা যেন সংশয়ের মতো থাকে, তার পর এক প্যারা লিখেই দেখি যে বেশ লিখতে পারছি।'

বাবা বলিলেন, 'হ্যাঁ, আপনার পক্ষে এক প্যারা লিখতে পারা একটা মস্ত achievement বটে।' শ্রোতারা সকলেই হাসিতে লাগিলেন। কয়েকটি গান হইয়া তখনকার মতো সভা ভঙ্গ হইল। আজই কোনো-না-কোনো সময়ে তাঁহার নূতন দুইটি প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইবেন আশ্বাস দিয়া কবি চলিয়া গেলেন।

আমরা সবে স্নান শেষ করিয়াছি, এমন সময় তিনি শান্তিনিকেতন-ভবনের দোতলার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মেয়েরা তখনি আসিয়া জুটিলেন, পুরুষ-অতিথিদেরও ডাকিবার জন্য দূত প্রেরিত হইল। নেপালবাবু নিজে যাইতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই তাঁহাকে যাইতে দিতে রাজি হইলেন না। বলিলেন, 'নেপালবাবু, আপনি যেন যাবেন না, মশায়।' তাঁহার নাকি ভয় ছিল যে একবার নেপালবাবুকে যাইতে দিলে তিনি সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ হইয়া যাইবেন। ছেলেরা এ-সব প্রবন্ধ ভালো বুঝিবে না বলিয়া তাহাদের ডাকিতে বারণ করিয়া দিলেন। অতিথিরা কিছু পরে আসিয়া পৌঁছিলে, তিনি একটি ইংরেজি প্রবন্ধ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রবন্ধটির নাম Second Birth। পাঠ সাঙ্গ হইবার পর খানিক আলোচনাও হইল। আর-একটি প্রবন্ধ বেলা ২টায় পড়া হইবে শুনিলাম। ম্যাজিস্ট্রেট-দম্পতি আসিতে পারেন নাই। দিনুবাবুর বাড়িতেই পড়া হইবে।

দুপুরে আহারাদি সারিয়া দিনুবাবুর বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইলাম, তবে তখনি আসর বসিবার কোনো সম্ভাবনা দেখা গেল না। রবীন্দ্রনাথ উপরের ঘরে বসিয়া আছেন দেখিলাম, দুই-তিনজন ভদ্রলোক সেখানে তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেছেন। আমরা নীচে বসিয়া মীরা দেবীর খোকাখুকির সহিত আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ২টা বাজিয়া যাওয়ার পর নেপালবাবু আসিয়া একটি ছেলেকে ঘণ্টা বাজাইতে আদেশ দিলেন। ঘণ্টা বাজিতেই উপরকার সভা ভাঙিয়া দিয়া রবীন্দ্রনাথ নীচে নামিয়া আসিলেন। সকলে মিলিয়া দিনুবাবুর বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বাহিরে তখন বিষম রোদের ঝাঁঝ, ঘরের ভিতরেই বসা হইল। দুইখানি খাট পাতা ছিল, একটিতে রবীন্দ্রনাথ বসিলেন, আর-একটিতে মেয়েরা বসিলেন। ভদ্রলোকদের জন্য নীচে শতরঞ্চি পাতিয়া জায়গা করিয়া দেওয়া হইল। সেদিন Indian Nationalism-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করা হইল। পাঠ

শেষ হইবার পর কেহ কোনো কথা বলিতেছেন না দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'কেউ দু-চার কথা বল?' শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'ওহে ঐতিহাসিক, তুমিই কিছু বল।' কালিদাসবাবু তখনি কিছু বলিলেন না। অজিতবাবু প্রশান্তচন্দ্রকে নিচু গলায় কি যেন বলিতে লাগিলেন দেখিয়া কবি বলিলেন, 'আবার দল বাঁধছ? বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, আর সাহিত্যিক, একেবারে ত্র্যহস্পর্শ!'

দেখিতে দেখিতে আলোচনা জমিয়া উঠিল। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অপেক্ষাও যে তাহার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক স্বাধীনতা বড়ো জিনিস এই মর্মে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি কথা বলিলেন। ভারতবর্ষের জল-হাওয়ার প্রভাব তাহার অধিবাসীদের উপর কতখানি পড়িয়াছে সে কথাও কিছু হইল। রবীন্দ্রনাথ একবার বলিলেন, 'আমার ইচ্ছে আছে, যে-সব ছেলেরা ইংরেজি শিখতে পারছে না বলে ম্যাট্রিকের কোঠায় আটকে যায়, এবং কাজেই আর কিছু শিখতে পারে না, তাদের জন্যে এমন-একটা institution করি, যাতে তারা বাংলার ভিতর দিয়েই সব-কিছু শিখতে পারে।' সকলেই ইহাতে উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন, শুধু শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলিলেন, 'আইডিয়াটা ভালো বটে, কিন্তু এটা কি practical হবে?' রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, 'ও কি সর্দার, তোমায়ও বুড়োয় ধরেছে? আগে তো তুমি বেশ ছিলে হে?' প্রভাতবাবু ফাল্গুনী-অভিনয়ে সর্দার সাজিয়াছিলেন।

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর সভা ভাঙিয়া গেল। আমরা দিনের আলোয় লাইব্রেরি আবার ভালো করিয়া একবার দেখিবার আশায় সেই দিকে চলিলাম। পথে দেখিলাম ছেলেরা এক 'আনন্দবাজার' খুলিয়া বসিয়াছে। জিনিস তাহাতে খুব যে বেশি ছিল তাহা নয়, কিন্তু আনন্দটা ছিল প্রচুর। খাবার কয়েকরকম বিক্রি হইতেছে। সব দোকানে আলাদা আলাদা বিজ্ঞাপন, একটা গাছের ডালে কয়েকজন ছেলে চড়িয়া বসিয়া আছে, এবং নীচে তক্তপোশে আরো কয়েকটি ছেলে বসিয়া। গাছের গায়ে বিজ্ঞাপন লাগানো— 'এখানে বিনা পয়সায় বিশুদ্ধ বায়ু ভক্ষণ করা যায়।' একটি চীনাবাদামের দোকানের বিজ্ঞাপন— 'এই চীনাবাদাম খেলে চীনাদের মতো ফরশা হবে, জাপানিদের মতো ছবি আঁকতে পারবে, দিনুবাবুর মতো গান গাইবে, আর ফুটবল ম্যাচে prize পাবে। এক পয়সা দিলেই এত হবে।' আর-এক জায়গায় কচালু বিক্রয় হইতেছে, সেখানে মহোৎসাহে নৃত্যগীত চালাইয়া ক্রেতা জোটানো হইতেছে। ছাত্রেরা নেপালবাবুকে আসিয়া একবার আক্রমণ করিল। তিনি পরে চার আনা দামের জিনিস কিনিবার আশ্বাস দিয়া তখনকার মতো নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

লাইব্রেরিতে গিয়া অনেকক্ষণ কাটাইয়া আসিলাম। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি ও Gardener-এর ফ্রেঞ্চ, জার্মান এবং ডচ অনুবাদ দেখিলাম। জাপানি অনুবাদও একখানা দেখিলাম। প্রকাণ্ড একখানি জাপানি ছবি দেখিলাম, তাহা গোল করিয়া পাকাইয়া রাখা হইয়াছে। লাইব্রেরি দেখা শেষ করিয়া, বৈকালিক জলযোগ সারিতে মীরা দেবীর বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। তাহার পর সন্তোষবাবুদের বাড়ি চলিলাম, সকলের কাছে বিদায়

লইবার জন্য। সেইদিনই রাত বারোটার গাড়িতে আমাদের কলিকাতা ফিরিবার কথা। দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ নিজের ছোটোঘরের সামনের ছাদটিতে আসিয়া বসিলেন।

সন্ধ্যার পর যখন ফিরিয়া আসিতেছি তখনো দেখিলাম তিনি সেই ছাদেই বসিয়া আছেন। রাত্রিকালে হয়তো দেখা হইবে না, তাই এখনি বিদায় লইয়া রাখিবার জন্য উপরে গিয়া উঠিলাম। ছাদের উপরেই তাঁহার পায়ের কাছে সকলে গিয়া বসিলাম। কমলা দেবীকে তিনি নাতবউ বলিয়া অতিশয় স্নেহ করিতেন এবং দেখিলেই নানাপ্রকার রসিকতা করিতেন। পূজার ছুটিতে আশ্রমের মেয়েরা কি অভিনয় করিয়াছিলেন, কে কি সাজিয়াছিলেন, তাহারই সব গল্প হইতে লাগিল। বাড়ির সামনের পথ দিয়া দুইজন ছেলে কথা বলিতে বলিতে যাইতেছিল, তাহারা যে কে অন্ধকারে দেখা গেল না। ভূতের গল্পই হইতেছিল বোধ হয়। একজন বলিল, 'কিছু না শুনলেও, অশত্থ কি বট গাছের তলায় এলেই—' শুনিতে পাইয়া উপর হইতে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'কেমন গাটা ছম্ ছম করে, না?' ছেলে দুইটি তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল।

একটু পরেই দেখিলাম সন্তোষবাবু উপরে উঠিতেছেন, তাঁহার পিছন পিছন চার-পাঁচটি ছোটো ছেলে। প্রথমে বুঝিতে পারিলাম না ব্যাপার কি। সন্তোষবাবু কাছে আসিয়া তাহাদের হইয়া নিবেদনটা যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিলেন। ছেলেদের দল নাকি একটি icecream freezer তৈয়ারি করিয়া icecream বানাইয়াছে, তাই গুরুদেবকে খাওয়াইতে আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সস্নেহহাস্যে বালকদিগের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'আগে তোদের আইসক্রিমের দাম কত বল শেষে খেয়েদেয়ে যদি আবার দাম না দিতে পারি?' বালকগুলি পাকা ব্যবসাদার, তখন দাম বলিতে কিছুতেই রাজি হইল না। গুরুদেবকে ও আমাদের সকলকেই তাহাদের আইসক্রিম খাওয়াইয়া তখনকার মতো বিদায় লইয়া গেল। আমরাও সন্তোষবাবুর কাছে দাম জানিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য হইলাম না। পরে শুনিলাম ছেলের দল সমস্ত দামই তাহাদের গুরুদেবের কাছে আদায় করিয়া লইয়াছে। এই ছোটো ছোটো ছেলেগুলি তাঁহাকে ভক্তি করিত দেবতার মতো, দিনে যতবার তাঁহার সাক্ষাৎ পাইত ততবার পদধূলি গ্রহণ করিত, অথচ মায়ের কাছে ছেলে যেভাবে আবদার করে সেইভাবেই তাঁহার কাছে আবদারও করিত।

সেদিন ছাদে অনেক রাত্রি পর্যন্ত বসিয়াছিলাম। আর কয়েক ঘণ্টা পরেই চলিয়া যাইতে হইবে বলিয়া মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া অবর্ণনীয় এক শান্তি ও পূর্ণতার অনুভূতিতে হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছিল, নড়িবার যেন সাধ্যই ছিল না। তাঁহার কাছে নীরবে বসিয়া থাকারও যে কী মূল্য ছিল তাহা ভাষা দিয়া কি বুঝাইব। তাঁহার গান গল্প কবিতা-পাঠ সবই তো আমরা উপভোগ করিয়াছি, এগুলি যে আমাদের কাছে কতখানি ছিল, তাহা যাঁহারা এ-সকলের পরিচয় পাইয়াছিলেন তাঁহারাই বুঝিবেন, কিন্তু শুধু তাঁহার কাছে বসিয়া থাকিয়া যে পরমতম আনন্দ নিজে পাইয়াছি তাহার সহিত কিসের তুলনা দিব? দেবতার সান্নিধ্যে ভক্তের যে আনন্দ তাহারই সঙ্গে হয়তো ইহার কিছু সাদৃশ্য আছে।

অন্ধকারে অনেকেই পা টিপিয়া টিপিয়া উপরে উঠিয়া আসিতেছিলেন, মেয়েরা বসিয়া আছেন দেখিয়া আবার সেইভাবেই নামিয়া যাইতেছিলেন। কমলা দেবীর ডাক পড়িল নিজের বাড়িতে, তিনি নামিয়া গেলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন আমেরিকান মেয়েদের কথা বলিতেছিলেন। অধিকাংশ মহিলার ধরনধারণে যে কৃত্রিমতা ছিল তাহা তাঁহাকে বড়োই পীড়িত করিয়াছিল। বলিতেছিলেন, 'ওখানে যাঁরা আমার পুরুষ-বন্ধু ছিলেন তাঁরা অনেকেই খুব উদার, মহৎহৃদয় লোক, কিন্তু তাঁদের বাড়িতে শেষে আমার আর যেতে ইচ্ছা করত না এইজন্যে। তাঁদের স্ত্রীরা কথায় কথায় "Oh how nice!", "Oh how nice!" ক'রে 'হাউ-হাউ' ক'রে আমাকে একেবারে জ্বালিয়ে তুলতেন। ওদের অবিশ্যি খুব বেশি দোষ দিই নে আমি, অনেকটা ঐরকম হতে ওদের সমাজই ওদের বাধ্য করেছে।' কয়েকটি মহিলার নাম করিলেন, যাঁহাদের উপর তাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। জাপানের মেয়েদের কথা খুব স্নেহের সহিত উল্লেখ করিলেন, বলিলেন, 'ওরা অনেকটা আমাদের দেশের মেয়েদের মতো।' তাহারা কবিকে অতিশয় সমাদর করিয়াছিল। তিনি যখন জাপান হইতে চলিয়া আসেন তখন জাহাজঘাটে আসিয়া এই দুদিনের চেনা বন্ধুর জন্য অনেকে অশ্রুপাত করিয়াছিল। ইহা কবিকে যতটা বিস্মিত করিয়াছিল, আমাদের ততটা কিছুই করিল না। তাঁহাকে যে একদিনও নিকটে পাইয়াছে সে যে তাঁহাকে বিদায় দিতে অশ্রুপাত করিবে সে আর বিচিত্র কি? বাংলাদেশের নরনারীর হৃদয়ে এত দীর্ঘদিন ধরিয়া যে তিনি অখণ্ড রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন তাহা বাঙালির নিজগুণে নয়, তাঁহাকে ভালো না বাসা, সুস্থ প্রকৃতিস্থ মানুষের পক্ষে অসম্ভব ছিল বলিয়াই।

কলিকাতায় এই সময় কয়েকজন ব্রাহ্ম ছেলেমেয়েকে লইয়া একটা ছোটো club-এর মতো গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রশান্তচন্দ্র হঠাৎ উপরে আসিয়া দিদিকে অনুরোধ করিলেন, সেই ক্লাবের আদর্শের বিষয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কিছু আলোচনা করিতে। আমরা, অর্থাৎ তখনকার মেয়েরা, আধুনিক তরুণীদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম মুখফোঁড় ছিলাম, বিশেষত কবির সম্মুখে, কথা বলিতে হইবে মনে করিলেই তো আমাদের কণ্ঠরোধ হইত। সুতরাং দিদি তখনি কিছু বলিলেন না। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন 'শান্তা, তোমাদের কি প্রশ্ন আছে আমাকে বলো তো।' দিদির হইয়া প্রশান্তচন্দ্র বলিয়া দিলেন, 'শান্তা বলছিলেন যে পুরুষেরা জোর ক'রে মেয়েদের কতগুলো ideal খাড়া করে দিয়েছে—' তিনি শেষ করিবার আগেই রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'আর এখন তার ভার সামলানো দায় হয়ে উঠেছে।' তাহার পর মেয়েদের কি আদর্শ সর্বদা তাঁহার মনে বিরাজ করে, এই বিষয়ে তিনি অনেকক্ষণ কথা বলিয়া গেলেন। দেশের লোকের মনে নারীত্বের যে কি আদর্শ, কেন এই আদর্শ তাহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছে সব বিষয়েই আলোচনা করিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার এক বউদিদির (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নীর) কথা উল্লেখ করিলেন।

মেয়েদের লেখা কেন প্রথম শ্রেণীর হয় না, সেই কথা উঠাতে বলিলেন, 'পৃথিবীর সঙ্গে যথার্থ পরিচয়ের অভাব তাদের পঙ্গু করে রেখেছে। এইজন্যে আমি কখনো কোনো

মেয়ের লেখাকে মন থেকে প্রশংসা করতে পারি নি। ওদের সবটাই যেন কল্পনা। প্রশংসা করতে পারলে কিন্তু আমি খুব খুশি হতুম। আমার পিতা যদি আমাকে জমিদারি দেখতে না পাঠাতেন তা হলে আমার লেখাও ঠিক ঐ ধরনের হত।'

প্রায় রাত সাড়ে-ন'টা অবধি সেখানে বসিয়া থাকিয়া, অবশেষে আমরা বাধ্য হইয়া উঠিয়া পড়িলাম। তখনো খাওয়া-দাওয়া করা, জিনিসপত্র গুছানো, সবই বাকি। তাঁহাকে প্রণাম করাতে বলিলেন, 'আবার আমার সঙ্গে দেখা হবে, তোমরা তো সেই রাত্রের গাড়িতে যাচ্ছ?' শান্তিনিকেতন-ভবনে ফিরিয়া জিনিসপত্র সব গুছাইয়া রাখিলাম। এই সময় খাইবার ডাক পড়িল। লন্ঠনধারী ভৃত্যের সঙ্গে আবার মীরা দেবীর বাড়িতেই ফিরিয়া আসিলাম। উপরে অনেকের গলা শুনিতে পাইলাম। বুঝিলাম অন্য অতিথিরা এতক্ষণে line clear পাইয়া কবির কাছে গিয়া বসিয়াছেন। এই উৎসবগুলির সময় রবীন্দ্রনাথ রাত্রিকালে ঘুমাইবার জন্য কয়েক ঘণ্টা ছুটি পাইতেন মাত্র, আর সমস্তটা সময় ছিল অতিথিদের জন্য। আমরা মেয়ে এবং বয়সে অন্যান্য অতিথিদের চেয়ে ছোটো, আমরাই প্রশ্রয় পাইতাম সর্বাপেক্ষা বেশি। কিন্তু কখনো সে প্রশান্ত ললাটে বিরক্তি বা ক্লান্তির চিহ্ন দেখি নাই। মুখের হাসির প্রসন্নতা এক তিল কমে নাই। দিয়াই তাঁর আনন্দ ছিল। পরবর্তী জীবনে বার্ধক্য ও অসুস্থতার জন্য তিনি আর আমাদের কাছেও সহজলভ্য ছিলেন না। কাছে যাইবার চেষ্টা করিলে অনেক সময়েই বাধা পাইতাম। মন ইহাতে ক্ষুণ্ণ ও পীড়িত হইত। বাধা যাঁহারা সৃষ্টি করিতেন তাঁহাদের সম্বন্ধে মন প্রসন্ন থাকিত না। তখন সেই অতীত দিনগুলিকে স্মরণ করিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দিতাম। আমরা যাহা পাইয়াছিলাম তাহা তো জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটেরও জোটে নাই। ইহাতেই কেন তৃপ্ত থাকি না? স্মৃতির ভাণ্ডারে যাহা অমূল্য অক্ষয় অনির্বাণ হইয়া জাগিয়া আছে তাহা তো কেহ হরণ করিতে পারিবে না? এই স্মৃতিই এখন আমাদের চিরপাথেয়, চিরসম্বল। যাহা পাইলাম না তাহার জন্য আর কোনো ক্ষোভ রাখিব না।

কমলা দেবীর বিস্তৃত বারান্দায় খাইতে বসা গেল। দশ-বারো বৎসর ধরিয়া সমানে আমরা শান্তিনিকেতনে যাতায়াত করিয়াছি। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী, কমলা দেবী, মীরা দেবী, স্বর্গীয়া সুকেশী দেবী, সকলেই সর্বদা আমাদের একান্ত আত্মীয়ার মতো গ্রহণ করিয়াছেন ও সেইভাবে আদরযত্ন করিয়াছেন। ইঁহাদের আদরে কোনোদিন কোনো সংকোচ বোধ করি নাই, নিজের মা-মাসী বা দিদির আদর-যত্ন মানুষে যেভাবে গ্রহণ করে সেইভাবেই গ্রহণ করিয়াছি। তখনকার কথা যখন ভাবি, ইঁহাদের কথা, সেকালের অধ্যাপক ও অধ্যাপক-পত্নীদের কথা, নাম-না-জানা ছোটো ছোটো ছেলেদের কথা, স্মৃতির পটে যেন তারকার মতো উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠে।

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া উঠিয়া পড়িলাম। কমলা দেবী ও দিনুবাবুর কাছে বিদায় গ্রহণ করিয়া মীরা দেবীর খোঁজ করিয়া জানিলাম তিনি খুকিকে ঘুম পাড়াইতেছেন। তিনিও একটু পরে বাহির হইয়া আসিলেন। রবীন্দ্রনাথও নীচে নামিলেন। আর-একবার তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া ধন্য হইলাম। বলিলেন, 'সবাই তো চলে গেল, কাউকেই

ধরে রাখতে পারলুম না।

ফিরিয়া আসিলাম, তবে ট্রেন বারোটায়. বারোটা বাজিতে বড়ো আর দেরি ছিল না। কাজেই শুইবার চেষ্টা না করিয়া কেহ-বা বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া, কেহ-বা ঘুরিয়া বেড়াইয়া সময়টা কাটাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

নীলিমা হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'কে এসেছিল?' তাকাইয়া দেখিয়া মনে হইল একটা লন্ঠনের আলো সিঁড়ির দিকে সরিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ যে আবার এত রাত্রে আসিবেন তাহা আমাদের আশার অতীত ছিল, কিন্তু খোঁজ লইয়া জানা গেল সত্যই তিনিই আসিয়াছেন। আমরা ব্যস্ত আছি মনে করিয়া নীচে নামিয়া গিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। সকলে আবার তাড়াতাড়ি ছুটিয়া নীচে নামিলাম। আমাদের স্টেশনে লইয়া যাইবার জন্য গাড়িও আসিয়া গিয়াছে দেখিলাম। রবীন্দ্রনাথকে উপরে আসিয়া বসিতে বলাতে তিনি বলিলেন, 'থাক, এখুনি তো তোমাদের নামতে হবে, সময় হয়ে এল।' Cult of Nationalism সম্বন্ধে বাবার সঙ্গে তাঁহার কিছু আলোচনা হইল। ইহা কাগজে প্রকাশ করা চলে কি না সেই প্রসঙ্গে বলিলেন, 'আমার লেখা প্রকাশ করতে গিয়ে কাউকে কোনো বিপদে না পড়তে হয়, সেটা দেখা দরকার।'

গাড়ির সময় হইয়া আসিতেছে, আর দেরি করা গেল না। আবার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার স্পর্শের আশীর্বাদ মাথায় লইয়া ফিরিয়া চলিলাম। নিজেই হারিকেন লন্ঠনটি হাতে করিয়া তিনি ফিরিয়া চলিয়াছেন, গাড়ি হইতে দেখিতে পাইলাম।

বলদের বসটির spring ভালো ছিল না। প্রথমে আমরা তিনজন মেয়েই তাহাতে উঠিলাম। কিন্তু পরে অন্য সব কয়জনকেও বলিয়া-কহিয়া গাড়িতেই তুলিয়া লওয়া গেল। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, অন্যরা অত পথ হাঁটিয়া যাইবেন তাহা ভালো লাগিল না। বহু দূর হইতেও শান্তিনিকেতনের আলো দেখিতে পাইলাম।

ট্রেনে বিষম ভিড়। প্রভাতবাবুর সাহায্য না পাইলে গাড়িতে উঠিতেই পারিতাম না বোধ হয়। তিনি একরকম গায়ের জোরেই আমাদের মেয়েদের গাড়িতে ঠেলিয়া ঢুকাইয়া দিলেন। একটি বুদ্ধিমতী যাত্রিণী দুই পা দরজার উপর তুলিয়া দিয়া ঘুমাইতেছিলেন, অনেক কষ্টে তাঁহার পা রক্ষা পাইল। সহযাত্রিণীরা ভদ্রগোছেরই ছিলেন, ঐ অসম্ভব ভিড়েও নড়িয়া বসিয়া, পালা করিয়া আমাদের এক-একবারের বসিবার জায়গা দিলেন। এই ট্রেনের কয়েকটি সহযাত্রিণীকে লইয়া দিদি কিছুদিন পরে 'শিক্ষার-পরীক্ষা'-নামক একটি ছোটো গল্প লিখিয়াছিলেন। সকালবেলা কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

ইহার কয়েকদিন পরে (১৯১৭) রবীন্দ্রনাথও কি একটা পারিবারিক কারণে কলিকাতা আসিলেন। সমাজপাড়ায় একটি 'বাল্যসমাজ' ছিল, ইহার ছেলেমেয়েরা মধ্যে মধ্যে গান অভিনয় প্রভৃতি করিয়া বন্ধুবান্ধবের মনোরঞ্জন করিত। এবার তাহাদের শখ হইল তাহারা 'ডাকঘর' অভিনয় করিবে। অমল সাজিবার উপযুক্ত একটি ছোটো ছেলেও পাওয়া গেল, তার নাম আশামুকুল। রিহার্সালও বেশ জমিল। রবীন্দ্রনাথ কাহারো মুখে খবর পাইয়া প্রশান্তচন্দ্রকে বলিয়া পাঠাইলেন যে অভিনয়স্থলে তিনি উপস্থিত থাকিবেন।

ইহাতে বাচ্চা অভিনেতা ও তাহাদের অভিভাবকবর্গ বিষম ভয় পাইয়া গেলেন। ভয় পাইলেও তাঁহারা অভিনয় করিতে ও রবীন্দ্রনাথকে দেখাইতেও সাহস করিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন, এমন সময় আশামুকুলের মায়ের অকস্মাৎ পীড়ার সংবাদ আসিয়া পৌঁছনোতে সে গিরিধি চলিয়া গেল। আর-কাহাকেও অমলের ভূমিকায় অভিনয় করিতে রাজি করা গেল না, সুতরাং অভিনয়ই হইল না।

মেয়েদের দিক হইতে একদিন রবীন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ করা হইল, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিবার জন্য। স্থান স্থির হইল মেরী কার্পেন্টার হল। কথা ছিল যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে তাহা হইলে স্কুলের মেয়েদের বেড়াইবার যে ছোটো মাঠটি আছে সেইখানেই সবাই বসিবেন, হঠাৎ ঝড়ঝাপটা আসিলে হলে ঢোকা যাইবে। দুই-তিনজন ছেলেমেয়ে গিয়া কবিকে সাদর নিমন্ত্রণ জানাইয়া আসিল।

২৪ এপ্রিল বিকালে সেই পার্টি হইবার কথা, সেইদিনই সকালে তিনি আমাদের বাড়ি বেড়াইতে আসিলেন। আমাকে বলিলেন, 'কি গো, বিকেলে তো তোমরা আমাকে তোমাদের ওখানে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছ, আমাকে নিয়ে কি করতে চাও?' বাবার সঙ্গে খানিক আলোচনা করিলেন তাঁহার ইংরেজি প্রবন্ধগুলি লইয়া। পরে শ্রীযুক্তা মণিকা মহলানবীশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য তিনি চলিয়া গেলেন।

বিকালে আমাদের গিয়া পৌঁছিতে কিঞ্চিৎ দেরি হইয়া গেল। বাহিরে দেখিলাম তাঁহার মোটরটি দাঁড়াইয়া আছে। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম সকলে তখনো ছোটো মাঠটিতেই বসিয়া আছেন, হলে প্রবেশ করেন নাই। প্রিয়ংবদা দেবী তখন ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তিনি দাঁড়াইয়া রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলিতেছেন। খানিক পরেই সবাই আসন গ্রহণ করিলেন, কথাবার্তাও জমিয়া উঠিল। কিন্তু তখনি আকাশের কোণে ঝড়ের পূর্বভাস দেখা দিল। এই সময় মেয়েদের ডাক পড়িল গানের জন্য। শ্রীমতী সাহানা গুপ্ত 'শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে' গানটি আরম্ভ করিবামাত্র বোঝা গেল যে ধারাবর্ষণ হইতে অধিক বিলম্ব নাই। সুতরাং গান শেষ হইবামাত্র সকলকে লইয়া তাড়াতাড়ি হলের ভিতরে গিয়া বসা হইল। চায়ের ব্যবস্থা ছিল, সকলেই কিছু জলযোগ করিলেন। রবীন্দ্রনাথও নিষ্কৃতি পাইলেন না। শতরঞ্চি পাতিয়া সকলে বসা গেল। আর-একটি গানের পর রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের বিষয় সংক্ষেপে কিছু বলিলেন। To Women বলিয়া যে প্রবন্ধটি তিনি শান্তিনিকেতনে পড়িয়াছিলেন অনেকটা সেই কথাগুলিই।

তাঁহার কথা শেষ হইবামাত্র আবার আলোচনা শুরু হইল। আলোচনার সব ক'টা বিষয়বস্তুই যে খুব স্থান বা কালোচিত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত না থাকিলে একটা বিধিমতো ঝগড়া বাধিয়া যাইত বোধ হয়, তবে তিনি কথাটা ঘুরাইয়া ব্যাপারটা সেখানেই থামাইয়া দিলেন। প্রিয়ংবদা দেবীও তাঁহাকে কিছু সাহায্য করিলেন।

গান শুনিবার জন্য তখন সকলে মহা ব্যস্ত। 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে' গানটি তখন সবে রচিত হইয়াছে ও প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গানটি শুনিতে চাওয়ায় একটা প্রবাসীর খোঁজ পড়িল। ইতিমধ্যে কবি Canada and India

বলিয়া একটি কাগজ হইতে তাঁহার একটি ইংরেজি কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন। তাহার পর তিনি অনুরোধ করাতে সুকুমার রায় তাঁহার স্বরচিত 'স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ'-নামক একটি মজার কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন। রবীন্দ্রনাথ অতঃপর একটি গান গাহিলেন। ইহার পর সেদিনকার মতো সভা ভঙ্গ করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

তিনি চলিয়া যাইবার পরেও খানিকক্ষণ আমরা বাহিরের ছোটো মাঠটিতে দাঁড়াইয়া গল্প করিলাম। বাসন্তীদিদি (কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা) আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, 'জানো, কাল আমাদের বাড়ি একটা বেশ মজার কাণ্ড হয়ে গেছে।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'কি কাণ্ড?' তিনি বলিলেন : তাঁহাদের বাড়িতে একটি পাহাড়ী বালক ভৃত্য আছে। ইহার আগেরদিন রবীন্দ্রনাথ একবার কৃষ্ণবাবুদের বাড়ি গিয়েছিলেন। উপরে খবর পাঠাইয়া তিনি নীচে মোটরেই বসিয়াছিলেন। পাহাড়ী বালকটি হঠাৎ আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে তিনি তাহাকে একবার মোটরগাড়িতে বসিতে দিবেন কি না। রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ রাজি হইয়া বালককে গাড়িতে তুলিয়া লইলেন ও অনেকখানি ঘুরাইয়া আনিয়া আবার নামাইয়া দিলেন। তিনি চলিয়া যাইবার পর কৃষ্ণবাবু বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুই ও-গাড়িতে কার হুকুমে চড়েছিলি?' বালক বলিল, 'একজন খুব সুন্দর রাজা ভিতবে বসেছিলেন, তাঁকে বলেছিলাম।' গল্পটি শুনিয়া আমার শিশুকালের সেই 'মহারাজে'র কথা মনে পড়িল। সেও রবীন্দ্রনাথকে 'রাজা' বলিয়া চিনিয়াছিল। কৃত্রিম শিক্ষা ও সভ্যতা এই দুটি মানুষের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে নাই, তাই কি তাহারা কবিকে যথার্থই রাজা বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল?

পরেরদিনও ঐ স্থানে যুবক-সমিতির উদ্যোগে আর-একবার রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করা হইল। কবি প্রশান্তচন্দ্রকে বলিলেন, মেয়েরা একেবারে কথা বলে না ইহা তাঁহার ভালো লাগে না। কথা বলিবার জন্য অনেককেই আগে থাকিতে অনেক অনুরোধ করিয়া রাখা হইল, কিন্তু কার্যত ফল প্রায় একই রকম হইল।

আগেরদিন দেরি করিয়া গিয়াছিলাম এবং সে কারণে একটু ঠকিয়াওছিলাম, তাই আজ সকাল-সকাল গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখনো বিশেষ কেহই আসেন নাই। ক্রমে ক্রমে লোক বাড়িতে লাগিল, অধিকাংশই ছেলেমেয়ের দল। রবীন্দ্রনাথ নিজে কোনোদিন 'বুড়ো' হন নাই, এইজন্য যথার্থ 'বুড়ো'র দল তাঁহাকে কোনোদিনই বেশি পছন্দ করিতেন না। অবশ্য শারীরিক বার্ধক্যের কথা আমি বলিতেছি না, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

কিছুক্ষণ পরে তাঁহার গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। প্রতিমা দেবী ও এণা দেবীকে সঙ্গে করিয়া তিনি গাড়ি হইতে নামিলেন। আজ আকাশ পরিষ্কার ছিল, বাহিরেই চেয়ার পাতিয়া বসিবার আয়োজন হইল। মেয়েদের কাছে আসিয়া তিনি বসিলেন। কয়েকটি তরুণী ও বালিকার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় করিয়া দেওয়া হইল। সকলেই পরিচয়ান্তে নীরবে বসিয়া রহিলেন, কথা বলিবার কোনো লক্ষণ দেখাইলেন না। রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'সীতা, তোমার সঙ্গে আলাপ করতে হবে না?'

অতঃপর ছেলেদের মধ্যে গিয়া বসিয়া খানিকক্ষণ তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া আসিলেন। তাহার পর আজও আকাশে মেঘসঞ্চার দেখিয়া আগেরদিনের মতো হলের ভিতর গিয়া বসা হইল। ঘরের ভিতর বেশ গরম তখন, বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থাও ছিল না। আমি ও আমার একটি সঙ্গিনী কাছে বসিয়া হাতপাখা দিয়া সারাক্ষণ তাঁহাকে বাতাস করিলাম।

প্রথমেই তাঁহাকে গান করিতে অনুরোধ করা হইল, তিনি একটি গান করিলেনও। তাহার পর নানা বিষয়ে আলোচনা চলিল। International problems ছাড়িয়া শেষে ব্রাহ্মসমাজের ঘরোয়া কথাও অনেক হইয়া গেল। নারীজাতির ভাগ্য নির্ণয় করিতে পুরুষরা সর্বদাই তৎপর, সুতরাং কিছু পরে সে কথাও উঠিল। কয়েকজন যুবকের ভাব দেখিয়া মনে হইল যে, সমগ্র নারীজাতির ভবিষ্যৎ-বিধান করিবার জন্য একটি কমিশন বসিয়াছে, এবং তাঁহারা বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছেন। সুকুমার রায় একমাত্র মেয়েদের পক্ষ লইয়া কথা বলিয়াছিলেন, তাহা এখনো মনে আছে। রবীন্দ্রনাথ অনেকবার মেয়েদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'তোমরা কিছু বলো!' দুই-চারিজনের নাম ধরিয়াও আহ্বান করিলেন, কিন্তু খুব বেশি সাড়া পাইলেন না। দুইজন মেয়ে দুই-চারিটি কথা মিহি সুরে বলিলেন। আলোচনাটা বিশেষ প্রীতিকর হইতেছে না তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং কথার মোড় ফিরাইবার জন্য আবার গানের প্রস্তাব উঠিল। শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ একটি খাতায় গুটিকতক নূতন গান তুলিয়া আনিয়াছিলেন, সেই খাতাখানি তিনি কবির দিকে অগ্রসর করিয়া দিলেন। 'এই তো ভালো লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়' এবং 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে', এই গান-দুটি রবীন্দ্রনাথ গাহিয়া শুনাইলেন।

তাহার পর সভা ভঙ্গ হইল। গ্রীষ্মের ছুটিতে রবীন্দ্রনাথের একবার দার্জিলিং ঘুরিয়া আসার কথা ছিল, সেই বিষয়ে তিনি দুই-একজনের সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলেন। একটি সদ্য-বাগ্‌দত্তা তরুণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি গো, একদিনও যে গান শিখতে গেলে না?' তাহার এক ভগিনী বলিলেন, 'ও এখন অন্য কাজে ব্যস্ত!' রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, 'আমি সব খবর রাখি।'

পরদিন শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার মহাশয়ের বাড়িতে আবার কবির সাক্ষাৎ পাইলাম। সেদিন যে উপলক্ষ কি ছিল তাহা ভালো করিয়া মনে পড়ে না। সরকারমহাশয়ের পরিবারবর্গ তখন অনেকেই কলিকাতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলেন, বাড়ি প্রায় জনশূন্য। তবে নিমন্ত্রিত অনেকে আসিয়াছিলেন। হ্যারিসন রোডের মোড়ে পৌঁছিতেই রবীন্দ্রনাথের গাড়ি আমাদের পাশ দিয়াই চলিয়া গেল। আমরা খানিক পরে গিয়া পৌঁছিলাম।

খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামে খানিক সময় কাটিয়া গেল। তাহার পর একটি বড়ো ঘরে সভা বসিল। একটু পিছন দিক ঘেঁষিয়া বসিলাম। জানিতাম আজও উৎসাহী যুবকবৃন্দ নারীপ্রগতির চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না। এ ক্ষেত্রে সামনে না বসাই শ্রেয়। হইলও তাহাই,

মেয়েদের লইয়াই কথা উঠিল। কিন্তু আলোচনা আজ আর বেশি দূর অগ্রসর হইল না। এক পক্ষের পাণ্ডিত্য প্রকাশ এবং আর-এক পক্ষের নীরব অসহযোগ দেখিয়া দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি অল্পক্ষণ পরেই অন্য বিষয়ে কথা তুলিয়া আলোচনার সুর ফিরাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মসমাজের কাজ, রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ, এই-সব বিষয়ে কথা হইতে লাগিল। হিন্দুসমাজ মানুষের মনের স্বাধীনতার উপরে যে বিভীষিকা বিস্তার করিয়া আছে, এবং মানুষকে যে মিথ্যাচরণে প্রবৃত্ত করিতেছে, তাহাকে কোনোরকমে এবং কোনো কারণেই সমর্থন করা যে অনুচিত, ইহাই জোর দিয়া বলিলেন। অনেক প্রসিদ্ধ নেতার নাম উঠিল এই সম্পর্কে। রাত ন'টার পর রবীন্দ্রনাথ আলোচনা থামাইয়া দিলেন। অন্যদিনের মতো সেদিনও গান গাহিয়াই সভা ভঙ্গ করিলেন।

বাড়িতে আসিয়া বাবার কাছে শুনিলাম, রবীন্দ্রনাথ একবার জাভা বলি দ্বীপ প্রভৃতি বেড়াইতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ভ্রমণের নেশা প্রায় সর্বক্ষণেই তাঁহাকে পাইয়া বসিয়া থাকিত, আবার তাহারই সঙ্গে সঙ্গে নির্জনে নিরালায় শান্তিতে বাস করিবার ইচ্ছাটাও সমানে বিরাজ করিত। ইহার দুই-একদিন পরে তিনি শান্তিনিকেতনে চলিয়া গেলেন।

তখনকার দিনে তাঁহাকে কাছে পাইলেই কৃতার্থ হইতাম। নিজেদের হৃদয়-মন ভরিয়া উঠিত, আমরা যে কি অমূল্য সম্পদ বিনামূল্যে পাইতেছি তাহা ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিতাম কি না জানি না। আলো, বাতাস, আকাশের নীলিমা না চাহিয়া না জানিয়াই মানুষ যেমন করিয়া পায়, তেমনি করিয়াই তাঁহার স্নেহ, তাঁহার সান্নিধ্য পাইয়াছি। ইহার যে কোনোদিন অবসান হইতে পারে সে কল্পনাও করি নাই। আমরা আছি আর তিনি নাই, ইহা অনুভব করাই আমাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। শেষ নিদারুণ বিচ্ছেদের দিনে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে দাঁড়াইয়া ব্যাকুল চিত্তে ভাবিয়াছি, তিনি এমন করিয়া চলিয়া যাইতে পারেন না, অলৌকিক কিছু ঘটিয়া এখনো তিনি আমাদের মধ্যে থাকিয়া যাইবেন। এই-যে বুদ্ধির অতীত একটা কিছু আমাদের তাঁহার অমরত্বে বিশ্বাস করাইয়াছিল, তাহাই কি সত্য নয়? মৃত্যুতে তিনি শেষ হইতে পারেন না, এ বিশ্বাস, না হইলে কেন মনে আসিল? মৃত্যু তো প্রিয় অনেককেই হরণ করিয়াছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে তো এমন ধারণা এমন দৃঢ় করিয়া মনে আসে নাই?

কথাটা অন্য দিকে চলিয়া আসিল। আমরা তো তাঁহাকে পাইয়া কৃতার্থ ছিলাম, কিন্তু তিনি এই অবিশ্রাম অত্যাচার সহ্য করিতেন কি করিয়া? তাঁহার কি শ্রান্তি আসিত না, বিরক্তি বোধ হইত না? সত্যই হইত না, যদিও আজকাল অনেকের পক্ষে সে কথা বিশ্বাস করা সম্ভব হইবে না। 'বিধাতা তাঁহাকে গড়িয়াছিলেন সকল দিকেই অতিমানবের শক্তি দিয়া, ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য ছিল যেমন বিরাট, দানে অকার্পণ্য ছিল তেমনি বিস্ময়কর। নিজেকে দুই হাতে বিলাইয়া দিয়াই তিনি খুশি ছিলেন।' এই সময়ে বাবার কাছে অ্যান্ড্রুজ সাহেব একখানি চিঠি লেখেন, তাহার শেষের দুইটি লাইন উদ্‌ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছিলেন, 'Gurudev spoke so happily of your

visit here with your daughters. He enjoyed it very much.' তাঁহার খুশি হইবার কারণ কি ঘটিয়াছিল জানি না। স্নানাহার ও কয়েক ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়া ভিন্ন সারাক্ষণ এই অতিথিরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া থাকিত। কথাও বিশেষ কেহ বলিত না, তাঁহাকেই সারাক্ষণ কথা বলাইত। ইহাতেই তাঁহার আনন্দ ছিল। ছোটোদের সঙ্গে ছোটো হইয়া মেশা, ইহা ছিল তাঁহার খেলা। বাক্যে যাহার পরিচয় নাই, সেই ভালোবাসা, সেই ভক্তিও তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টির অগোচর ছিল না, তাই যথার্থ অনুরাগী যাহারা ছিল তাহারা চিরকাল তাঁহার স্নেহ পাইয়া আসিয়াছে। মানুষের প্রতি ভালোবাসা এমনি তাঁহার সুগভীর ছিল যে, কাহাকেও তুচ্ছ করিতে, অবিশ্বাস করিতে, উপেক্ষা করিতে সহজে তিনি পারিতেন না।

এই বৎসর (১৯১৭) কবির জন্মদিন শান্তিনিকেতনেই হয়। অনেকেই এই উপলক্ষে সেইখানে উপস্থিত হইলেও, আমরাও বাদ পড়িলাম না। যতদূর মনে পড়িতেছে, মা বাবা ভাই বোন সকলেই গিয়াছিলাম। ট্রেনের ভিড়ে অনেক দুর্গতি হইয়াছিল, কিন্তু শান্তিনিকেতনে যাওয়ার আনন্দে সে-সব সহজেই উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম। সুকুমারবাবু এবং তাঁহার পত্নীও এই ট্রেনে আমাদের সঙ্গেই গেলেন। রথীবাবু ও প্রতিমা দেবীকেও এই ট্রেনে দেখিলাম। মেয়েদের গাড়িতে ভিড়ের আতিশয্যে বেশিক্ষণ টিঁকিতে পারিলাম না। মাঝের একটা স্টেশনে নামিয়া পড়িয়া ছেলেদের গাড়িতে গিয়া উঠিলাম। এখানেও ভিড় ছিল, তবে গাড়িটা বড়ো, নিঃশ্বাস ফেলা গেল। বর্ধমানে সর্বদাই খাবার কেনা ও খাওয়ার ধুম পড়িত, এবারেও সেটা বাদ গেল না।

বোলপুর স্টেশনে নামিয়া দেখা গেল যে, দ্বিপুবাবুর জুড়িগাড়ি এবং ছোটো একটি মোটর বস্ হাজির আছে। মোটর বস-এ একটা তক্তা বেঞ্চির মতো করিয়া পাতিয়া আমরা পাঁচ-ছয়জন মহিলা তাহাতেই চড়িয়া বসিলাম। পুরুষরাও জন-দুই উঠিলেন। জুড়িগাড়িতে কয়েকজন চড়িলেন, বাকি সকলে হাঁটিয়াই চলিলেন। আমাদের কিন্তু মোটর চড়াটা বিশেষ কাজে লাগিল না। মাইলখানেক গিয়া সেটি বেশ কায়েমিভাবে দাঁড়াইয়া পড়িল। অগত্যা মেয়েরা নামিয়া ঘোড়ার গাড়িতে চড়িলেন। এবারেও সোজা রবীন্দ্রনাথের বাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইলাম এবং তিনিই সর্বাগ্রে বাহির হইয়া আসিলেন। যাহা হউক, এবার অতিথিসৎকার করিবার জন্য আশ্রমের পক্ষ হইতে নেপালবাবু এবং ছেলের দল হাজির ছিলেন, সুতরাং কবিকে আর উদবিগ্ন হইতে হইল না। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ও আরো দু-একজনের সঙ্গে দেখা করিয়া আমরা আগের মতো শান্তিনিকেতন-ভবনে গিয়া উঠিলাম। বিশ্রাম করিতে খানিক সময় কাটিয়া গেল। জিনিসপত্র গোরুর গাড়িতে আসিতেছিল, সেগুলির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। খানিক পরে জিনিস আসিয়া পৌঁছিল। স্নানাদি সারিয়া ও জলযোগ করিয়া বেড়াইতে বাহির হওয়া গেল। সন্তোষবাবু অসুস্থ আছেন শুনিয়া তাঁহাদের বাড়ির দিকে চলিলাম। পথে মীরা দেবী, কমলা দেবী, দিনুবাবু প্রভৃতি অনেকের সঙ্গে দেখা হইল। সেখানে খানিক কথাবার্তার পর উঠিয়া পড়িতে হইল, দেখিলাম আকাশ মেঘে ঢাকিয়া আসিতেছে। রবীন্দ্রনাথের

বাড়ির কাছে আসিয়া দেখিলাম তিনি ও বাবা দোতলার ছাদে বসিয়া আছেন। এই বাড়ির প্রায় সামনাসামনি মাঠের মধ্যে একটি বাঁধানো বেদীর মতো ছিল, সেইখানে বসিয়া সকলে গল্প করিতে লাগিলাম। ট্রেনের কষ্টে মাথাটা অত্যন্ত ধরিয়া উঠিয়াছিল, বেশিক্ষণ বসিতে না পারিয়া একলাই ফিরিয়া গেলাম। গাড়িবারান্দার ছাদের উপর গোটাকয়েক খাটিয়া পাতা ছিল, তাহারই একটায় শুইয়া পড়িয়া একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, তাহাতে যদি মাথাটা ছাড়ে। অল্পক্ষণ পরেই মীরা দেবী ও আমার সঙ্গিনীরা আসিয়া জুটিলেন, এবং শুশ্রূষার ধুম লাগিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ আমাকে অনুপস্থিত দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছেন যে আমি কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি, তাই সকলকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমি লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম। নিজের মাথা লইয়া এত কাণ্ড করার ইচ্ছা আমার একেবারেই ছিল না। বিশ্রাম করিয়া খানিকটা সুস্থও হইয়াছিলাম।

সকলে মিলিয়া আবার বাহির হইবার উপক্রম করিতেছি এমন সময় একটি ছোটো ছেলে আসিয়া খবর দিল যে, 'বাঙাল-সভা' হইবে, আমাদের সেখানে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। সকলেই উৎসুক হইয়া চলিলাম। বাঙাল-সভার নাম ইতিপূর্বেই শুনিয়াছিলাম, তবে কোনো অধিবেশনে কখনো উপস্থিত থাকি নাই। শুনিলাম অন্যান্য অতিথিরাও আসিতেছেন এবং স্বয়ং কবিও উপস্থিত থাকিবেন। পথেই তাঁহাদের সঙ্গে দেখা হইল। রবীন্দ্রনাথ সর্বাগ্রে খোঁজ করিলেন যে আমার মাথা-ধরা কেমন আছে; তাহার পর বলিলেন, 'আচ্ছা, চলো বাঙাল-সভায়, তাদের কথা শুনলে বোধ হয় তোমার মাথা ছেড়ে যেতে পারে।'

খোলা মাঠেই সভা হইতেছিল। মেয়েরা ও মান্যগণ্য অতিথিবর্গ তক্তপোষে বসিলেন, ছেলের দল বসিল মাটিতে শতরঞ্চি বিছাইয়া। সর্বসম্মতিক্রমে সুকুমারবাবু সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করিলেন যে সুকুমারবাবুর পত্নী শ্রীমতী সুপ্রভাকেই সভানেত্রী করা হোক, কারণ আজন্ম কলিকাতায় বাস করিয়া সুকুমারবাবুর বাঙালত্ব খানিকটা লোপ পাইয়াছে। কিন্তু সুপ্রভা রাজি না হওয়াতে সুকুমারবাবুই সভাপতির পদে বাহাল রহিলেন। সভার কার্যতালিকা বেশি বড়ো ছিল না। একটি গল্প, একটি বিজ্ঞাপন ও একটি রিপোর্ট পড়া হইল, সবই বাঙাল ভাষায়। দুইটি গান হইল, একটি বাঙাল ভাষায়, অন্যটি সাধারণ বাংলা ভাষায়। সভার কার্য যথাসম্ভব বাঙাল ভাষাতেই হইতেছিল। অনেকে উঠিয়া ছোটো ছোটো বক্তৃতা দিলেন, বক্তব্য সকলেরই প্রায় এক, 'তাঁহাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই।' বক্তাদিগের ভিতর নাম মনে পড়ে দুইজনের, শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাকেও তাঁহার মামার বাড়ির (মালদহ) ভাষায় বক্তৃতা করিতে হইল। রবীন্দ্রনাথকেও সভাপতি অনুরোধ করিলেন তাঁহার মামার বাড়ির ভাষায় কিছু বলিতে। রবীন্দ্রনাথ অসম্মতি জানাইয়া বলিলেন, খুলনার ভাষার মাত্র দুটি কথা তিনি জানেন, তাহাতে বক্তৃতা দেওয়া চলে না। সে কথা-দুইটি হইতেছে 'কুলির অম্বল ও

মুগির ডাল।' অতঃপর সভাপতি তাঁহার অভিভাষণ দিলেন অতি কষ্টে। বেশ পুরাপুরি বাঙাল ভাষা হইল না।

সভাভঙ্গের পর সকলে শান্তিনিকেতন-ভবনে ফিরিয়া গাড়িবারান্দার ছাদে বসিলাম। অল্পক্ষণ পরে রবীন্দ্রনাথও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন বাঙাল-সভায় গিয়া আমার মাথায় কিছু উপকার হইয়াছে কি না। বীরভূমের ভাষায় খানিক নকল করিয়া শুনাইলেন। মাকে একবার বাঁকুড়ার ভাষা বলিতে অনুরোধ করিলেন, মা সংকোচবশত কিছু বলিলেন না। What is Art?-নামক একটি প্রবন্ধ কিছুদিন আগে লিখিয়াছিলেন, সেইটি আমরা শুনিতে চাহিলাম। তিনি রাজি হইলেন, তবে কার্যগতিকে সেটি শোনা হইল না। অন্য অনেক জিনিস শুনিলাম। শ্রীমতী সুপ্রভা অতি সুগায়িকা, কবি তাঁহাকে নূতন গান শুনাইবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ইতিমধ্যে ছেলের দল রাত্রির খাবার বহন করিয়া এই বাড়িতেই উপস্থিত হইল। মীরা দেবীর কন্যাটি তখন একান্তই ছোটো, তবু অতিথিদের খাওয়ার তদারক করিতে তিনি সঙ্গে আসিলেন। কিন্তু আমরা খাইতে বসিতে বেশ খানিক দেরি করাতে, বলিয়া-কহিয়া তাঁহাকে বাড়ি পাঠাইয়া দেওয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ অতিথিদের খাওয়া না হওয়া পর্যন্ত বসিয়াই রহিলেন। এবার দেখিলাম খাবারের সঙ্গে মাছ দেওয়া হইয়াছে। খাওয়া শেষ হওয়ার পরেও কবি কিছুক্ষণ ছিলেন, বাবার সঙ্গে ইয়োরোপীয় পলিটিক্স্ লইয়া খানিক আলোচনা করিলেন। তাহার পর চলিয়া গেলেন।

ভোরবেলা বালকদের বৈতালিক গানে ঘুম ভাঙিল। 'আমারে দিই তোমার হাতে নূতন করে নূতন প্রাতে' গানটিই তাহারা সকালে বেশির ভাগ গাহিত। উঠিয়া পড়িয়া, মুখ হাত ধুইয়া, লাল মাটির পথ ধরিয়া খানিকটা বেড়াইয়া আসিলাম। বেশি দূর যাইতে ভরসা হইল না ; কারণ, জানিতাম অল্পক্ষণ পরেই সকালের জলযোগের জন্য হাঁকডাক পড়িয়া যাইবে। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম ছেলেরা জলখাবার লইয়া আসিয়া পৌঁছিয়াছে। জলযোগ সারিয়া কমলা দেবীর বাড়ি উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম পুরুষ-অতিথির দল সেইখানেই চা খাইতেছেন। দিনুবাবুর বাড়িটি চায়ের আড্ডার সময় অবারিত-দ্বার ছিল, কখনো সেখানে লোকের অভাব দেখিতাম না ; খোলা বারান্দাতেই এই আড্ডাটি বসিত। চা খাওয়া, গান, গল্প সমানভাবে চলিতে থাকিত।

রবীন্দ্রনাথ বারান্দার নীচে দাঁড়াইয়া অতিথিদের সঙ্গে কথা বলিতেছেন দেখিলাম। প্রতিমা দেবীর এখানে আসিয়াই অসুখ করিয়াছিল, তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। কিছুক্ষণ পরে শুনিলাম কবি শান্তিনিকেতন-ভবনে যাইতেছেন মেয়েদের নূতন গান শুনাইবার জন্য। শুনিয়াই সকলে বাহির হইয়া পড়িলাম। দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ আগেই অগ্রসর হইয়াছেন। প্রাণপণ জোরে হাঁটিয়াও তাঁহার সঙ্গ ধরিতে পারিলাম না। পুরুষ-অতিথিদের ভিতর যে ক'জনের সঙ্গে মেয়েদের আলাপ ছিল, তাঁহারাও সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। দোতলার মাঝের ঘরটিতে কবি বসিয়া সকালের ডাকের চিঠিপত্র নাড়াচাড়া করিতেছেন দেখিলাম। আমাদের দেখিয়া বলিলেন, 'কি গো, এসেছ?

আমি ভাবছিলুম যে তোমরা আসবে না, আর আমি খালাস পাবো এই ব'লে যে আমার কথা আমি রেখেছি।' গান শিখিতে বসা গেল, তবে শ্রোতা এত বাড়িয়া গেল যে শেখা বিশেষ হইল না। অনেকগুলি নূতন গান শোনা হইল বটে। ইহার পরে The Nation বলিয়া একটি নূতন প্রবন্ধ তিনি পড়িয়া শুনাইলেন। পাঠের পর খানিকক্ষণ আলোচনাও চলিল, প্রবন্ধটি এ দেশে প্রকাশ করা চলে কি না সে বিষয়েও কথাও হইল। বৈঠক ভাঙিয়া যাওয়ার পর আমরা স্নানের চেষ্টা দেখিলাম। মানুষ জুটিয়াছিল অনেকগুলি, স্নানের ঘর মাত্র দুইটি, কাজেই অনেকটা দেরি হইল। কলিকাতা হইতে ছুটি উপভোগ করিতে আসিয়াছি, সুতরাং আলস্যচর্চাও চলিতেছিল প্রচুর। অনেকক্ষণ পরে সকলে স্নান সারিয়া মীরা দেবীর ওখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেহলীর পাশে এক সার মাটির ঘর আছে, কয়েকজন অধ্যাপক তখন সেখানে সপরিবারে বাস করিতেন। এই ঘরগুলির সামনের বারান্দায় আমাদের দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হইল। সুকেশী দেবীকে এইখানে এবার প্রথম দেখিলাম। তিনি খুব যত্ন করিয়া আমাদের নিজের হাতে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর আর-একবার প্রতিমা দেবীকে দেখিতে গেলাম। তিনি তখন কিছু সুস্থ হইয়াছেন। পরদিন 'অচলায়তন' অভিনয় হইবে, বাড়িময় তাহার সরঞ্জাম ছড়ানো। কবি একবার আসিয়া দিনুবাবুর সঙ্গে অভিনয় সম্বন্ধে আলাপ করিয়া গেলেন। মাথায় গেরুয়া রঙের পাগড়ি বাঁধিবেন, না খালি মাথায়ই রঙ্গমঞ্চে নামিবেন, এই ছিল তাঁহার জিজ্ঞাস্য। দিনবাবু কিছু মত প্রকাশ করিলেন না। রবীন্দ্রনাথ কমলাদেবীকেও একবার পাগড়ির বিষয় প্রশ্ন করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আমরা সেখান হইতে ফিরিবার মুখে আর-একবার তাহার সাক্ষাৎ পাইলাম। তিনি শ্রীমতী সুপ্রভাকে গান শিখাইবার আশ্বাস দিয়া, তাঁহার খাওয়া হইয়া যাইবার পর তাঁহার ঘরে আসিতে বলিলেন। খাওয়ার পরেই গান শিখাইতে বসিলে তাঁহার কষ্ট হইবে, আমরা এই আশঙ্কা প্রকাশ করাতে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'আমি যা খাই তাতে আমার পেটে বিশেষ জায়গা নেয় না, আমার বিশ্রামের কোনোই দরকার হয় না, তোমাদের যখন খুশি এসো।' এই বলিয়া তিনি নিজের উপরের ঘরে উঠিয়া গেলেন। আমরা স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া লইলাম।

বেলা তিনটার পর গান শিখিবার আশায় চলিলাম। গান অনেকগুলি শেখা ও শোনা হইল। গান শেখানোর ফাঁকে ফাঁকে রবীন্দ্রনাথ একজন অধ্যাপককে ডাকিয়া পরের দিনের অভিনয় সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলেন এবং কয়েকটি প্রয়োজনীয় উপদেশ দিলেন। একজন অন্তরীণ ছাত্রের মা তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তিনি আমার সামনে বেরোতে আপত্তি করবেন না?' আমরা বিস্মিত হইয়া ভাবিলাম, তাঁহার সম্মুখে বাহির হইতে পারিলেই তো মানুষ বর্তিয়া যায়, আপত্তি আবার করিবে কিসের জন্য? গান শেখা শেষ করিয়া আমরা তো বাড়ি ফিরিলাম, এবং বিকালে বেড়াইতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। এমন সময় সন্তোষবাবু আসিয়া খবর দিলেন যে 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র ইংরেজি অনুবাদ পড়া হইবে, গুরুদেব এইখানে

আসিতেছেন। তখনকার আশ্রমে বড়ো ঘর বলিতে শান্তিনিকেতন-ভবনের এই দোতলা ঘরটিই ছিল, সুতরাং সভা করিয়া বসিতে হইলে এইটিতেই বসিতে হইত। আমরা তাড়াতাড়ি নিজেদের বিছানাপত্র সরাইয়া ঘরটি পরিষ্কার করিলাম, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ আসিয়া প্রবেশ করিলেন। আরও দু-চারজনের উপস্থিতির জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় তিনটি অপরিচিতা মহিলা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একজন অবগুণ্ঠিতা প্রৌঢ়া চৌকাঠের কাছে নতজানু হইয়া কবিকে প্রণাম করিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইয়া গেলেন। শুনিলাম ঐ প্রৌঢ়া মহিলাই সেই অন্তরীণ ছাত্রটির মা। ইহার পর পড়া আরম্ভ হইল। মূল বাংলা নাটিকাটির চেয়ে ইংরেজি তর্জমাটি অনেকের বেশি ভালো লাগিল। এমন সময় খবর পাওয়া গেল যে আরো একদল মহিলা অতিথি আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সভা ভঙ্গ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'দেখ, তোমাদের উপর এঁদের সব ভার রইল, তোমরা এঁদের খাইয়ে-দাইয়ে বেণুকুঞ্জে নিয়ে আসবে, সেখানে "বিসর্জন" পড়া হবে।' বলদের বসটিও আসিয়া পড়িয়াছে দেখা গেল। রবীন্দ্রনাথ ফিরিয়া চলিয়া গেলেন।

অতিথি নামিলেন অনেকগুলি। সকলের এখানে স্থান-সংকুলান না হওয়াতে কয়েকজন নিচুবাংলায় চলিয়া গেলেন। কবির আদেশ-মতো সকলকে জলযোগ ইত্যাদি করাইয়া সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া পড়া গেল। ইঁহাদের ভিতর অনেকেই এই প্রথম শান্তিনিকেতনে আসিয়াছিলেন, কাজেই চারি দিক ঘুরিয়া দেখিতে দেখিতে দেরি হইয়া গেল। কিন্তু বিসর্জন পাছে শোনা না হয় সে ভয়ও ছিল, সুতরাং অনেক তাড়া লাগাইয়া কোনোমতে সকলকে টানিয়া লইয়া পাঠের জায়গায় উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম কবি আসিয়া বসিয়া আছেন এবং শ্রোতাও অনেক জুটিয়াছেন। কলিকাতা হইতে এবার অতিথি-সমাগম মন্দ হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ বিসর্জনের ইংরেজি অনুবাদটি পাঠ করিলেন। পড়া শেষ হইবার পর সামনে যাঁহারা বসিয়াছিলেন তাঁহাদের দিকে তাকাইয়া সহাস্যমুখে প্রশ্ন করিলেন, 'কি হে, কেমন লাগল?' কেহ কিছু উত্তর দিবার আগে বাবার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'এরা সব শুনবার আগেই বললে 'যেমনই হোক, আমরা জোর করেই বলব যে বাংলার চেয়ে খারাপ হয়েছে।' অতিথিদের ভিতর অনেকেই তখন বিনীতভাবে নিজেদের ভুল স্বীকার করিলেন। পড়া শেষ হইবার পর সকলে বাহির হইয়া আবার একটু বেড়ানো গেল।

শুনিলাম সস্ত্রীক গুরুসদয় দত্ত মহাশয় তখনি আসিবেন। কমলা দেবীরা সকলেই তাঁহাদের জন্য সেই বাঁধানো চালাতে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন দেখিলাম। কবি তাঁহার ঘরের সামনে খোলা ছাদে বসিয়া। আমরা আশ্রমের সামনের লাল মাটির পথটি ধরিয়া অনেকদূর বেড়াইয়া আসিলাম, নূতন শেখা গানগুলিরও কিছু চর্চা হইল।

রাত্রে একটি সংস্কৃত অভিনয় হইবে শুনিয়াছিলাম। সুতরাং খুব বেশি দূর না গিয়া অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিলাম। গুরুসদয় দত্ত ও সরোজনলিনী আসিয়াছেন দেখিলাম।

অভিনয় মুক্ত আকাশের নীচে হইবে বলিয়া প্রথমে শুনিয়াছিলাম। কিন্তু পরে আকাশে সামান্য একটু মেঘসঞ্চার দেখিয়া, নাট্যঘরের ভিতরেই অভিনয়ের আয়োজন হইল। 'বেণীসংহার' নাটকের তৃতীয় অঙ্ক অভিনীত হইল। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় প্রথমে নাটকের আখ্যানবস্তু বাংলায় বলিয়া গেলেন। ছাত্রেরা, বিশেষ করিয়া শিশুবিভাগের দল 'সাধু', 'সাধু' করিয়া প্রচুর সাধুবাদ দিল। সংগীতাচার্য ভীমরাও শাস্ত্রী মহাশয় সূত্রধর-রূপে দেখা দিলেন। তিনি সংস্কৃত গান গাহিয়া, রঙ্গমঞ্চে ফুল ছড়াইয়া চলিয়া গেলেন। তাহার পর আসল অভিনয়টুকু হইল। ইহাতে বেশি সময় লইল না দেখিয়া সভাস্থ সকলের অনুরোধে, সুকুমারবাবু তাঁহার 'শব্দকল্পদ্রুম'-নামক কৌতুকনাট্যটি পাঠ করিলেন। ইহার গানগুলিও হইল বটে, তবে তাঁহার দলের লোকেরা এখানে কিঞ্চিৎ সলজ্জভাবে গান গাহিলেন।

ইহার পর ফিরিয়া গিয়া রাত্রির খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ করা গেল। আমাদের আড্ডাটিতে সেদিন বেজায় ভিড়, তাহা রবীন্দ্রনাথও দেখিয়াছিলেন। খাওয়ার পর আমরা যখন নিদ্রার চেষ্টায় ফিরিয়া চলিয়াছি তখন আমাদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'ভিড় বেশ হয়েছে, দেখো যেন ঝগড়া কোরো না।' রাত্রিটা বারান্দায় শুইয়া ভালোভাবেই কাটিয়া গেল, কাহারো সঙ্গে ঝগড়া করিবার প্রয়োজন হইল না।

ভোরবেলা বৈতালিক গানে ঘুম ভাঙিল। আজ গান শুনিলাম, 'আমার মুখের কথা তোমার নাম দিয়ে দাও ধুয়ে।' অন্য-সকলে উঠিবার আগে, আমরা কয়জন উঠিয়া পড়িয়া হাত-মুখ ধুইয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। রবীন্দ্রনাথের বাড়ির সামনে আসিয়া দেখিলাম, তখনো তিনি ছাদে উপাসনায় বসিয়া আছেন। খানিক বেড়াইবার পর ফিরিয়া আসিলাম যখন তখন আর তাঁহাকে সেখানে দেখিতে পাইলাম না। আজ তাঁহার জন্মদিন, আম্রকুঞ্জে ছেলের দল তখন ফুল পাতা আলপনা দিয়া সভাস্থল সাজাইতেছে। ইহার ভিতর আবার আমাদের জলযোগপর্বও সারিতে হইল।

উৎসবের সময় হইতেই দুইটি ঘণ্টা একসঙ্গে বাজিয়া সকলকে আহ্বান করিতে লাগিল। দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা গিয়া আম্রকুঞ্জে সমবেত হইতে লাগিলেন। কলিকাতা হইতে রাত্রির ট্রেনের আরো অতিথি আসিয়াছেন দেখিলাম। কিছুক্ষণ পরে রবীন্দ্রনাথ আসিয়া সভায় প্রবেশ করিলেন। পদ্মপত্র ও পদ্মফুলে সজ্জিত একটি মাটির বেদীর উপর তাঁহার আসন প্রস্তুত হইয়াছিল। আশ্রমের কয়েকটি ছেলে দিনেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে একটি বেদগান করিল। ক্ষিতিমোহনবাবু উপনিষদের মন্ত্র পাঠ ও নেপালবাবু তাহার ব্যাখ্যা করিলেন। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং ভীমরাও শাস্ত্রী মিলিয়া তাহার পর সংবর্ধনাসূচক কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলেন। তিনটি বালক কবিকে চন্দন মাল্য ও দূর্বাদলের সূত্র উপহার দিল। ইহার পর রবীন্দ্রনাথ কিছু বলিলেন। পরে গান আর হইল না। কবি উঠিয়া সভা ত্যাগ করিলেন, কিন্তু প্রণাম করিতে উৎসুক অতিথি ও ছাত্রদলের হাত ছাড়াইয়া বেশি দূর যাইতে পারিলেন না। তাঁহার ঘরের সিঁড়ির নীচে পর্যন্ত সকলে আসিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন।

ইহারই অল্প পরে মেয়েদের তিনি গান শিখাইতে ডাকিতেছেন শুনিয়া তাঁহার দোতলার ঘরে গিয়া দেখিলাম, ইহারই মধ্যে সভা বসিয়া গিয়াছে, গানও গোটাকতক হইয়া গিয়াছে বোধ হয়। ছোটো ঘরটিতে ক্রমেই লোক বাড়িতে লাগিল, শেষে যাঁহারা আসিলেন তাঁহারা ঘরে স্থান না পাইয়া বাহিরে সিঁড়িতেই বসিয়া পড়িলেন। গান বেশ অনেকগুলিই হইল।

রবীন্দ্রনাথ আর দুই-একদিন পরেই দার্জিলিং যাইবেন শুনিতেছিলাম। গানের মধ্যে ক্ষিতিমোহনবাবু আসিলেন বিদায় লইতে, তিনি সেই দিনই কোথায় যাইতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি ছুটির মধ্যে দার্জিলিং যাইবেন কি না। ক্ষিতিমোহনবাবু বলিলেন, 'কাছাকাছি যেতে পারি, একবার কালিম্পং যাব বোধ হয়।' রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'তা হলে একবার দার্জিলিঙেও আসুন-না?' ক্ষিতিমোহনবাবু বলিলেন, 'সেখানে গিয়ে কি আর ব্রজের রাখালদের মথুরার রাজার সঙ্গে দেখা হতে পারবে?' কবি হাসিয়া বলিলেন, 'ঠিক হবে। আপনি গিয়ে পড়লেই হবে।' ক্ষিতিমোহনবাবু তখনি চলিয়া গেলেন।

উপস্থিত মহিলাদের ভিতর একজন 'ধীরে বন্ধু গো, ধীরে ধীরে,' গানটি শুনিতে চাহিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখনি সেটি গাহিয়া শুনাইলেন।

বেলা হইয়া যাইতেছে দেখিয়া তখনকার মতো সভা ভঙ্গ হইল। ফিরিয়া গিয়া স্নানাদি সারিতে অনেক দেরি হইয়া গেল। তাহার পর দুপুরের খাওয়া খাইতে গিয়া, সেইখানেই দুপুর কাটাইয়া আসিলাম। অতিথিদের ভিতর একটি পাঁচ-ছয় বৎসরের খুকি ছিল, সে পাঁচ-ছয় মিনিট পরে পরে গিয়া উঁকি মারিয়া রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়া আসিতে লাগিল। প্রথম-পরিচয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বেশি আদর করেন নাই বলিয়া তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে অনেকখানি অতৃপ্তির সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া জানা গেল। এ খবরটা কবির কানেও গিয়াছিল এবং তিনি প্রচুর আদর করিয়া খুকিটির দুঃখও ঘুচাইয়া দিয়াছিলেন।

রোদ পড়িবার পর সকলে বাহির হইয়া পড়িলাম। যাঁহারা এখানে নূতন আসিয়াছেন তাঁহারা সারা আশ্রম মাঠ খোয়াই বন সব ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন, আমরা একটু এদিক-ওদিক বেড়াইয়া ভুবনডাঙায় সেই বাঁধের ধারে গিয়া বসিয়া রহিলাম। বাঁধটির চার পাশেই তখন তালগাছের সারি, দেখিতে সুন্দর লাগিত। এখন অনেকটাই ন্যাড়া হইয়া গিয়াছে। ফিরিয়া আসিয়া, একেবারে রাত্রির খাওয়া খাইয়া, অচলায়তন দেখিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। এক পশলা বৃষ্টিও হইয়া গেল ইহার মধ্যে।

প্রথমবার অচলায়তন যেমন দেখিয়াছিলাম, এবার ঠিক সেরকম বোধ হইল না। অদীনপুণ্য এবং পঞ্চকের ভূমিকা আগেকার মতো রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথই গ্রহণ করিয়াছিলেন। দাদাঠাকুর সাজিয়াছিলেন জগদানন্দ রায় মহাশয়। রবীন্দ্রনাথ আগের বার যেরকম পোশাক করিয়াছিলেন, এবার আর তাহা করেন নাই, শুধু গেরুয়া রঙের আলখাল্লা পরিয়াই রঙ্গমঞ্চে আসিলেন। দর্শকদের গান এবার তেমন জমিতেছে না দেখিয়া তিনি পিছন হইতে 'ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি', গানটিতে যোগ দিলেন। দর্শকরা

সচকিত্ হইয়া উঠিলেন। হঠাৎ যেন অদৃশ্য স্বর্ণবীণার ঝংকারে অভিনয়ক্ষেত্র পূর্ণ হইয়া গেল। নূতন আগন্তুকরা বিস্মিতভাবে এদিকে-ওদিকে তাকাইতে লাগিলেন। অভিনয় শেষ হইল 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গানটি হইয়া।

নাট্যঘর হইতে বাহির হইয়া দেখা গেল যে মেঘ কাটিয়া গিয়াছে, উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় চারি দিক প্লাবিত। খাওয়া-দাওয়া অনেকক্ষণ চুকিয়া গিয়াছে, তখনি শুইতে যাইবার ইচ্ছা কাহারো ছিল না। মস্ত এক দল বাঁধিয়া সকলে বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলাম। দুই-একজন রাত্রের ট্রেনে ফিরিবার জন্য স্টেশনের দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের টানিয়া ফিরাইয়া আনা হইল। সুরুলের দিকে মাঠ ধরিয়া অনেকদূর চলিয়া গেলাম। মাঝে একবার মাঠেই বসিয়া গানের আসর জমানো হইল। যে যাহা নূতন শিখিয়াছিলেন তাহার পরীক্ষা দিলেন। আবার একবার গভীর কালো মেঘে আকাশের এক দিক ঢাকিয়া গেল, আর-এক দিকে তখনো উজ্জ্বল চাঁদের আলো। সে এক অপূর্ব শোভা। যাহা হউক, বৃষ্টিতে ভিজিবার ইচ্ছা বিশেষ কাহারো ছিল না। সুতরাং যাঁহারা এদিক-ওদিক ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন, হাঁক ডাক করিয়া তাঁহাদের সকলকে একত্র করা গেল। বৃষ্টি নামিবার আগেই তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া কোনোমতে আশ্রমের গণ্ডির ভিতর আসিয়া পৌঁছিলাম। প্রায় চৌকাঠ মাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি নামিয়া আসিল। রাত অনেক হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং আর দেরি না করিয়া বিছানা পাতিয়া নিদ্রা দেওয়া গেল। মহিলা-অতিথিদের মধ্যে অনেকেই প্রস্থান করিয়াছেন দেখিলাম, সুতরাং আজ আর জায়গার টানাটানি পড়িল না।

২৬ বৈশাখ নীরবেই দেখা দিল। বিদ্যালয় ছুটি হইয়া গিয়াছে, অনেক ছেলে রাত্রের ট্রেনে চলিয়াও গিয়াছে, কাজেই আজ আর বৈতালিক গান হইল না। আমরা নীচে নামিয়া দেখিলাম, চারি দিক আগে নিস্তব্ধ। নিজেদেরও আর কয়েক ঘণ্টা পরেই বিদায় লইতে হইবে ভাবিয়া কেমন যেন মনটা বিষাদভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

সেদিন বুধবার, আশ্রমের সাপ্তাহিক উপাসনার দিন। আজ আর গান হইল না। রবীন্দ্রনাথ মন্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা করিলেন এবং অবশিষ্ট ছাত্রদের কিছু উপদেশ দিলেন। ন'টার সময় আর-একটি ট্রেন, কলিকাতা-যাত্রীদের এক দল সেই ট্রেন ধরিতে প্রস্থান করিলেন। আমাদের তখনো ঘণ্টা-কয়েক দেরি ছিল, আমরা গিয়া মীরা দেবীর বারান্দায় বসিয়া গল্প করিতে লাগিলাম। রবীন্দ্রনাথ একবার নামিয়া আসিয়া বলিলেন, 'এই-সব যাওয়ার হাঙ্গাম চুকে গেলে শান্তিনিকেতনে একটা বৈঠক হবে তোমার বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে।'

বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ ছাত্রদের ও অধ্যাপকদের যাত্রা দেখা গেল, তাহার পর ভগ্নাবশিষ্ট দলবল লইয়া শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গেলাম। রবীন্দ্রনাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন অল্পক্ষণ পরেই। 'রাজা ও রানী'র ইংরেজি তর্জমাটি পড়িয়া শুনাইলেন। তাহার পর খানিকক্ষণ এই নাটকটি সম্বন্ধে আলোচনা হইল। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, স্ত্রী-পুরুষে সম্বন্ধটা মানুষের অত্যাচারে স্বাভাবিক থাকিতে পারে নাই, তাহা অত্যুক্তির দ্বারা ভারাক্রান্ত

ও বিকৃত হইয়াছে অনেক স্থলেই। প্রেম যখনি কেবলমাত্র কামনা হইয়া দাঁড়ায় তখন তাহার ভিতর কল্যাণ থাকে না। Age of chivalry-কে তিনি এই-সব আপদের জন্য অনেকাংশে দায়ী করিলেন।

কে একজন Cult of Nationalism প্রবন্ধটি শুনিতে চাহিলেন, কিন্তু সেটি পড়িতে অনেক সময় লাগিবে বলিয়া তখন তিনি সেটি পড়িলেন না। একটু পরেই সভা ভঙ্গ হইয়া গেল। কবি চলিয়া গেলেন। একবার শুনিলাম তিনি আমাদের সঙ্গেই কলিকাতা যাইবেন, আবার শুনিলাম পরেরদিন যাইবেন।

স্নানাদি সারিয়া খাইতে গেলাম নির্দিষ্ট বাড়িটিতে। আজ খাওয়া হইতে একটু দেরি হইল। ভাঙা হাটে কাহারো কোনো কাজে উৎসাহ নাই। যে ক'টি ছাত্র অবশিষ্ট ছিল তাহাদের খাইতে আরো দেরি হইল, কারণ তাহারা যে আছে তাহা বিশেষ কাহারো মনে ছিল না এবং নেপালবাবু তাহাদের চাল বাহির করিয়া দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

মুলুকে লইয়া আমাদের শান্তিনিকেতনে ঘর বাঁধিয়া থাকার একটা প্রস্তাব কিছুকাল হইতে চলিতেছিল। সে রুগ্‌ণ ছিল বলিয়া তাহাকে বোর্ডিঙে রাখার ইচ্ছা কাহারো ছিল না, অথচ এইখানে পড়াইবার ইচ্ছা সকলেরই ছিল। থাকা যে হইবে ইহা এইবার পাকাপাকি স্থির হইল। তখন যে বাড়িটিকে পিয়ার্সন সাহেবের বাংলা বলা হইত, তাহারই অল্প দূরে একটি মাটির বাড়ি ছিল। কে একজন উহা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন স্ত্রী-কন্যা লইয়া বাস করিবার জন্য, কিন্তু কি একটা দুর্ঘটনাবশত তাঁহারা বাস উঠাইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। ঐ বাড়িটিই আমাদের জন্য প্রস্তুত করা হইতেছিল। এখানে থাকিবার প্রস্তাবে যে আনন্দের প্রবাহ মনের মধ্যে খেলিয়া গিয়াছিল, তাহা এতকাল পরেও অনুভব করিতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ একবার নীচে আসিয়া আমাকে বলিলেন, 'শুনলুম তোমরা নাকি আমার প্রতিবেশিনী হবে, তা হলে তোমাদের অনেক কাজে লাগাতে পারব।' আমি বলিলাম, 'আমরা আর কি কাজে লাগব?' তিনি বলিলেন, 'হ্যাঁ ঢের কাজ আছে। দেখো তখন।' বলিয়া উপরে চলিয়া গেলেন। খানিক পরে উপরে উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গেলাম। জিনিসপত্র যাহার যা গুছাইবার ছিল গুছানো হইয়া গেল। কমলা দেবী আসিয়া খানিকক্ষণ গল্প করিয়া গেলেন। তাহার পর যানবাহন সব আসিয়া জুটিল। আর-এক পালা সকলের কাছে বিদায় গ্রহণ করিয়া ও রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করিয়া আমরা যাত্রা করিলাম। গোরুর গাড়িগুলি পথে যত রকম তামাশা দেখাইতে পারে, কিছুর ত্রুটি রাখিল না। সুকুমারব্যবু সঙ্গে থাকাতে সারাপথ হাসির খোরাক জুটিল বিস্তর। এবার সৌভাগ্যক্রমে ট্রেনে ভিড় ছিল না। একটা কামরা একদম খালি পাওয়া গেল, কাজেই বেশ আরামেই কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিলাম।

রবীন্দ্রনাথ গ্রীষ্মকালটা দার্জিলিঙে কাটাইবেন এ কথা শান্তিনিকেতনে থাকিতেই শুনিয়া আসিয়াছিলাম। আমরা ফিরিবার পরদিনই তিনি সপরিবারে কলিকাতায় আসিলেন। তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূ আগে চলিয়াও গেলেন। পরে হঠাৎ একদিন শুনিলাম রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিং যাইবেন না, তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া চলিয়াছেন।

মাঝে একদিন আমাদের বাড়ি বেড়াইতে আসিলেন। উপরে ছিলাম নামিয়া আসিয়া দেখিলাম, তিনি বাবার ঘরে বসিয়া কথা বলিতেছেন। মাটির বাড়িটি তখনো একটু মেরামত হইতেছিল, তাই রবীন্দ্রনাথ মাকে নিমন্ত্রণ করিলেন ছুটির মধ্যে কিছুদিন গিয়া অধ্যাপকদের কাহারো বাড়ি অধিকার করিয়া থাকিয়া আসিতে। ছুটিতে তখন প্রায় সব ক'টি ঘরই খালি। মা যাইতে আনন্দের সঙ্গেই রাজি হইলেন।

পাশের বাড়িতে গান হইতেছিল। রবীন্দ্রনাথ একবার সেদিকে মন দিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমাদের পাশের বাড়িতে সংগীতচর্চা হচ্ছে? আমারই যেন কি একটা হচ্ছে, ঠিক ধরতে পারছি নে।'

তাঁহার উপন্যাসগুলিতে কি কি chronological ভুল আছে সে বিষয়ে এক ব্যক্তি একটি গবেষণাপূর্ণ চিঠি পাঠাইয়াছেন বলিলেন। তখন আমরা সবে গল্প লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। শান্তিনিকেতনে গেলে গল্প লেখার কিরকম সুবিধা হইবে সে বিষয়ে একটা লোভনীয় চিত্র আঁকিয়া দিলেন। মা বলিলেন, 'শুধু আপনি ওখানে থাকলেই ওদের খুব আনন্দ হবে।' রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ, গান শুনবার সুবিধে হবে বটে।'

বাবার সঙ্গে আরো খানিকক্ষণ European politics and war বিষয়ে আলোচনা করিয়া তিনি যাইবার জন্য উঠিলেন। আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, তোমাদের সঙ্গে তো আবার বোলপুরেই দেখা হবে।'

মে মাসের শেষের দিকে আবার কয়েকদিনের জন্য শান্তিনিকেতন ঘুরিয়া আসিলাম। বিকালের গাড়িতে যাত্রা করা গেল। পথে দারুণ বৃষ্টি, কামরার ভিতরে পর্যন্ত জল পড়িতে লাগিল। গন্তব্যস্থানে পৌঁছিলাম রাত দশটার পর। নেপালবাবু আসিয়াছিলেন আমাদের লইতে, বসখানিও হাজির ছিল, সুতরাং ভালোয় ভালোয়ই আসিয়া পৌঁছিলাম। তখনকার মতো শান্তিনিকেতন অতিথিশালাতেই আশ্রয় গ্রহণ করা গেল, পরদিন উঠিয়া দরকার বোধ হইলে অন্য ব্যবস্থা হইবে ইহাই স্থির রহিল। নেপালবাবু বলিলেন, 'কবি বোধ হয় তিন-চারদিনের মধ্যে তিন্‌ধরিয়া যাচ্ছেন, তাঁর গরমে বড়ো কষ্ট হচ্ছে।' শুনিয়া ভাবিলাম তাহা হইলে আর আমাদের আসার কি প্রয়োজন ছিল?

সঙ্গেই খাবার ছিল, খাইয়া-দাইয়া শুইয়া পড়া গেল। সকালে উঠিয়া আশ্রমের এক নূতন রূপ দেখিলাম— নির্জন নিস্তব্ধ, কেহ কোথাও যেন নাই। তবু সবই যেন পরিপূর্ণ, শূন্যতার কোনো অনুভূতি মনের মধ্যে আসিল না।

মুখ-হাত ধুইয়া, কাপড়-চোপড় পরিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। রবীন্দ্রনাথের বাড়ির দিকেই চলিলাম। পথে নেপালবাবু ও শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা মা ও বাবার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছিলেন। মা ও বাবা তখনো উঠেন নাই শুনিয়া তাঁহারা সেইখানেই দাঁড়াইয়া আমাদের সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলেন। কমলা দেবীকেও দূর হইতে তাঁহার বারান্দায় দেখিতে পাইলাম।

দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ তাঁহারা ছাদের উপর তখনো উপাসনার আসনে বসিয়া আছেন। কমলা দেবীর বাড়িতে গিয়া বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে কবি নামিয়া আসিলেন। আমরা

গিয়া প্রণাম করাতে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া চা খাইবার জন্য নীচের ছোটো খাইবার ঘরটিতে প্রবেশ করিলেন। আমরা সারা সকাল ঘুরিয়া বেড়াইয়াই কাটাইয়া দিলাম। অন্যান্যবার গল্প করিবার মানুষ পাওয়া যাইত প্রচুর, এবার ছুটির সময় বিশেষ কেহ এখানে ছিলেন না। ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া অবশেষে ফিরিয়া আসিলাম।

মা স্থির করিলেন, অতিথিশালায় না থাকিয়া নেপালবাবুর বাড়িতে গিয়া থাকিবেন। নেপালবাবুর পরিবারবর্গ তখন দেশে, তিনি নিজে ছাত্রদের সঙ্গেই বাস করিতেছিলেন, সুতরাং আমরা গিয়া তাঁহার ঘরদুয়ার দখল করিয়া বসিলাম। রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে ঐ কয়দিন আমরা তাঁহার অতিথিরূপে বাস করি, তবে মা নিজে যা ব্যবস্থা করিলেন তাহাতে তিনি কিছু বাধা দিলেন না। তবে আমাদের আলাদা সংসার করাটা নামে মাত্রই হইল। তিনবেলা তাঁহাদের কাহারো না কাহারো বাড়ি হইতে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল, চাকর ও বামুনও তাঁহারাই দিলেন। অধ্যাপকদের কুটিরগুলিতে প্রবেশ করিতে হইত একটি মধুমালতীলতার গেট দিয়া, উঠানে এবং বারান্দায় সর্বদাই দু-একখানি তক্তপোষ পাতা থাকিত। বাড়িটির প্রধান আকর্ষণ ছিল এই যে সেটি রবীন্দ্রনাথের ঘরের ঠিক পাশেই। মা সংসার পাতিতে লাগিলেন, আমরা বেড়াইয়া ঘুমাইয়া এবং বারান্দায় বসিয়া আলস্যচর্চা করিয়া বিকাল পর্যন্ত কাটাইয়া দিলাম। জ্যৈষ্ঠ মাসের গরম অত্যন্ত কড়া রকমই ছিল, কিন্তু তখনকার দিনে গরমে কষ্ট হইত না।

বিকাল হইয়া আসিলে সেই ফুলগাছের বেড়ার ওপাশে তক্তপোষের উপর গিয়া বসিলাম। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী ও কমলা দেবী আসিলেন। রবীন্দ্রনাথের পুরানো চাকর উমাচরণের কিছুদিন আগে মৃত্যু হইয়াছিল। এ লোকটিকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অনেকবার দেখিয়াছি। এখন আর ভালো চাকর কিছুতেই পাওয়া যাইতেছে না, বড়োমার কাছে শুনিলাম। সেক্রেটারি রাখার চেষ্টাও হইয়াছে শুনিলাম, তাহাতেও সুবিধা হয় নাই। ভদ্রলোকেরা কবির স্নেহে এমনি আত্মহারা হইয়া যান যে নিজেদের অধিকারের সীমা কোথায় তাহা তাঁহাদের মনে থাকে না। সাধারণ চাকরগুলি হয় অধিকাংশই বোকা, এবং বোকামি রবীন্দ্রনাথ সহ্য করিতে পারেন না।

কবিকে সেই সকালের পর আর দেখি নাই, শুনিয়াছিলাম তিনি 'সবুজ পত্রে'র জন্য গল্প লিখিতে বসিয়াছেন, এবং দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সুরুলে মীরা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন। এখন পর্যন্ত ফিরিলেন না দেখিয়া সকলে আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে মাঝপথে হয়তো মোটরটার কল বিগড়াইয়াছে। এই কথা উঠিতে-না-উঠিতেই দেখা গেল মাঠের মধ্যের রাস্তা দিয়া মোটরখানি ধীর গতিতে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, দুই ধারে সার দিয়া চলিয়াছে সাঁওতাল শিশুর দল। মোটরকার তখনো বোলপুরে একটা দ্রষ্টব্য জিনিস ছিল।

গাড়ি শালবীথিকার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। রবীন্দ্রনাথ নামিয়া পড়িয়া নিজের ঘরের দিকে না আসিয়া দ্রুতপদে শান্তিনিকেতনের দিকে চলিয়া গেলেন। খানিকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের কাছে উপস্থিত হইলেন। কমলা দেবী তখনো সেখানে বসিয়া। আমার

দিকে চাহিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'কি, কমলের সঙ্গে ভাব করছ?' পাশের একটি তক্তপোষের উপর বসিয়া পড়িয়া হঠাৎ বলিলেন, 'আজ দার্জিলিং থেকে আমার এক বকুনি এসেছে।' বকুনি যে কে দিয়াছেন ঠিক বুঝিলাম না, একটা আন্দাজ অবশ্য করিলাম। একখানি চিঠি বাহির করিয়া তিনি পড়িয়া শুনাইলেন, 'আপনার ও ব্রজেন্দ্র শীল মহাশয়ের ভরসাতেই Prof. Geddes এ কাজে হাত দিয়েছিলেন, যদি জানতেন যে আপনারা এমনি করে desert করবেন তা হলে অমন কাজে হাতই দিতেন না।' চিঠিখানি মুড়িয়া রাখিয়া বলিলেন, 'তাই ভাবছি এত বকুনি খাওয়ার চেয়ে যাওয়া ভালো। যাওয়াই ঠিক করলুম।' তাঁহার যাত্রার সংবাদে সকলেই খানিকটা মুষড়াইয়া গেলাম।

তিনি নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন, আমরাও সভাভঙ্গ করিয়া ভিতরে ঢুকিলাম জলযোগ করিতে ও বৈকালিক বেশভূষা করিতে। শ্রীমান অশোক এখনো বারান্দায়ই বসিয়াছিলেন, তিনি কয়েক মিনিট পরে ভিতরের দিকে মুখ বাড়াইয়া খবর দিলেন, 'রবিবাবু আসছেন।' কবি অন্য কোথাও যাইতেছিলেন বোধ হয়, তবু আমাদের বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়া ফুলের গেটের ভিতর দিয়া ঢুকিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শান্তিনিকেতনের গরমের সঙ্গে কৈশোরে গাজীপুরে যে গরম উপভোগ করিয়াছিলেন তাহার তুলনা করিয়া কয়েক মিনিট গল্প করিলেন, তাহার পরে চলিয়া গেলেন।

বিকালবেলা বেড়াইতে বাহির হইলাম। পথে আর-একবার কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। নিজের ঘরের সামনের ছোটো ছাদটিকে দেখাইয়া বলিলেন, 'সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত এখান থেকে আশ্চর্য সুন্দর দেখায়। আমার এই ছাতটি যদি না থাকত তা হলে আমি হয়তো আরো কিছুকাল আমেরিকায় থেকে আসতে পারতুম। আমার ছাতটাকে তোমরা মাঝে মাঝে কাজে লাগিয়ো।' জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি কবে যাবেন?' বলিলেন, 'কালই যাব ভাবছি। তোমাদের অনুমতি দিয়ে গেলুম, আমার ছাত ঘর বই, সব ব্যবহার করতে পার।'

'প্রবাসী'তে জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁহার একটি কবিতা বাহির হইয়াছিল, পূর্ববঙ্গের এক সম্পাদক তাহার সমালোচনা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেটি পড়িয়া হাসিয়া বলিলেন, 'আর আমি তোমাদের কাগজে কবিতা লিখব না, বিক্রমপুরের বাঙাল সুদ্ধ বলে কি না আমি "ঘ্যান্ ঘ্যান্ প্যান্ প্যান করি"।' কথা বলিতে বলিতে তাঁহারই সঙ্গে খানিক দূর বেড়ানো হইয়া গেল। বাবা এবং নেপালবাবুও এই সময় আসিয়া জুটিলেন। নেপালবাবু আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা বেড়াইতে যাইতে চাই কি না। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'হ্যাঁ, শীগ্‌গির ঠিক ক'রে ফেলো— বেড়াতে যাবে, না আমার ছাতে যাবে।' ঠিক করিতে অবশ্য আমাদের বেশি সময় লাগিল না, তিনি উপরে উঠিয়া যাইবার কয়েক মিনিট পরেই আমরাও সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাদের দেখিয়া তিনি চাকরকে আদেশ করিলেন একটা মাদুর বা শতরঞ্চি আনিয়া পাতিয়া দিতে। আমি বলিলাম, 'থাক্-না, দরকার নেই।' হাসিয়া বলিলেন, 'আছে যখন, তখন শুধু শুধু অনাদর করব কেন?'

তাঁহার পায়ের কাছের মাটির আসন আমাদের কাছে সম্রাটের সিংহাসনের চেয়েও মূল্যবান ছিল, অবশ্য তিনি যে আদর করিয়া বসিবার আসন দিতে বলিলেন তাহারো মূল্য কিছু কম ছিল না।

ক্রমে ক্রমে অনেকেই ছাদে আসিয়া বসিলেন। বাংলাদেশের জমিদারদের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক অভিযোগ করিলেন। জমিদারিতে নিজে যখন বাস করিতেন, কতরকম অদ্ভুত লোকের সঙ্গে দেখা হইত, তাহার গল্পও অনেক হইল। ব্রাহ্ম মেয়েদের অভাব-অভিযোগের প্রসঙ্গও একবার উঠিল। অনেক রাত্রে ছাদ হইতে নামিয়া আসিলাম।

পরদিন বুধবার। আশ্রমের মন্দিরে সর্বদাই বুধবারে উপাসনা হইত ; রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকিলে তিনিই প্রায় আচার্যের কাজ করিতেন। ভোরবেলা উঠিয়া তাঁহাকে দেখিলাম, পূর্বাকাশের দিকে মুখ করিয়া ছাদের উপর ধ্যানের আসনে বসিয়া আছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রথম রৌদ্রের আভা আসিয়া তাঁহার মুখে না পড়িত ততক্ষণ এই ভাবেই বসিয়া থাকিতেন। কিন্তু মন্দিরে উপাসনা সেদিন হইলই না। তাঁহার শরীর বোধ হয় সুস্থ ছিল না। চা খাওয়ার পর একবার বাহির হইয়া আসিলেন। গরম এবং মশার কামড় কেমন উপভোগ করিয়াছি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার পর নিজের লেখার খুপরিটিতে উঠিয়া গিয়া বসিলেন। শুনিলাম 'সবুজপত্রের' সেই গল্পটি তখনো শেষ হয় নাই। যাত্রার আগে যদি শেষ করিতে পারেন তাহা হইলে পড়িয়া শুনাইয়া যাইবেন। কমলা দেবীরাও কলিকাতা যাইতেছেন শুনিলাম। মীরা দেবী বোধ হয় কলিকাতা-যাত্রীদের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য পুত্র-কন্যাসহ এই সময় সুরুল হইতে আসিয়া পৌঁছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের লেখা শেষ হইয়াছে শুনিলাম। দিনুবাবুর হল-ঘরে সেটি পড়া হইবে শুনিয়া একে একে সকলেই সেখানে গিয়া জুটিলাম। লোক তখন আশ্রমে খুব বেশি ছিল না। কবি খানিক পরে তাঁহার উপরের ঘর হইতে নামিয়া আসিলেন। খাতাপত্রের সঙ্গে তাঁহার হাতে একজোড়া জাপানি জুতা দেখিয়া কিঞ্চিৎ অবাক হইয়া গেলাম। পরে বুঝিলাম যে তিনি তাহা দান করার উদ্দেশ্যেই লইয়া আসিয়াছিলেন। মায়ের কাছে আসিয়া বলিলেন, 'মেয়েদের পায়ে যে এটা হবে না তা দেখেই বুঝতে পারছি। অতএব পদমর্যাদায় আপনিই যখন এ সভায় বড়ো তখন এটা আপনারই প্রাপ্য। ব্রাহ্মণ-কন্যা পরবেন।' মা প্রণাম করিয়া তাঁহার উপহার গ্রহণ করিলেন। জুতা-জোড়াটি তিনি কখনো পরেন নাই, তবে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন।

সেদিন যে গল্পটি রবীন্দ্রনাথ পড়িয়া শুনাইলেন তাহা পরে "তপস্বিনী" নামে 'সবুজ-পত্রে' প্রকাশিত হইয়াছিল। পড়া শেষ হইলে পর, গল্পটির অপ্রত্যাশিত সমাপ্তি লইয়া খানিক হাসাহাসি হইল। নানা বিষয়ে অনেকক্ষণ গল্প হইল। সভাভঙ্গ হইলে পর বেশ রোদ উঠিয়াছে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ি চলিয়া আসিলাম।

খাওয়া-দাওয়ার পর একটু দিবানিদ্রার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় বাহিরে গোরুর গাড়ির চাকার আর্তনাদ শুনিয়া বুঝিলাম যে এইবার যাত্রার আয়োজন হইতেছে। বাহির

হইয়া দেখিলাম নানা রকমের ব্যাগ ও স্যুটকেস গাড়িতে তোলা হইতেছে। কত যে দেশবিদেশের ছাপমারা সেগুলির উপর তাহার ঠিকঠিকানা নাই। সেগুলির অবশ্য অনেক ভ্রমণ তখনো বাকি ছিল।

রবীন্দ্রনাথকে বিদায় দিতে আশ্রমের যে যেখানে ছিলেন সকলেই আসিয়া জুটিলেন। মীরা দেবী তাঁহার শিশুকন্যাকে কোলে করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। মোটরকারখানি এবং দ্বিপুবাবুর জুড়ি গাড়িটিও আসিয়া দাঁড়াইল, কারণ তখনকার দিনে মোটরটির উপর সকলের পুরাপুরি আস্থা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ এই সময় উপর হইতে নামিয়া আসিলেন। সাধারণ ধুতি-চাদরই পরিয়াছেন, পাঞ্জাবির গলার বোতাম দু-তিনটি খোলা, মাথায় একটি কালো মখমলের টুপি। ধুতির সঙ্গে টুপি তখনকার দিনে কাহাকেও পরিতে দেখি নাই, কিন্তু তাঁহাকে ইহাতেও আশ্চর্য সুন্দর দেখাইল। বিধাতা তাঁহাকে রূপ দিয়াছিলেন অলোকসামান্য। তাঁহার নিখুঁত আর্টিস্টের দৃষ্টি এবং রুচিও সর্বদাই তাঁহাকে সাহায্য করিত, কখনো তাঁহাকে এমন পোশাক পরিতে দেখি নাই যাঁহাতে তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্যের একটুও হানি হয়।

তাঁহার কন্যা তাঁহার পোশাকের কি একটা ত্রুটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে বলিলেন, 'যাক গে, ওর জন্যে আমার কোনো দুঃখ নেই।' নাতনীকে আদর করিয়া পকেট হইতে সোনার ঘড়িটা বাহির করিয়া দেখাইলেন। শিশু ঘড়ির দিকে না তাকাইয়া একদৃষ্টে তাঁহার টুপির দিকে চাহিয়া রহিল। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'তোমার এখনো অনেক শিক্ষা বাকি আছে, বুদ্ধিসুদ্ধি থাকলে দামি জিনিসটার দিকেই আগে তাকাতে।'

আমি অগ্রসর হইয়া প্রণাম করাতে বলিলেন, 'আমি ফিরে আসা পর্যন্ত থেকে যেয়ো।' তিনি গাড়িতে গিয়া উঠিলেন, গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

কমলা দেবীর বারান্দায় বসিয়া অনেকক্ষণ গল্প হইল। মীরা দেবী সুরুলে ফিরিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, 'তোমরা যেন পালিয়ো না, আমি সুরুল থেকে আসছি।'

আরো কয়েকটা দিন থাকিয়াই গেলাম। খাইয়া ঘুমাইয়া বেড়াইয়া এবং মীরা দেবীর সঙ্গে গল্প করিয়া দিনগুলি কাটিয়া গেল। দার্জিলিঙে বক্তৃতাদি হইতেছে এ-সব খবরও মাঝে মাঝে পাইতাম। কয়েকদিন পরে কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম।

এই সময় 'নিরেট গুরুর কাহিনী'-নামক একটি ছোটো ছেলেদের গল্পের বই লিখিয়াছিলাম। বই বাহির হইতেই রবীন্দ্রনাথকে একখানি পাঠাইয়াছিলাম। দার্জিলিঙ হইতে তাহার উত্তর পাইলাম। তিনি রসিকতা করিয়া জানিতে চাহিয়াছিলেন বইটি আমি তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছি কি না। গল্পগুলি হইতে তিনি নাকি একটি সদুপদেশ পাইয়াছেন যে, পা কখনো ঠাণ্ডা হইতে দেওয়া উচিত নয়, এইজন্য তিনি স্বয়ং সর্বদাই খুব গরম মোজা পরিয়া থাকেন।

এই সময় কবি কিছুদিন শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার মহাশয়ের বাড়ি Glen Eden-এ ছিলেন। নীলরতনবাবুর এক ভাইঝির বিবাহে এই সময় তাঁহার মেয়েরা দুই-

তিনদিনের জন্য কলিকাতায় আসেন। তাঁহাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু খবর পাইলাম। কবি ওখানে গিয়া কিছু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন শুনিলাম। এই সময় তাঁহার প্রথমা কন্যা বেলা দেবী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন, ইহা কবির ঘোরতর উদ্‌বেগ ও অশান্তির কারণ হইয়াছিল। বেলা দেবীর অসুখ বেশি বাড়িয়া যাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিং হইতে অল্প কিছুদিন পরেই কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন।

৩০ জুন একবার আমাদের বাড়িতে আসিলেন। দার্জিলিঙে অসুখে ভুগিয়া অনেকটা রোগা হইয়া আসিয়াছেন দেখিলাম। আমাকে আবার সেই গল্পের বই লইয়া ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, আমি যে তোমার বই সম্বন্ধে অত সন্দেহ প্রকাশ করে চিঠি লিখলুম, তা কই তুমি তো আমায় কোনোরকম আশ্বাস দিলে না যে আমাকে লক্ষ্য ক'রে লেখ নি? এত লোক থাকতে তুমি গুরুদের আক্রমণ কর কেন?'

তাহার পর বাবার সঙ্গে কাজের কথা পাড়িলেন। ছেলেমেয়েদের জন্য নূতন এক series বই তাঁহার তৈয়ারি করার ইচ্ছা আছে, সেগুলি সংকলন ও সম্পাদনে সাহায্যের জন্য একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি দরকার। কাহাকে রাখা যায় সে বিষয়ে কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, তোমরাই বা সেক্রেটারি হতে পারবে না কেন? তোমাদের কী terms আমাকে গোপনে বোলো, আমার যদি ক্ষমতায় কুলোয় তা হলে তোমাদেরই রাখব।' কথাটা তিনি যে ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, না সত্যই বলিলেন, ঠিক বুঝিতে পারিলাম না, কারণ তখনকার দিনে নিজের বিদ্যা বা বুদ্ধির উপর বিন্দুমাত্রও আস্থা ছিল না। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম যে কথাটার সবটাই অন্তত ঠাট্টা ছিল না। অল্প পরে তিনি চলিয়া গেলেন।

বোলপুরে কিছুদিন গিয়া থাকা আমাদের স্থির হইয়া গেল। বাবা সেই ছোটো মাটির বাড়িটি কিনিয়া লইলেন। এখানে আমরা দুই বৎসর ছিলাম। মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিতাম, আবার ফিরিয়া যাইতাম। বাবা দিদি আমি ও মুলু এইখানে থাকিতাম, মা শ্রীমান অশোককে লইয়া কলিকাতায় থাকিতেন। তিনিও মধ্যে মধ্যে এখানে আসিতেন। দাদা তখনো বিলাত হইতে ফিরেন নাই।

৩ কি ৪ জুলাই আমরা শান্তিনিকেতনে আসিয়া পৌঁছিলাম। মা ও অশোক সঙ্গেই ছিলেন, তবে দিন-দুই পরে তাঁহারা ফিরিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। বাড়িটির চারধারে বারান্দা, মাঝে তিনখানি ঘর। রান্নাঘর, স্নানের ঘর প্রভৃতি ঐ বারান্দা ঘিরিয়াই পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তৈয়ারি হইয়াছিল। বাড়িখানির সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ ছিল এই যে সেটি রবীন্দ্রনাথের বাড়ির অতি নিকটে। চোখে তো সারাক্ষণই দেখা যাইত, জোরে কথা বলিলে এ বাড়ি হইতে ও বাড়ি শোনা যাইতো। সামনের বারান্দায় ও বারান্দার নীচে, সবুজ ঘাসের উপর এক-একখানি তক্তপোষ পাতা ছিল, আমরা ছেলেমেয়েদের দল তো পারতপক্ষে এখান হইতে নড়িতাম না। তবে মা কলিকাতায় থাকায়, অবসর কিছু সংক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিল, ঘরসংসার আমাদেরই দেখিতে হইত। তবে অল্প বয়সের উৎসাহে ঐ ছোটো সংসারের কাজ আমাদের অতি অল্প সময়েই সাঙ্গ হইত, বাকি সময়টা নিজেদের অভিরুচি অনুসারে

কাটাইতে পারিতাম। তখন আশ্রমের গণ্ডি ছোটো ছিল, মানুষও অল্প ছিল, এই দুই বৎসরের নৈকট্যের ফলে অনেকে যেন আত্মীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। চলিয়া যখন আসিলাম তখন বাহিরের দিক হইতে যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল, কিন্তু অন্তরের ভিতরে সেই আত্মীয়তা চিরকালের জিনিস হইয়াই আছে।

প্রথম যখন আসিলাম তখনো রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায়ই আছেন। আমরা আসার দিন-দুই পরে তিনি শান্তিনিকেতনে আসিলেন। আমি আসিয়াই বিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের দলে ভিড়িয়া গেলাম। নেপালবাবু বলিলেন ছোটো ছেলেদের ইতিহাস পড়াইতে। আনন্দের সঙ্গে রাজি হইলাম।

ছোটো ছেলেগুলি ভারি মজার ছিল। আমার তখন সবে নিজের পড়া শেষ হইয়াছে, পড়া জিনিসটার সম্বন্ধে একটু বেশি সচেতন ছিলাম। কিন্তু আমার ছাত্রগুলির কাছে পড়া এবং খেলার মধ্যে বেশি তফাত ছিল না। গল্প শোনার মতো করিয়া তাহারা ইতিহাসের কাহিনী শুনিত, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে এমন অত্যাশ্চর্য সব উত্তর দিত যাহা কোনো ঐতিহাসিক কোনোদিন কল্পনা করেন নাই। একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ভারতবর্ষের উত্তর দিকে তো হিমালয় পাহাড়, আক্রমণকারীরা তা হলে ও দিক দিয়ে আসত কি ক'রে?' একটি ছেলে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, 'কেন, সিঁধি কেটে।' ক্লাসে আমাকে যাইতে হইত না, তাহারাই বই আসন খাতা লইয়া আসিত এবং দক্ষিণের বারান্দায় বসিয়া পড়া-পড়া খেলা খেলিত। এক-একদিন মাঝপথে কেহ-কেহ-বা গাছে চড়িয়া বসিত, অন্যরা অনেক টানাটানি করিয়া তাহাদের নামাইয়া আনিত।

ম্যাট্রিক ক্লাসের কয়েকটি ছেলেকেও কিছুদিন ইংরেজি অনুবাদ করাইয়াছিলাম। জীবনময় রায় তখন বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনিই বোধ হয় তাহাদের ইংরেজি পড়াইতেন। আমাকে একদিন বলিলেন, 'ওদের এই উপকারটা ক'রে দে, ওরা চিরকাল তোকে মনে রাখবে।' উপকার করিবার চেষ্টা যথাসাধ্য করিয়াছিলাম, মনে কেহ রাখিয়াছে কি না জানি না।

আমরা আসিলাম বুধবারে, রবীন্দ্রনাথ আসিলেন শুক্রবারে। তখন বিদ্যালয় খুলিয়াছে, সকলে ফিরিয়াছেন, কাজেই লোকের ভিড়ে প্রথমদিন দেখাই করিতে পারিলাম না। তবে দেখিতে তাঁহাকে সারাক্ষণই পাইতাম, সেই ছিল আমাদের এক অফুরান আনন্দের সঞ্চয়।

পরদিন সন্ধ্যার সময় তিনি নিজেই আসিলেন দেখা করিতে। বাহির হইতে ডাকিয়া বলিলেন, 'কি গো, সব ঘরে আছ?' বাবা ছিলেন না, আমরা দুই বোনে বাহির হইয়া প্রণাম করিলাম। কুশল-প্রশ্ন করিয়া ও ঘরগুলি ঘুরিয়া দেখিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

রবিবারে সকালের দিকে কমলা দেবীর বারান্দায় বসিয়া গল্প করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম কবি আসিতেছেন। আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সকালে বেড়াতে যাও না? নাতবউকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি গো, হরিশ মালী আর তোমাকে ফুল দেয় না?' কমলা বলিলেন, 'না।' রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'তার এমন মনের পরিবর্তন হল যে?'

হরিশ মালীর কমলা দেবীর প্রতি পক্ষপাত সম্বন্ধে কবি একটি গল্প বলিয়াছিলেন; তাহা এখন মনে পড়িতেছে না, তখন উহা অফুরন্ত হাস্যরস জোগাইয়াছিল।

বুধবারে মন্দিরে তিনি উপাসনা করিলেন, ছেলেরা গান করিল। বিকালে তাঁহার সহিত দেখা করিবার ইচ্ছায় তাঁহার বাড়ি ঘুরিয়া আসিলাম, কিন্তু উপরে বা নীচে কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। কোথাও বাহিরে বেড়াইতে গিয়াছেন ভাবিয়া আমরাও মাঠে ও পথে এবং দুই-একজন অধ্যাপকের বাড়ি ঘুরিয়া আসিলাম। অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে যখন তখন ফিরিয়া আসিলাম। কমলা দেবীর বারান্দায় যেন রবীন্দ্রনাথের গলার স্বর শুনিতে পাইলাম। বারান্দায় উঠিয়া দেখিলাম সত্যই তিনি, পায়ের কাছে দিনুবাবুর পোষা ছোটো কুকুরটি শুইয়া আছে। নির্বাক পশুও তাঁহার আকর্ষণ অনুভব করিত, ইহা তখনো দেখিয়াছি, পরেও দেখিয়াছি। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, 'আজ যে এখানে তোমাদের ডাকঘরের রিহার্সাল হবে গো।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কমলা বাড়ি নেই?' হাসিয়া বলিলেন, 'না, অপেক্ষা ক'রে তাই ব'সে আছি। কমলাও নেই, কমলাকান্তও নেই।' আরো দুই-একজন অধ্যাপক বসিয়াছিলেন, হয়তো তাঁহারা কাজের কথা বলিতেছেন মনে করিয়া আর সেখানে না বসিয়া চলিয়া আসিলাম। শান্তিনিকেতনে তখন সাপ ছিল খুব, তাই অন্ধকার মাঠের ভিতর দিয়া বিনা আলোয় পথ চলিলে রবীন্দ্রনাথ বিরক্ত হইতেন। এই ত্রুটির জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহার কাছে বকুনিও খাইতাম। সেদিন অবশ্য বিনা বকুনিতেই পার হইয়া গেলাম। ডাকঘরের রিহার্সাল আরো খানিক পরে হইল, সে আর আমাদের দেখা ঘটিয়া উঠিল না।

পরদিন বিকালে আমরা দুই বোন কমলা দেবীর সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইলাম। খানিক আগে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, পথ ঘাট লাল কাদায় ভর্তি। তাহারই ভিতর দিয়া তিনজন মহানন্দে গল্প করিতে করিতে চলিয়াছি। কমলা দেবীর বাড়ি ও রবীন্দ্রনাথের বাড়ির মাঝখানে তখন একটি মেহেদি পাতার বেড়া ছিল। হঠাৎ সেই বেড়ার পাশ হইতে একটি নীলাভ ধূসর রঙের পোশাকের একাংশ দেখা গেল। আমাদের গলা সপ্তমে চড়িয়াছিল, একেবারে নীরব হইয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সামনে আসিয়া বলিলেন, 'এই যে তোমরা। আমি ভাবি রাস্তায় শুধু কমলের গলা শোনা যায় কেন? কমল, তুমি তো এখানকার বাসিন্দা, নূতন লোকদের সব দেখিয়ে-শুনিয়ে দাও।' কাদায় খালি পায়ে বেড়াইতেছি বলিয়া আমাকে একটু বকিলেন। ইতিহাসের ক্লাস কেমন হইতেছে তাহার খোঁজও করিলেন।

শুনিলাম কন্যার পীড়া বৃদ্ধি হওয়ার খবর পাইয়া তিনি কলিকাতায় যাইতেছেন। সারাদিন তাঁহাকে ব্যস্ত দেখিয়াছিলাম। অনেকবার উপর-নীচ করিলেন, একবার গাড়ি চড়িয়া বাহির হইয়াও গেলেন। সন্ধ্যার সময় দিনুবাবুর বারান্দায় গানের ক্লাস হইত। সেইখানে গিয়া বসিলাম। গানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আসিয়া বসিলেন। একটি নূতন গান শিখাইলেন।

তাহার পরদিন সকালে তাঁহাকে তাঁহার ধ্যানের আসনে দেখিলাম বটে, তবে চাকরেরা জিনিসপত্র গুছাইতেছে দেখিয়া বুঝিলাম সকালের ট্রেনেই যাইবেন। দেখা করিতে গিয়া শুনিলাম তিনি তখন স্নানের ঘরে। নীচে বসিয়া কমলা দেবীর সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলাম। কিছু পরে নামিয়া আসিলেন। দুজনে উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। কমলা প্রণাম করিয়া উঠিতেই কৌতুকচ্ছলে তাঁহার কানটা ধরিয়া একটু নাড়িয়া দিলেন। আমার মাথায় মৃদু করাঘাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার শিবাজী আর বিক্রমাদিত্যের কি খবর?' ছোটোদের যে আমি ইতিহাস পড়াইতেছি তাহা তিনি আমার কাছেই শুনিয়াছিলেন। নেপালবাবু এই সময় আসিয়া পড়ায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'নেপালবাবু-মশায়, আপনারা কিছু দেখেন না, সব অনার্যরা সিঁধ কেটে ভারতবর্ষে ঢুকে পড়ছে, আমি তো চিন্তিত হয়ে পড়েছি।' বাবার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'চললুম মশায়,' তাহার পর গাড়িতে উঠিয়া পড়িলেন।

ইহার পর এক মাসেরও বেশি তিনি কলিকাতায়ই ছিলেন বোধ হয়, শান্তিনিকেতনে আসেন নাই। "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" প্রবন্ধটি এই সময় লেখা হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ্য সভায় উহা বার-দুই পাঠ করিলেন, আমরা শান্তিনিকেতনে বসিয়া বসিয়া খবর পাইলাম। 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী' গানটিও এই সময়কার। কলিকাতার সভায় ঐ গানটি হইবে বলিয়া দিনুবাবুকেও তিনি টেলিগ্রামে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বাবাকেও সভাপতি হইবার জন্য আহ্বান করিলেন, তবে পারিবারিক কারণে বাবার যাওয়া হইল না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে রবীন্দ্রনাথকে একটি অভিনন্দন এই সময় দেওয়া হইল, আমরা শান্তিনিকেতনে বসিয়াই শুনিলাম।

রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত না থাকায় সকলেই একটু মুষড়াইয়া ছিলাম, তবে শান্তি-নিকেতনে দিনগুলি মন্দ কাটিত না। দূরে বসিয়া বিদ্যালয়ের ছেলেদের জীবনযাত্রা দেখিতাম, গানের ক্লাসগুলিতে সর্বদাই উপস্থিত থাকিতাম, ফুটবল ম্যাচ হইলেও গিয়া জুটিতাম। মাঠে বনে ও রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ানো তো নিত্যকর্মের ভিতর ছিল। প্রায় সমবয়স্কা বন্ধুও অনেকগুলি ছিলেন, সুতরাং সময় কাটিয়াই যাইত।

১৯১৭-র অগাস্ট মাসের মাঝামাঝি রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন। বিকালের ট্রেনে আসিবেন বলিয়া শোনা গেল, তাঁহার জন্য স্টেশনে গাড়িও পাঠানো হইল, কিন্তু তিনি আসিলেন না। সকলে পথের ধারে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, শূন্য গাড়ি ফিরিয়া আসিতেছে দেখিয়া নিরাশাক্লিষ্ট মন লইয়া ফিরিয়া গেলাম। সন্ধ্যার সময় দিনুবাবুর গানের আড্ডায় গিয়া কিছুক্ষণ বসিলাম। দিনুবাবু বলিলেন, আমাদের বালক-ভৃত্য রাখালের অকস্মাৎ 'গান পাওয়া'তে তাঁহার বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। বালকটি আমরা যখনি বেড়াইতে বাহির হইতাম তখনি সংগীতচর্চা করিতে বসিত। এইরূপ আশ্রম-পীড়া ঘটানোর জন্য তাহাকে কিছু শাসন করার সংকল্প লইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন ভোরবেলা উঠিয়া বারান্দায় বাহির হইতেই দেখিলাম, সামনের বাড়ির দোতলার ঘর খোলা, ভিতরে মশারি ঝুলিতেছে; বুঝিলাম রাত্রের ট্রেনে কবিবর আসিয়া

পৌঁছিয়াছেন। কয়েক মিনিট পরেই তিনি বাহির হইয়া আসিয়া উপাসনায় বসিলেন তাঁহার নির্দিষ্ট স্থানটিতে। গৃহকর্মের তাড়ায় আবার আমাকে ঘরে ঢুকিতে হইল। খানিক পরে আবার বাহিরে আসিয়া দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ সিঁড়ি দিয়া নামিয়া নীচে আসিতেছেন, হাতে একখানি প্লেটে কি যেন খাবার। কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া তাকাইয়া রহিলাম। কবির পাশের কুটিরগুলিতে তখন অধ্যাপকেরা কয়েকজনে সপরিবারে বাস করিতেন, আগেই বলিয়াছি। রবীন্দ্রনাথকে দেখিলাম ক্ষিতিমোহনবাবুর ঘরের সামনে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বালকবালিকার দল ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিল, পরক্ষণেই বাড়ির গৃহিণী ব্যস্তভাবে বাহিরে আসিয়া রবীন্দ্রনাথের হাত হইতে খাবারের প্লেট নামাইয়া লইলেন। কবি ফিরিয়া গিয়া নিজের খাবার ঘরে ঢুকিলেন এবং আর-একটা কি হাতে করিয়া আবার বাহির হইয়া আসিলেন। মনে হইল আমাদের বাড়ির দিকেই আসিতেছেন। কাছে যখন আসিয়া পড়িলেন তখন দেখিলাম তাঁহার হাতে বড়ো একখানি পাঁউরুটি। দুই বোনে ছুটিয়া বাহির হইলাম তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে। দিদির হাতে রুটিখানা দিয়া বলিলেন, 'শান্তা, আমি তোমাদের ঘর-করনায় একটু সাহায্য করতে এসেছি, ওটা কিন্তু যবনের তৈরি।'

যাঁহারা তাঁহাকে কেবল শেষ জীবনের ভগ্নস্বাস্থ্য মূর্তিতে দেখিয়াছেন তাঁহাদের নিকট কবির এই চিত্র হয়তো-বা অবিশ্বাস্য লাগিতে পারে। কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে তাঁহার মধ্য-জীবনের অলোকসামান্য দীপ্তরূপে দেখিয়াছেন তাঁহারা এই চিত্রে সে যুগের রবীন্দ্রনাথকে আবার স্মৃতির মধ্যে ফিরিয়া পাইবেন। কোহিনুর-হীরককে আলোয় তুলিয়া ধরিলে যেমন সহস্র মুখ দিয়া তাহার জ্যোতি ঠিকরাইয়া পড়ে, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ছিল সেইরূপ। অতি ঘরোয়া সাধারণ একটা কাজও তাঁহার মধ্যে অসাধারণ রূপ লইত। যৌবনে গান রচনা করিয়াছিলেন, 'আমারে করো তোমার বীণা', ভগবান সে প্রার্থনা তাঁহার পূর্ণই করিয়াছিলেন। এই আশ্চর্য স্বর্ণবীণার কোনো তারে কখনো বেসুরা কিছু বাজে নাই। ইহার পর কিছুক্ষণ বাহিরের সেই তক্তপোষটিতে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। শান্তিনিকেতনে যে মেয়েরা তখন ছিলেন তাঁহাদের একটি সাহিত্য-সভা ছিল, 'শ্রেয়সী' বলিয়া হাতে লেখা কাগজও একটি কিছুদিন বাহির হইয়াছিল। 'শ্রেয়সী নামটি পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দিয়াছিলেন। এই সাহিত্য-সভায় ছোটো বড়ো নির্বিশেষে সব মেয়েরাই লেখা পড়িত, গান করিত, আলোচনা করিত। রবীন্দ্রনাথ আসিবার আগের দিনই বোধ হয় একটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে নুটু (সন্তোষবাবুর বালিকা ভগিনী) ছোটো একটি লেখা পড়িয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ সে কথা কাহার কাছে শুনিয়াছিলেন জানি না, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সেদিন নুটু তোমাদের কি উপদেশ দিয়েছিল?' আরো দু-চারিটি কথা বলিয়া তিনি অন্য এক বাড়িতে দেখা করিতে গেলেন। অনেক বাড়িতেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখা করিয়া আসিলেন, তাহা বারান্দায় বসিয়া দেখিতে পাইলাম।

দুপুরে শুনিলাম, কিছুক্ষণ পরেই "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" প্রবন্ধটি পড়িয়া শোনানো হইবে। কিন্তু দুপুরে প্রবন্ধ পড়া আর হইল না, তাহার বদলে হইল আশ্রম-সম্মিলনীর

অধিবেশন, রবীন্দ্রনাথ সেইখানেই সভাপতির কাজ করিতে গেলেন। আশ্রমে যাহা-কিছু হইত, সবতাতেই আমরা যোগদান করিতে গিয়া উপস্থিত হইতাম, বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ যদি উপস্থিত থাকিতেন তাহা হইলে তো কথাই ছিল না। 'বীথিকাগৃহ' বলিয়া যে ঘরটি ছিল সেইখানে সভা হইতেছিল, গিয়া দেখিলাম এত ভিড় যে ভিতরে প্রবেশ করা যায় না। ছেলেরা বাহিরেই আমাদের জন্য একটি তক্তপোষ পাতিয়া দিল একটা জানালার ধারে। সেইখানেই বসিয়া খানিক সভার কার্যকলাপ দেখা গেল, তাহার পর ফিরিয়া গেলাম। বাড়িতে বসিয়াই দেখিলাম সভান্তে রবীন্দ্রনাথ মোটরে করিয়া সুরুলে বেড়াইতে গেলেন। বুঝিলাম প্রবন্ধ পাঠ যদি হয়ও তো সন্ধ্যার সময় হইবে। নিজেরা বৈকালিক জলযোগাদি সারিয়া নেপালবাবুর সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইলাম। রাস্তা দিয়া খানিকদূর অগ্রসর হইতেই দেখিলাম বোলপুর হইতে দলে দলে লোক শান্তিনিকেতনের দিকে আসিতেছে। ব্যাপার কি জানিবার জন্য দাঁড়াইলাম, বিদ্যালয়ের কয়েকটি ছেলেও এই সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা খুব উৎসাহ সহকারে খবর দিল যে বোলপুরের অনেক লোককেই তাহারা বক্তৃতা শুনিতে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছে, এমন-কি স্থানীয় ইংরেজ পাদ্রীকেও। নেপালবাবু শুনিয়াই বিশেষ খুশি হইলেন না, বলিলেন, 'করেছিস কি?' যাহা হউক, বেড়াইতে যখন বাহির হইয়াছি তখন বেড়ানোটা সারিয়া আসা যাক মনে করিয়া রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইলাম। ঠিক সেই সময় মোটরের শব্দ শুনিলাম এবং গাড়িটাও দেখিতে দেখিতে আসিয়া আমাদের পাশে দাঁড়াইয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িয়া নেপালবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এমন 'উদারভাবে' লোক নিমন্ত্রণ করা হইতেছে কেন? মুখে দেখিলাম স্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন। তাঁহার বক্তব্য শেষ করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন, আমরাও তাড়াতাড়ি বেড়ানো সারিয়া আসার চেষ্টায় জোরে জোরে পা চালাইয়া চলিলাম। কিন্তু একবার মাঠের ভিতর বা খোয়াইয়ের ভিতর নামিয়া পড়িলে নির্দিষ্ট সময়ে ফেরা কঠিন হইয়া পড়িত। বেশ কয়েক মাইল ঘুরিয়া খেয়াল হইল যে ফিরিয়া গিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-পাঠ শুনিতে হইবে। Short cut করিবার চেষ্টায় রেললাইন level crossing gate-এর কাছে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সেটি তালা-বন্ধ। গেটের পাশে একটু ফাঁক দেখিয়া দুই বোনে তাহারই ভিতর দিয়া গলিয়া পার হইয়া গেলাম। নেপালবাবুও খানিক ধস্তাধস্তি করিয়া পার হইয়া আসিলেন। তাহার পরও রাস্তা হারাইয়া খানিক ঘোরাঘুরি করিতে হইল। সেদিন আবার ছিল অমাবস্যার রাত, একেবারেই যদি পথ খুঁজিয়া না পাই তাহা হইলে কি হইবে সে ভাবনাও যে দু-একবার না হইল তাহা নয়। অবশেষে একটা পায়ে-চলা পথের সন্ধান পাইলাম, এবং তাহা ধরিয়া প্রাণপণ জোরে হাঁটিয়া যখন বড়ো রাস্তায় আসিয়া পৌঁছানো গেল তখন ঘণ্টার আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। আশ্রমের প্রবেশ পথে বেশ একটি ভালো স্প্রিংওয়ালা গদি-আঁটা গোরুর গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া নেপালবাবু বলিলেন, 'সর্বনাশ!' বুঝিলাম অবাঞ্ছিত আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। নাট্যঘরের কাছাকাছি আসিতেই শুনিতে পাইলাম গান আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী।' তাড়াতাড়ি

ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। শুনিলাম আমাদের দেরি দেখিয়া দিক-বিদিকে লোক পাঠানো হইয়াছে খুঁজিবার জন্য।

গান শেষ হইবামাত্র সকলে উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিলাম কবির দিকে, এইবার "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" শুনিব। রবীন্দ্রনাথ সামনে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বসিলেন ; আরম্ভ করিলেন, 'আজ আপনাদের আমার অনেকদিন আগের রচিত একটি কবিতা প'ড়ে শোনাব, এর বেশি আর কিছু আজ আমার কাছে আশা করবেন না।' বলিয়া বই খুলিয়া "গান্ধারীর আবেদন" পড়িতে আরম্ভ করিলেন। অনেককে ফিস্‌ফিস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি ব্যাপার?' সকলে সেইরকম সুরেই বলিল, 'পরে বলব।' কবিতা পাঠ শেষ হইলে পর 'জনগণমন-অধিনায়ক' গাহিয়া সভা ভঙ্গ হইল। বোলপুর হইতে প্রায় দেড় শো দুই শো লোক আসিয়াছিল, তাহারা কিঞ্চিৎ হতবুদ্ধি হইয়া ফিরিয়া গেল। বাহিরে আসিয়া শুনিলাম, রবীন্দ্রনাথ অত জনসমাগম দেখিয়া বিরক্ত হইয়া "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" পড়েন নাই।

যাহা হউক, ইহার পরের দিন সত্যই "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" পড়া হইল। সেদিন আর বাহিরের কেহ খবর পাইল না। আশ্রমের সকলে সমবেত হইলেন। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীকে সভাপতি করা হইল। প্রবন্ধটি বেশ বড়ো, পড়িতে এক ঘণ্টারও বেশি সময় লাগিল। গান আজ আর হইল না, প্রবন্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথ 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানটির এক লাইন ধরিলেন, কিন্তু আর বেশি দূর অগ্রসর হইল না। সভা ভঙ্গ হইবার পর অধ্যাপকদের একজনের একটি খোকাকে কোলে করিয়া দুই বোনে খানিক এদিক-ওদিক ঘুরিলাম, রবীন্দ্রনাথ একবার নিকটে আসিয়া খোকার গাল টিপিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এটি বুঝি তোমাদের Pet?' তাহার পর নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

শান্তিনিকেতনে তখন প্রায়ই বাহির হইতে ফুটবলের টিম আসিত ম্যাচ খেলিতে। আমার ফুটবল ম্যাচ দেখার বাতিক ছিল, কারণ শৈশবে নিজেও ভাইদের সঙ্গে ফুটবল খেলিতাম! একলা তো মাঠের মধ্যে যাওয়া ভালো দেখায় না, তাই সঙ্গী খুঁজিবার জন্য মীরা দেবীর বাড়ি গেলাম। তিনি তখন কাজে ব্যস্ত, যাইতে পারিলেন না, বলিলেন, 'আমার আয়ার সঙ্গে যাও।' রবীন্দ্রনাথ উপর হইতে বলিলেন, 'আয়া কি ওকে রক্ষা করবে নাকি?' যাহা হউক, খানিক পরে মীরা দেবী নিজেই গেলেন। ম্যাচ দেখিয়া ও খানিক বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

সন্ধ্যার পর দিনুবাবুর বারান্দায় গিয়া বসিলাম, গান শুনিবার আশায়। হঠাৎ পিছনে জাপানি খড়মের শব্দ শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া তাকাইলাম। রবীন্দ্রনাথ আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি বলিলেন, 'আরে, বোসো বোসো, তোমাদের ব্যস্ত হবার কিছু দরকার নেই। একটু গল্প করা যাক।' তিনি নিজেও আমাদের পাশে সেই তক্তপোষে বসিয়া গেলেন। কমলা দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহাকে টানিয়া নিজের পাশে বসাইয়া বলিলেন, 'কমল, তুমি এইখানটিতে বোসো। তোমার সঙ্গে আমার যে খুব ভাব, তা না-হয় ওরা

দেখতেই পাবে, না-হয় কলকাতায় গিয়ে ব'লেই দেবে।' আমরা তো হাসিয়া মরি। নাতবউ কমলা দেবীর সঙ্গে কবির সম্বন্ধটি বড়ো মধুর ছিল, নিজেও ইহা স্বীকার করিতেন। বাবা তাঁহাকে একদিন 'চিরকুমার সভা' ইংরেজিতে অনুবাদ করিতে বলায় তিনি বলিলেন, 'আপনিও যেমন মশায়, ওরা এর রস কি বুঝবে? শালী-ভগ্নীপতির যে মধুর সম্পর্ক তা ওদের সমাজেই নেই। এই ধরুন আমার সঙ্গে কমলের যে সম্পর্ক সেই বিষয়ে গল্প লিখলে ওরা এক বিন্দুও তার রস গ্রহণ করতে পারবে?'

এবারেও রবীন্দ্রনাথ খুব বেশিদিন শান্তিনিকেতনে থাকিতে পারিলেন না। কলিকাতা হইতে খবর আসিল বেলা দেবীর অসুখ আবার বাড়িয়াছে। কবি অগস্টের ত্রিশ তারিখেই বোধ হয় কলিকাতা চলিয়া গেলেন। সেদিনটা বুধবার ছিল। যাহাতে ট্রেন ধরিতে তাঁহাকে হুড়াহুড়ি করিতে না হয় সেইজন্য মন্দিরে ভোর থাকিতেই উপাসনা হইল।

উপাসনান্তে বাড়ি আসিয়া দেখিলাম, সামনের বাড়িতে জিনিসপত্র গোছানো হইয়া গিয়াছে, গাড়িও দেখিতে দেখিতে আসিয়া পড়িল। রবীন্দ্রনাথ নামিয়া আসিলেন অল্প পরেই। আমি প্রণাম করিলাম, আশীর্বাদ করিয়া আশ্বাস দিলেন যে শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন। বলিলেন, 'তোমরা তো রইলেই, আবার এসে দেখব।' নাতনী নন্দিতা তাঁহার একটি আঙুল ধরিয়া আকর্ষণ করাতে বলিলেন, 'একে বলে পাণিগ্রহণ।' নাতনীদের সম্বন্ধে এই ঠাট্টাটি তাঁহার খুব প্রিয় ছিল। তিনি চলিয়া গেলেন, বৃষ্টি আসিতেছিল, ট্রেন আসিতেও বিলম্ব ছিল না।

তখনকার দিনের শান্তিনিকেতনে ছাত্র, অধ্যাপক, রবীন্দ্রনাথের পরিবারভুক্ত অনেকে, আমাদের মতো স্থায়ী বাসিন্দা দু-চারজন, সকলে মিলিয়া যেন একটি বিরাট পরিবার গড়িয়া উঠিয়াছিল। কাহাকেও পর বলিয়া মনে হইত না। সকলের সুখে দুঃখে সবাই অংশ লইতে ছুটিয়া যাইত। দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অতি বন্ধু-বৎসল মানুষ ছিলেন। অসুস্থ শরীরে নিজে বিশেষ কোথাও যাইতেন না, কিন্তু তাঁহার বারান্দাটি সর্বদাই একটি বড়ো ক্লাবের কাজ করিত। সকলের খবর লওয়াও তাঁহার নিত্যকার্য ছিল। তাঁহার বাড়ি হইতে এত ফল মিষ্টান্ন প্রভৃতি উপহার আসিত যে আমরা সে-সব খাইয়াই শেষ করিতে পারিতাম না।

আমার ভ্রাতা শ্রীমান অশোক একবার বলিয়াছিলেন যে শান্তিনিকেতনের সবই ভালো, সবচেয়ে ভালো দ্বিপুবাবুর পান্তুয়া। দ্বিপেন্দ্রনাথ ইহা শুনিয়াছিলেন ; ইহার পর অশোক আসিয়াছেন শুনিলেই দ্বিপেন্দ্রনাথ পান্তুয়া পাঠাইয়া দিতেন। বাবা মিষ্টান্নাদি বিশেষ খাইতেন না, কিন্তু কিছু না খাওয়াইতে পারিলে বন্ধুবৎসল দ্বিপেন্দ্রনাথ খুশি হইতেন না, সুতরাং তিনি বাবার জন্য মস্ত এক ঝুড়ি ডাব আনাইয়া রাখিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যেন এই বিরাট পরিবারের গোষ্ঠীপতি ছিলেন। তাঁহার প্রতি একান্ত ভালোবাসাই ছিল আমাদের মিলনের সূত্র। তিনি যদি কোনো নূতন ধর্মের প্রবর্তক হইতেন তাহা হইলে তাঁহাকে অনুসরণ করিবার লোকের কোনো অভাব হইত না। চুম্বক যেমন করিয়া লৌহকে টানে তেমনি করিয়া মানুষের হৃদয়কে আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা তাঁহার

এমন অসামান্য পরিমাণে ছিল, যাহা আর কোনো মানুষের ভিতর কোনোদিনই দেখি নাই। হয়তো-বা বুদ্ধদেব কি খৃস্টের মধ্যে ছিল।

কবি চলিয়া যাওয়ার দুই-তিনদিন পরে আমাদেরও চলিয়া আসিতে হইল। মা কলিকাতায় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং কিছুদিনের জন্য সকলেই আসিলাম। রবীন্দ্রনাথ তখনো কলিকাতায়, প্রতিমা দেবীও কলিকাতায়ই ছিলেন। ১২ সেপ্টেম্বর বিকালে একবার তাঁহারা আমাদের বাড়ি বেড়াইতে আসিলেন। আমাকে দেখিয়া কবি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সব অমনি পালিয়ে এলে?' বাবাকে বলিলেন, 'আসুন মশায়, একটু পলিটিক্স চর্চা করা যাক।' আমাকে তখন কি কাজে অন্য ঘরে যাইতে হইল, কাজেই কি আলোচনা হইল শুনিতে পাইলাম না। তিনি যখন চলিয়া গেলেন তখন কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে মানুষ দাঁড়াইয়া গেল তাঁহাকে দেখিবার জন্য।

১৩ সেপ্টেম্বর সকালে আর-একবার আসিলেন বাবার সঙ্গে পরামর্শ করিতে। সে বৎসর কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। কী একটা গোলমাল ঘটিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি করিয়া সেই সমস্যার মীমাংসা করার চেষ্টা হইতেছিল। ঘরে আরো অনেকে থাকাতে তখন সেখানে গেলাম না। কী মীমাংসা হইল জানিতে পারিলাম না। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির পদ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরে আবার পদত্যাগ করেন।

১৫ সেপ্টেম্বর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গৃহে স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে একটি সভা হয়। রবীন্দ্রনাথ সভাপতি হন। বক্তা ছিলেন শ্রীমতী কুমুদিনী বসু, পণ্ডিত সীতারাম তত্ত্বভূষণ এবং অজিতকুমার চক্রবর্তী। এই সভাতেও বিষম ভিড় হয়। বেলা তিনটা হইতে মন্দিরে ঢুকিবার জন্য ঠেলাঠেলি শুরু হইয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ অনেক কষ্টে মন্দিরের বেদীর পিছনের দরজা দিয়া প্রবেশ করিলেন। ঠেলাঠেলি ও গোলমালে সীতানাথবাবুর বক্তৃতা কেহ শুনিতেই পাইল না। তিনিও বক্তৃতা অসমাপ্ত রাখিয়া বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। অন্য দুইজনের বক্তৃতার সময় অত গোলমাল হয় নাই। সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা করিলেন। রাজনারায়ণ বসুর প্রতি কবির গভীর শ্রদ্ধা ছিল, তিনি রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধু ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুরক্ত শিষ্য ছিলেন।

২১ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ একবার আমাদের বাড়ি আসিলেন। সঙ্গে অসিতকুমার হালদার, মুকুল দে, প্রশান্তচন্দ্র প্রভৃতি অনেক লোক দেখিয়া যে-ঘরে তিনি বসিয়াছিলেন সে-ঘরে আর ঢুকিলাম না। হঠাৎ বাবা আমাকে ডাকিলেন। ঘরে ঢুকিয়া কবিকে প্রণাম করিলাম, তিনি বলিলেন, 'বিচিত্রায় আজ বিকেলে Western music হবে, তোমরা যেয়ো সব। Piano, violin ইত্যাদি আছে। আমাকে সবাই ধরেছে জর্মান গান গাইতে, অনেক কাল ও-সব ছেড়ে দিয়েছি, কি হবে জানি না। আমার সকাল থেকে মন খারাপ হয়ে আছে। যা হোক, তোমরা যেয়ো, গেলেই আমার exhibition দেখতে পাবে।' তিনি অতঃপর চলিয়া গেলেন।

বিকালে যখন বিচিত্রার হলে পৌঁছিলাম, তখন সেখানে স্বজাতীয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, মেয়েদের খোঁজে অন্দরের দিকে চলিলাম। দোতলায় রবীন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইলাম, তিনি বলিলেন, 'এদিকে তোমাদের দলের দু-চারজন আছেন।' ঢুকিয়া দেখিলাম সত্যই আমাদের দলের অনেকেই এখানে বসিয়া আছেন। কিছুক্ষণ সেইখানে বসিয়া গল্পগুজব করিয়া প্রতিমা দেবীর সঙ্গে গিয়া বিচিত্রায় ঢুকিয়া বসিলাম। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী আসিয়া পৌঁছিবামাত্র গান-বাজনা আরম্ভ হইল। প্রথমেই শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী ও নলিনী দেবী একটি duet বাজাইলেন। বাজনা তাহার পর অনেকগুলিই হইল পর পর, গানও সংখ্যায় নিতান্ত কম নয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি ও জর্মান, সবরকম গানই গাহিয়া শুনাইলেন। হিন্দি গান দুইটিতেই তাঁহার গলা খুলিয়াছিল সবচেয়ে বেশি। একজন বাঙালি খৃস্টান মহিলা গুটি-দুই ইংরেজি গান গাহিয়া শুনাইলেন, তাঁহার নাম বোধ হয় শ্রীমতী বীণা আড্ডি্য। অনেক রাত হইয়া গেল, সুতরাং সভা-অন্তে আর কাহারো সঙ্গে দেখা করিবার জন্য না দাঁড়াইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ি চলিয়া আসিলাম।

দিন-দুই পরে একটি পার্টিতে আবার তাঁহার সঙ্গে দেখা হইল। ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধানে কলেজের মেয়েদের জন্য একটি হস্টেল তখন ছিল, সেই হস্টেলের মেয়েদের নিমন্ত্রণে কবি সেখানে গিয়াছিলেন। গান এবং কবিতা-পাঠ হইয়াছিল ইহা মনে আছে, এবং রবীন্দ্রনাথকে অসংখ্য autograph book-এ নাম লিখিতে হইয়াছিল। মেয়েগুলি অত্যন্ত বেশি কথা বলায় কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম। কারণ বহুদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়েও তখনো তাঁহার সামনে ভালো করিয়া মুখ খুলিতে পারিতাম না।

এই সময় বিচিত্রায় উপরি উপরি দুইদিন 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনয় হইয়া গেল। একদিন শুনিলাম শুধু মেয়েদের জন্যই হইল। কার্ড না পাওয়াতে কিঞ্চিৎ বিস্মিত এবং অত্যন্তই মর্মাহত হইলাম।

২৭ সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিবার্ষিকীতে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পাইলাম। তিনিই সভাপতি ছিলেন। সভা যতদূর মনে পড়িতেছে রামমোহন লাইব্রেরির হলে হইয়াছিল। ঐটুকু ঘরে সেদিন যে কি বিষম ভিড় হইয়াছিল তাহা বলিবার নয়। বসিবার জায়গা তো পাইলামই না, উপরে gallery-তে দাঁড়াইয়া গলা বাড়াইয়া নীচের platform দেখার চেষ্টায় ঘাড়ে ব্যথা ধরিয়া গেল। গানের ব্যবস্থা বড়োই শোচনীয় হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের সামনে ঐ রকম গান যে কেহ গাহিতে পারে সে ধারণাই আমাদের ছিল না। সভায় আচার্য জগদীশচন্দ্র ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম বক্তৃতা করিয়াছিলেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার কণ্ঠস্বর গোলমালে শোনাই গেল না। দ্বিতীয় বক্তা ছিলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী। একজন পণ্ডিতগোছের ভদ্রলোক হিন্দিতে বক্তৃতা করিলেন। তাহার পর রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা করিলেন। শেষে আর-একটি গান হইল, সেটি তবু ভালো।

সভা শেষ হইবার পর গ্যালারি হইতে নীচে নামিলাম, কিন্তু লোকের ভিড়ে দরজার কাছেই আটকাইয়া গেলাম, বাহির হইতে পারিলাম না। পরে দেখিলাম যে লোকেরা আমার উপকারই করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথও এই পথেই বাহির হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই মনে হইল যে কাহাকে যেন খুঁজিতেছেন। আমাকে দেখিতে পাইয়াই কাছে আসিয়া বলিলেন, 'এই যে সীতা, কাল যাও নি কেন?' অভিমানটা আর প্রকাশ করিলাম না, বলিলাম, 'আমি ঠিক খবর পাই নি।' রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'এই দেখ কি কাণ্ড! আমি—কে বললাম তোমাদের কার্ড পাঠাতে, সে বললে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ দিচ্ছি', তার পর ভুলে গেছে আর-কি। আমি ভাবলাম তোমরা এলে না কেন। কাল আবার হচ্ছে, কাল কিন্তু নিশ্চয় যেয়ো।' বলিলাম, 'আচ্ছা।' মাকে নমস্কার করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'আপনি কাল যাবেন, রামানন্দবাবুকেও ধরে নিয়ে যাবেন।' আবার আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'যেয়ো কিন্তু নিশ্চয়, না নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাতে হবে?' আমি বলিলাম, 'না, দরকার নেই, নিশ্চয়ই যাব।' রবীন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন। বিস্মিত জনতা এতক্ষণ আমাদের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া ছিল, আমরাও পলাইয়া বাঁচিলাম।

কোন সৌভাগ্যের গুণে বা পূর্বজন্মের কোন সুকৃতির ফলে এই মহাপুরুষের এতখানি স্নেহ পাইয়াছিলাম জানি না। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য তো আমার এই স্নেহের স্মৃতি। নিজের কোনো গুণে পাই নাই তাহা তো বুঝিতে ভুল হয় না।

পরদিন যথাসময়ের কিছু পূর্বেই জোড়াসাঁকো গিয়া উপস্থিত হইলাম, ভয় ছিল পাছে ভালো জায়গা না পাই। গিয়া কিন্তু দেখিলাম তখনো বিচিত্রায় দর্শক-সমাগম আরম্ভ হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের দোতলার বসিবার ঘরে খানিকক্ষণ বসিয়া বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে গল্প করিলাম। প্রতিমা দেবীর জ্বর হইয়াছে শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে একবার তিনতলায় চড়িলাম। তাহার পর লোক দুই-চারিজন করিয়া আসিয়া জুটিতেছেন দেখিয়া বিচিত্রায় গিয়া উপস্থিত হইলাম।

'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনয় সত্যই আশ্চর্য সুন্দর হইয়াছিল। সাজসজ্জাও যা হইয়াছিল— চমৎকার! কেদারের ভূমিকায় সুকুমারবাবুর বিকট মুখভঙ্গি এখনো যেন চোখের সম্মুখে দেখিতে পাই। বৈকুণ্ঠ সাজিয়াছিলেন গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ সাজিয়াছিলেন 'তিনকড়ে'। অভিনেতারা বইয়ে যা নাই এমন দু-চার কথা বলিয়া পরস্পরকে ঠকাইবার চেষ্টাও দুই-চারিবার করিয়াছিলেন, কিন্তু ঠকিবার পাত্র কেহই ছিলেন না, সকলেই সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া গেলেন। রবীন্দ্রনাথ stage manager ছিলেন। দুই-তিনবার ঐকতান বাদ্য হইল। দর্শকদের ভিতর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় ছিলেন।

২ অক্টোবর Workingmen's Institute-এর prize দেওয়া উপলক্ষে একটি সভা হয়। রবীন্দ্রনাথ সভাপতি ছিলেন। কন্যার সাঙ্ঘাতিক পীড়ায় তখন তিনি অতিশয় উদ্‌বেগের ভিতর দিন কাটাইতেছিলেন, তবু উদ্যোক্তাদের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন নাই। কার্ডে দেখিয়াছিলাম য়ুনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে সভা হইবে, সেখানে উপস্থিত হইয়া কিন্তু দেখিলাম হলের দরজা জানলা সব বন্ধ, চারি দিক চুপচাপ। অত্যন্ত বিস্মিত

হইয়া কি করিব ভাবিতেছি এমন সময় একজন দরোয়ান বাহির হইয়া খবর দিল যে meeting এখানে হইবে না, Overtoun Hall-এ হইবে। গাড়ি ঘুরাইয়া আবার চলিলাম সেইখানে। ঘোরাঘুরির ফলে সভাস্থলে পৌঁছিতে দেরি হইয়া গেল, গিয়া দেখিলাম সভাপতি আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছেন, তবে সভার কাজ তখনো আরম্ভ হয় নাই। যাহা হউক, বসিবার জায়গা বেশ ভালোই পাইলাম। রবীন্দ্রনাথকে সেদিন বড়োই বিষণ্ন ও উদ্‌বিগ্ন দেখাইতেছিল, সোজা সামনের দিকে তাকাইয়া বসিয়াছিলেন, কাহাকেও যে দেখিতেছেন বা চিনিতেছেন তাহা মনেই হইল না।

গোটা-দুই গান হইবার পর সেক্রেটারি রিপোর্ট পাঠ করিলেন। Workingmen's Institute-এর ছেলেরা আবৃত্তি ও ড্রিল করিল। সেগুলি ভালোই হইয়াছিল। তাহার পর প্রাইজ দেওয়া হইল। রবীন্দ্রনাথ অতঃপর বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। প্রারম্ভে বলিলেন, 'যদিও আমার অবকাশ অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং আমি নানা উদ্‌বেগের ভিতর বাস করছি, তবুও কয়েকটি কারণে আজ আমি এখানে সভাপতির কাজ করতে সম্মত হয়েছি।' শ্রমজীবীদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতিই তাঁহাকে টানিয়া আনিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার পর রায়বাহাদুর চুনীলাল বসু উচ্ছ্বসিত ভাষায় সভাপতিকে ধন্যবাদ জানাইলেন। শ্রমজীবীদের স্কুলের কতকগুলি ছেলে প্ল্যাটফর্মে উঠিয়া কবির চারি দিক ঘিরিয়া বসিয়াছিল এবং স্থানে অস্থানে প্রাণপণে হাততালি দিয়া যাইতেছিল। সভার কাজ যখন শেষ হইয়া গেল তখন তাহারা উঠিয়া পড়িয়া মহোৎসাহে নিজের নিজের প্রাইজ গামছায় বাঁধিতে আরম্ভ করিল। ইহাদের দিকে তাকাইয়া এতক্ষণ পরে রবীন্দ্রনাথের মুখে একটু যেন হাসি দেখা দিল। সভা ভঙ্গ হইতেই তিনি তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন।

৩ অক্টোবর বিচিত্রায় রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এবারেও কি একটা বিভ্রাট ঘটিল এবং নিমন্ত্রণের কার্ড পাইলাম না। সেইদিনই সুকুমারবাবুদের বাড়িতেও নিমন্ত্রণ ছিল, সেইখানেই চলিয়া গেলাম। বাড়ি ফিরিলাম সাড়ে সাতটার পর। আসিয়া শুনিলাম যে আমাদের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ গাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, আমাদের লইয়া যাইবার জন্য ; আমরা ছিলাম না, শুধু বাবাই গিয়াছিলেন। চারুচন্দ্র তাহার পরদিন বলিলেন, 'তোমরা কাল গেলে না ব'লে রবিবাবু আমাকে বকতে লাগলেন, বললেন, তুমি কেন ওদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসো না?'

এই সময় শান্তিনিকেতনে মুলুর জ্বর হওয়ায় মা ও দিদি তাড়াতাড়ি সেইখানে চলিয়া গেলেন। আমি তখনকার মতো কলিকাতায়ই থাকিয়া গেলাম। একটা গুজব শুনিলাম যে বিচিত্রায় পড়া সেই প্রবন্ধটি অধিকসংখ্যক লোককে শুনাইবার জন্য আবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হলে পড়া হইবে। গুজবটা সত্যই হইল, তবে কর্মকর্তারা এবার এতই সাবধান হইলেন যে জনসাধারণ প্রায় খবরই পাইল না। তবুও হলটি একেবারে পূর্ণ হইয়া গেল, তবে দরজা ভাঙা বা মারামারিটা বাদ পড়িল। মেয়েরা খবর পায় নাই, অল্প দুই-চারজন মাত্র আসিয়াছিল। বক্তৃতার বিষয়বস্তু মনে নাই, 'ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়, তোমারি হউক জয়', গানটি গাহিয়া তিনি বেদী হইতে নামিয়া গেলেন।

বাহিরে তখন বিষম কাদা, কিছু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। চারি দিক হইতে ভক্তবৃন্দের প্রণামের চোটে অনেকক্ষণ তাঁহাকে সেই কাদার মধ্যেই দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। আমি যখন প্রণাম করিতে গেলাম, আমার পৃষ্ঠে মৃদু করাঘাত করিয়া বলিলেন, 'কি সীতা, তোমরা যে দেখছি আমাকে ত্যাগ করলে। সেদিন, খাতায় তোমাদের নাম লেখা নেই, না কি নিয়ে গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। ডাকঘর অভিনয়ের সময় নিশ্চয় যেয়ো। আমি ভাবলুম মুলুকে নেব, না ওরা দুটো পার্টই আমার ঘাড়ে চড়িয়ে দিলে, আমাকে প্রহরী আর ঠাকুর্দা দুই-ই সাজতে হবে।' আর-একদল ভক্তের আহ্বানে, সেই কাদার ভিতর দিয়া উত্তরীয় লুটাইয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

'ডাকঘর' নাটিকাটি বিচিত্রায় অভিনয় হইবার আগেই সমাজপাড়ার বাল্য সমাজ দ্বারা মেরী কার্পেন্টার হলে একবার অভিনীত হয়। মুলু তাহাতে ঠাকুর্দা এবং আশামুকুল অমলের ভূমিকায় অভিনয় করে। অভিনয় সত্যই খুব ভালো হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন কলিকাতায় ছিলেন না, পরে এই অভিনয়ের বর্ণনা শুনিয়া মুলু এবং আশামুকুল দুইজনকেই অভিনয়ে পার্ট দিতে চাহিয়াছিলেন। আশামুকুল অমলের ভূমিকায় অভিনয় করিল, সকলের আগ্রহাতিশয্যে ঠাকুর্দার ভূমিকায় কবি স্বয়ং নামিলেন।

১০ অক্টোবর বিচিত্রায় ডাকঘর অভিনয় দেখিতে গেলাম। জায়গার পক্ষে ভিড় হইয়াছিল অসম্ভব রকম। পুরুষ-দর্শক সেদিন অল্পই ছিলেন, মহিলাদেরই ছিল প্রাধান্য। কোনোমতে বসিবার জায়গা করিয়া তো বসা গেল। 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী' এতদিন কবিতায়ই পড়িয়াছিলাম, সেদিন প্রথম সুরসংযোগে গীত হইতে শুনিলাম। ইন্দিরা দেবীর নেতৃত্বে কয়েকজন তরুণী গানটি গাহিলেন।

গগনেন্দ্রনাথ মাধব দত্ত সাজিয়াছিলেন, অবনীবাবু কবিরাজ ও মোড়ল দুই ভূমিকাতেই অভিনয় করিয়াছিলেন। অসিতকুমার হালদার দইওয়ালা এবং রবীন্দ্রনাথ রাজকবিরাজ সাজিয়াছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা সুরূপা 'সুধা' সাজিয়াছিল, মেয়েটিকে ভারি সুন্দর দেখাইয়াছিল। বাঁশির সুরের মতো মিষ্ট গলায় তাহার সেই 'আহা, ফুলের খবর তুমি নাকি আমার চেয়ে বেশি জান?' এই কথাগুলির সুর এখনো কানে বাজিতেছে। শেষের দৃশ্য দুটি এখনো যেন চোখের উপর ভাসিতেছে। রঙ্গমঞ্চের চন্দ্রতারকাখচিত আকাশ ও চাঁদের আলো যেন সত্যকার আকাশ ও চাঁদকেও সৌন্দর্যে হার মানাইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ সাজসজ্জা কিছুই করেন নাই, মাথায় শুধু গেরুয়া রঙের পাগড়ি। আলোকের মুকুটের মতো যে কুঞ্চিত কেশদাম তাঁহার মুখের সৌন্দর্য দ্বিগুণিত করিত, তাহা পাগড়ির আড়ালে চাপা দেওয়াতে আমরা সকলেই মনে মনে আপত্তি অনুভব করিতেছিলাম। নাটকে গান কোথাও নাই, তবু একবার বাউল সাজিয়া, 'গ্রাম-ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ আমার মন ভুলায় রে', গাহিয়া, নৃত্য করিতে করিতে রবীন্দ্রনাথ মাধব দত্তের ঘরের পাশ দিয়া চলিয়া গেলেন। আর-একবার যবনিকার অন্তরাল হইতে গাহিয়া উঠিলেন, 'বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে। শূন্যঘাটে একা আমি, পার ক'রে লও খেয়ার নেয়ে।'

অভিনয় শেষ হইবার পরেও অনেকক্ষণ আটকাইয়া রহিলাম। মহিলাদের মজলিশ সহজে ভাঙিতে চায় না। দাঁড়াইয়া, বসিয়া, গল্প করিতে করিতে ঘণ্টা-খানেক কাটিয়া গেল। মাঝে একবার রবীন্দ্রনাথকে সামনে পাইয়া প্রণাম করিলাম। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি সীতা, সব শুনতে পেয়েছিলে তো? ভারি নাকি আস্তে হয়েছিল?' বলিলাম, সবই শুনিয়াছি, কোনো অসুবিধা হয় নাই। ভিড় কমিতে ও গাড়ি জোগাড় করিতে অনেক রাত হইয়া গেল। কয়েকজন মহিলা অভিভাবকশূন্য হইয়া ঘুরিতেছিলেন, তাঁহাদেরও পার করিবার ভার গ্রহণ করিতে হইল।

এই সময় তিনি অনেকদিন ধরিয়া একটানাই বোধ হয় কলিকাতায় ছিলেন। মধ্যে মধ্যে দর্শন পাইতাম। এক-একদিন এমন অতর্কিতে আসিতেন যে অপ্রস্তুতে পড়িতে হইত। দুপুরবেলা একদিন দুই বোনে তিনতলার ঘরে শুইয়া উপন্যাস পড়িতেছি, ছোটো দুই ভাই সদ্য-শোনা, 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসি', অতি বেসুরায়, প্রাণপণে চিৎকার করিয়া গাহিতেছে। এমন সময় আমাদের চাকর সতীশ নীচে হইতে একটুকরা কাগজ হাতে করিয়া উপরে আসিয়া বলিল, 'দাদাবাবু, একটা চিঠি আছে।' চিঠি পড়িয়া ভ্রাতার মুখের ভাবটা কিঞ্চিৎ অদ্ভুত হইয়া গেল দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া চিঠিখানা তাহার হাত হইতে লইয়া পড়িয়া দেখিলাম, 'মুলু, নীচে রবিবাবু এসেছেন, গানটা একটু থামাও।' হস্তলিপি চারুচন্দ্রের।

চাকরকেও জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে সত্যই রবীন্দ্রনাথ নীচে আসিয়া বসিয়া আছেন। একরকম ছুটিয়াই নীচে নামিলাম। অনিচ্ছাকৃত অসৌজন্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলাম, 'আপনি কখন এসেছেন, আমি খবর পাই নি।' আমার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, 'আমার খোঁজখবর তো কিছু নাও না, কি ক'রে জানবে?'

আমরা যেদিন ডাকঘর দেখিয়া আসিলাম, তাহার কয়েকদিন পরে আবার কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথিকে দেখাইবার জন্য আর-একবার অভিনয় হইল। আমাদের স্নেহ করিতেন বলিয়া কবি আর-একবার যাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। যাইবার জন্য সাজ-সজ্জা করিয়া প্রস্তুতও হইলাম, এমন সময় শোনা গেল বড়োবাজারে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধিয়া গিয়াছে। মা ভয় পাইয়া আমাদের আর যাইতে দিলেন না।

রবীন্দ্রনাথ, আমরা সেদিন যাই নাই কেন, জিজ্ঞাসা করাতে বাবা যথার্থ কারণটা বলিয়াই দিলেন। কবি দিদির দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'তোমরা সব modern women, এইটুকু সাহস তোমাদের নেই? কোথায় বড়োবাজারে দাঙ্গা হচ্ছে আর তোমরা ভয়ে জোড়াসাঁকো গেলে না?' এই প্রসঙ্গ লইয়া খুব খানিক হাসাহাসি হইল। বলিলেন, সেদিন অভিনয় সব দিনের মধ্যে ভালো হইয়াছিল, আমরা দেখিতে পাইলাম না বলিয়া দুঃখ করিলেন। শীঘ্রই শান্তিনিকেতন যাইতেছেন বলিলেন। তখন কলিকাতায় 'রাজা' অভিনয় করার একটা কথা উঠিয়াছিল, অভিনয় শিখাইবার জন্য হয়তো আবার কয়েকদিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পারেন, ইহাও শুনিলাম। দিদিকে বলিলেন, 'শান্তা, feminism সম্বন্ধে একটা বই লেখো তো।' লন্ডনে দু-চারজন ভারতীয় মহিলা

Suffragette procession-এ পতাকা হস্তে বাহির হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বুদ্ধি সম্বন্ধে একটু সংশয় প্রকাশ করিলেন। বাবার সঙ্গে আরো খানিকক্ষণ নানা বিষয়ে কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

মাঝে এক রবিবারে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ি নিমন্ত্রণ হইল। অবনীন্দ্রনাথের কন্যা করুণা দেবীর জন্মদিন উপলক্ষে তাঁহার স্বামী মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় নিমন্ত্রণ করেন। মেয়েদেরই মজলিশ, বসিয়া বসিয়া অনেক গল্প হইল। বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীর বাড়ি ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব ঘরগুলি দেখিয়া আসিলাম। একেবারে খাঁটি ভারতীয়, পাশ্চাত্য সজ্জার কোনো চেষ্টা দেখিলাম না। মেঝের উপর সুন্দর গালিচার আসন পাতিয়া খাওয়া-দাওয়াও পুরা বাঙালি মতেই হইল। খাওয়ার পর একবার ৫ নম্বর ছাড়িয়া ৬ নম্বরে আসিলাম, যদি একবার কবির দর্শন পাই সেই আশায়। দেখিতে পাইলাম বটে ; তবে তাঁহাকে ঘিরিয়া অনেকগুলি ভদ্রলোক বসিয়া আছেন দেখিয়া কাছে আর গেলাম না।

আমার এই স্মৃতিকথা সেকালের কয়েকটি ডায়েরির খাতা অবলম্বন করিয়াই লিখিতেছি। বালিকা বয়সের লেখা, কোন ঘটনাকে কতখানি মূল্য দিতে হয় তাহা জানা ছিল না। সব ঘটনার তারিখ নাই, যেখানে আছে সেখানে উল্লেখ করিয়াছি। দুই-চারটি ঘটনার উল্লেখ দেখি, কিন্তু সময় কিছু লেখা নাই। যাহা হউক, সময়ের খোঁজ না থাকিলেও চিত্রহিসাবে মূল্য সেগুলির সমানই আছে। এইরূপ একটি ঘটনার কথা লিখিতেছি। শান্তিনিকেতনেই তখন আছি। মেয়েদের একটি সাহিত্যসভা ছিল, তাহার কথা আগেই বলিয়াছি। এটিতে প্রধানত প্রবন্ধ পাঠ, আলোচনা ও গানই হইত। প্রতি বুধবারেই ইহার অধিবেশন হইত। একবার সকলে স্থির করিলেন যে এই বুধবারে নূতন রকম কিছু করা যাক। একটি fancy dress party হইবে, ইহাই ঠিক হইল। শান্তিনিকেতনে fancy dress করিবার মতো সাজসজ্জা পাওয়া তখন কঠিন ছিল, কারণ আমরা সকলেই এখানে আটপৌরে বেশভূষার জিনিস লইয়াই থাকিতাম, মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ যাহার যাহা ছিল কলিকাতাতেই থাকিত। ঠাকুর-পরিবারের অনেক মহিলাও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন না, কারণ তখনকার শান্তিনিকেতনে উই এবং ইঁদুর দুইয়ের উৎপাত অসাধারণ ছিল। কাজেই বেশি দামি জিনিস সেখানে কেহ রাখিতে চাহিতেন না। কিন্তু আমাদের উৎসাহের কাছে কোনো বাধাই টিঁকিল না। বুধবার সকালে মন্দিরের উপাসনার পর হইতেই সাজসজ্জার আয়োজন চলিতে লাগিল। মেয়েরা কে কি সাজিবে ইহা লইয়া অনেক জল্পনা-কল্পনা চলিল। ছেলেরা শাসাইতে লাগিল, তাহারা rain water pipe বাহিয়া উঠিয়া শান্তিনিকেতনের দু'তলায় উঁকি মারিয়া দেখিবে।

আমি দময়ন্তী সাজিয়াছিলাম, অনেকটা রাজা রবি বর্মার ছবি অনুকরণ করিয়া। তবে হংস জোটানো যায় নাই। কমলা দেবীর বাড়ি হইতে অর্ধেক সাজ সমাপ্ত করিয়া, চাদর মুড়ি দিয়া শান্তিনিকেতনের দু'তলার গাড়িবারান্দার ছাতে আসিয়া বসা গেল। মাঝে মীরা দেবীর শিশুকন্যাকে বোলতায় কামড়াইয়া দেওয়াতে বিভ্রাট বাধিয়া গেল। যাহা হউক,

বেশি কিছু না হওয়াতে আবার সাজসজ্জা চলিতে লাগিল। তখন দারুণ গরম, সাজের চোটে আরো যেন প্রাণ বাহির হইয়া আসিতে লাগিল। দিদি এবং ঠান্‌দি সাজিলেন রাম ও কচ। পুরুষের বেশে দুইজনকেই খুব ভালো দেখাইয়াছিল। সন্তোষবাবুর কনিষ্ঠা ভগিনী বাসু, এবং ক্ষিতিমোহন বাবুর দ্বিতীয়া কন্যা লাবু, লব ও কুশ সাজিয়াছিল। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা এণাক্ষী দেবী সাজিয়াছিলেন সীতা।

গাড়িবারান্দার ছাদে তো সকলকে যথাযোগ্যভাবে দাঁড় করানো গেল। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী বলিলেন, 'কাকামশায় আর রামানন্দবাবুকে দেখাতে হবে।' একটু আপত্তির গুঞ্জন শোনা গেল, তবে প্রবল নয়। তিনি স্বয়ং গিয়া দর্শক দুইজনকে আহ্বান করিয়া আনিলেন। রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে এইপ্রকার বিচিত্র বেশে বাহির হইতে লজ্জা করিতেছিল বটে, কিন্তু উপায় ছিল না। একটুখানি অন্ধকার কোণ খুঁজিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। সন্তোষবাবুর তৃতীয়া ভগিনীই বোধ হয় 'রাত্রি' সাজিয়া আমার পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন। আশা করিতেছিলাম, 'রাত্রি'র অঞ্চলের আড়ালে আমাকে ভালো করিয়া দেখা যাইবে না। কমলা দেবী 'দেবযানী' সাজিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ আসিলেন। 'দেবযানী' একটু লুকাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে একেবারে সামনে আনাইয়া দেখিলেন। 'লব' ও 'কুশ'কে দেখিয়া বলিলেন, 'ইস্‌, আমারই যে দেখে ভয় করছে।' দিদির এবং ঠান্‌দির পোশাকের প্রশংসা করিলেন। যাইবার আগে আর-একবার কমলা দেবীর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা, আমাকে কচ সাজালে কার কি ক্ষতি হত বল তো?' তিনি এবং বাবা চলিয়া যাইবার পর আমরা ছদ্মবেশ ছাড়িয়া আবার নিজমূর্তি ধরিলাম এবং যে যাহার ঘরে ফিরিয়া গেলাম।

পরদিন সকালে দিনুবাবুর বাড়ি রবীন্দ্রনাথ আসিলেন এবং খুব একটা হাসাহাসি পড়িয়া গেল দেখিয়া কৌতূহলী হইয়া নিজেও সেখানে গেলাম। আগের দিনের ছদ্মবেশের কথাই হইতেছে দেখিলাম। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, 'কি আশ্চর্য কাণ্ড দিনু! কালকে এণাকে একেবারে হুবহু এণার মতো দেখাচ্ছিল, একেবারে ঠিক এণা।'

হয়তো আগে আরো কিছু বলিয়াছিলেন, সেটা আমার আর শোনা হইল না। দুপুরে মীরা দেবীর বাড়ি একবার বেড়াইতে গেলাম। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ স্নান করিয়া নীচে নামিলেন, দ্বিপ্রহরের খাওয়ার জন্য। মীরা দেবী আমাকে সুদ্ধ খাইবার ঘরে টানিয়া লইয়া গেলেন। রবীন্দ্রনাথের খাওয়া তখন অতি সাদাসিধা ছিল, খাইতেনও অতি সামান্য। দু-তিন চামচ ভাত বড়োজোর পাতে লইলেন, অধিকাংশ ব্যঞ্জনাদি কন্যার দিকে ঠেলিয়া দিলেন, নিজে স্পর্শও করিলেন না। Fancy dress-এর কথা আবার উঠিল, বলিলেন, 'তোমাকেও ঠিক তোমার মতোই দেখিয়েছিল, একটু কিছু নূতন রকম করা উচিত। আমরা একবার fancy dress করেছিলুম, আমি ময়দা নিয়ে এমন একটা নাক বানিয়েছিলুম যে কেউই চিনতে পারে নি, শেষে গলার স্বরে ধরা পড়ে গেলুম।'

একটি ছাত্রের এক মাসি তাঁহাকে অতি ক্রুদ্ধ হইয়া এক চিঠি লিখিয়াছেন বলিলেন। রাগের কারণ, ছোটো ছোটো ছেলেদের কেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ পড়ানো হয়।

রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'যেগুলো পড়ানো হচ্ছে তাতে এমন তো কিছু আপত্তি করবার দেখি না, এক "কচ ও দেবযানী"তে একটু প্রেমের আমেজ আছে। ব্রাহ্মসমাজ কেবল কি কি আমোদ করতে পারবে না সেইটেই ঠিক ক'রে দিচ্ছেন, কিরকম করা যেতে পারে তার কোনো খোঁজই দেন না, কাজেই তাঁদের নিষেধটায় ফল হয় না। তাঁদের উচিত, তাঁদের মতে যা নির্দোষ আমোদ, তার একটা standard খাড়া ক'রে দেওয়া। শুধু একটা negative দিক নিয়ে লাভ নেই, কারণ অল্প বয়সের স্বভাবই এই যে তারা আমোদ চাইবেই।' খাওয়া শেষ হইয়া যাইবার পরেও অনেকক্ষণ বসিয়া গল্প করিলেন। উপরে উঠিয়া যাইবার সময় আমাকে একখানা Englishman কাগজ দিয়া বলিলেন, 'এটা তোমার ভাইকে দিয়ো, বিক্রি ক'রে তার night school-এর পুঁজি বাড়াবে।' মুলু তখন একটি নৈশ বিদ্যালয় খুলিয়াছিল ভুবনডাঙার ছেলেমেয়েদের জন্য। বাবার এবং রবীন্দ্রনাথের কাছ হইতে পুরানো খবরের কাগজ জোগাড় করিয়া ও বোলপুর শহরে গিয়া বিক্রয় করিয়া বালক এই নৈশ বিদ্যালয়ের খরচ চালাইত।

সেইদিনই বিকেলে রবীন্দ্রনাথ আমাদের বাড়ি আসিলেন। তখন বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ নাম দিয়া কতকগুলি বই বাহির করার কথা হইতেছিল। সেই বিষয়েই তিনি বাবার সঙ্গে কথা বলিতেছেন দেখিলাম। একটি পুস্তকের তালিকা হাতে করিয়া আসিয়াছিলেন, আমাকে পাশের ঘর হইতে উঁকি মারিতে দেখিয়া বাবাকে বলিলেন, 'এইবার আমার সেক্রেটারিকে বলুন এটা নকল করে দিতে, কোনটি যে সেক্রেটারি তা তো ঠিক জানিও না।'

আমাদের সাহিত্যসভা হইতেই আবার একদিন প্রস্তাব উঠিল, শুধু মেয়েদের লইয়া একটা অভিনয় করিতে হইবে। ছেলেদের অভিনয় তো নিত্যই হইতেছে, মেয়েদের একটা-কিছু করা উচিত। স্থির হইল 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অভিনয় করা হইবে, কারণ সবই মেয়ের ভূমিকা। আমার অভিনয় করা জিনিসটা কোনোদিন ধাতে নাই, কাজেই বড়ো কোনো পার্ট লইতে রাজি হইলাম না। অতএব যতো ঝি বা বাঁদির পার্ট ছিল, সবই আমার ঘাড়ে চাপিল। দিন-কতক খালি কে কি সাজিবে, কে কি পরিবে, কে কি করিবে, ইহা ছাড়া আর কোনো আলোচনাই হইল না। 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'খানা হাতে হাতে ঘুরিতেও লাগিল। হঠাৎ কেমন করিয়া জানি না খবর গিয়া পৌঁছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে। দোতলার ঘরে সকলের ডাক পড়িল রিহার্সাল দিবার জন্য। আদেশ অমান্য করা যায় না, যাইতেই হইল, যদিও অতিশয় শঙ্কিতভাবে। একটু দেরিতে পৌঁছিলাম, গিয়া দেখি রিহার্সাল আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নিজের লিখিবার টেবিলের সামনে বসিয়া সকলের পার্ট বলা শুনিতেছেন এবং সংশোধন করিতেছেন। বড়ো পার্ট না নেওয়ার জন্য আমি সেদিনকার মতো বাঁচিয়া গেলাম। উপরি উপরি আরো দুই-তিনদিন গিয়া কবিবরের সময় নষ্ট করিয়া আসা গেল এবং কাতরভাবে দু-চার লাইন মুখস্থও বলা গেল। তিনি রোজই বইখানি পড়িয়া শুনাইতেন এবং সেই পাঠ শুনিবার লোভেই সকলে নিত্য গিয়া হাজির হইতাম। মালতীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন যিনি তিনি অতিশয় ভালোমানুষ, অমন ঝাঁঝালো ধারালো কথাগুলির ঠিক সুর তাঁহার মুখে আসিত না। রবীন্দ্রনাথ দুইদিন শুনিয়া,

তিনদিনের দিন আমাকে বলিলেন, 'সীতা, তোমাকে মালতী হতে হবে। ও কাজের জন্যে বেশ্ চট্‌পটে ধারালো লোকের দরকার।' আমি হাসিয়া ফেলাতে বলিলেন, 'ভেবো না যে আমি তোমার স্বভাবের সমালোচনা করছি, কিন্তু কি জানি কেন তোমার একটা reputation দাঁড়িয়ে গিয়েছে, সবাই আশা করছে যে তুমি পারবে। যা act করতে হবে, সেই রকমই যে হতে হবে তার কোনো মানে নেই। এই দেখো-না, আমাকে ভালো পার্ট কেউ কখনো দেয় না, এমন-কি "অলীকবাবু" পর্যন্ত সাজিয়েছিল, অথচ মিথ্যা যে স্বভাবতই আমার মুখ দিয়ে বেরোয় তা নয়।'

রবীন্দ্রনাথ দুপুরবেলা যখন খাইতে বসিতেন তখন অনেক সময় সেখানে উপস্থিত থাকিতাম ; এক-একদিন অনেকে গিয়া জুটিতাম, ছোটো ঘরখানিতে চেয়ারের অভাব ঘটিয়া যাইত। কেহ আসিয়া বসিবার জায়গা না পাইলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিতেন এবং চাকরদের তীব্র কণ্ঠে তিরস্কার করিতেন। পাছে তাঁহার বিরক্তি-উদ্রেকের কারণ হই, এইজন্য ঘরে ঢুকিবার আগে প্রায়ই উঁকি মারিয়া দেখিতাম চেয়ার ক'খানা আছে, এবং মানুষই বা ক'জন।

একদিনের কথা মনে পড়ে, সেদিন কবি নানা বিষয়ে গল্প করিতেছিলেন। তখন সামান্যই খাইতেন, উপস্থিত সকলের সঙ্গে কথা বলিতেই সময় কাটিয়া যাইত। মারোয়াড়ীরা ঘিয়ে কি ভেজাল দেয়, মান্দ্রাজের লোকে কেন নারিকেল-তৈল দিয়া রন্ধন করে, মাথার চুলে কে কি তেল মাখে— কত বিষয়েই কথা হইল। সাঁওতাল মেয়েদের জীবনযাপন, জীবনযাত্রা-প্রণালীর সঙ্গে মানুষের চেহারার সম্পর্ক বিষয়েও আলোচনা হইল।

ঘিয়ের বিষয়ে গল্প হইতে হইতে একপালা ঝগড়াও হইয়া গেল, অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নয়। একজন তরুণী আর-একজনের নাম করিয়া বলিলেন, 'সে তো এই-সব ভেজালের কথা শুনে ঘিই খায় না।' বলিতে-না-বলিতে দ্বিতীয়া তরুণী আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, 'এই যে, তোমার কথাই হচ্ছিল, তুমি নাকি জাত যাবার ভয়ে ঘি খাও না?' তরুণীটি কিছু সরলপ্রকৃতির ছিলেন, তিনি তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ যেন কতই শঙ্কিত হইয়াছেন এমন মুখ করিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন, বলিলেন, 'বোসো, বোসো, এইখানে ব'সে ভালো ক'রে ঝগড়া করো।' বলিয়া তৎক্ষণাৎ উপরের ঘরে চলিয়া গেলেন। ঘিয়ের তর্ক সেদিন সন্ধ্যা অবধি চলিল।

বিকালবেলা কবি ছাদে বসিয়া একলাই গান ধরিয়াছেন দেখিয়া মীরা দেবীর সঙ্গে উপরে উঠিলাম গান শুনিতে। কিন্তু গান শোনা কপালে ছিল না, সেই সময় দিনেন্দ্রনাথের গান শেখানোর ঘণ্টা পড়িল ও গান আরম্ভ হইল। রবীন্দ্রনাথের মনে হইল একটি গানের সুরে কি যেন গোলমাল হইতেছে, তিনি তৎক্ষণাৎ ছাদ হইতে নামিয়া গানের ক্লাসে চলিয়া গেলেন। আর-একদিন তাঁকে মেয়েদের সাহিত্যসভায় ডাকা হইল কিছু উপদেশ দিতে। শুধু তো সভাপতির অভিভাষণ দিয়া সভা হয় না, তাই বালিকা নুটু সেক্রেটারি হিসাবে মস্ত এক রিপোর্ট লিখিয়া রাখিল। সেইটি পড়া হইবে, তাহার পর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার

বক্তব্য বলিবেন। সভা সচরাচর নিচুবাংলাতেই হইত, সেদিন কিন্তু সভাপতি সকলকে তাঁহার ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমরা গিয়া দোতলায় উঠিতে-না-উঠিতে ঝম্‌ঝম করিয়া বৃষ্টি নামিল, সভা ভালোই হইল। মেয়েদের কাজের আদর্শ কি হওয়া উচিত, সেই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ কথা বলিলেন। অন্যান্য অধিবেশনে গান হইত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে গান করিতেও সেদিন কেহ রাজি হইলেন না। রিপোর্টটা অবশ্য পড়া হইল।

এ ঘটনাগুলি সবই প্রায় ১৯১৭ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের। একদিন দিনুবাবুর গানের ক্লাসের পর সেইখানেই বসিয়া রবীন্দ্রনাথ "সংগীত" নামে একটি প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইলেন। অনেকগুলি গান তাহাতে ছিল, সব ক'টি নিজেই গাহিয়া শুনাইলেন। আর-একদিন ছেলেদের সাহিত্যসভায় সভাপতির কাজ করিতে গেলেন। ছেলেরা লজ্জা পায় না মেয়েদের মতো অত সহজে, তাহারা গানও গাহিল, আবৃত্তিও করিল, কবিতা ও গল্পও পড়িয়া শুনাইল। সতীশ রায় নামক একটি ছেলে বেশ ভালো একটি কবিতা পড়িয়াছিল। সভাপতি সাহিত্যের আদর্শ বিষয়ে ছোটো একটি বক্তৃতা দিলেন। শেষে 'জনগণমন-অধিনায়ক' গাহিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

আমাদের 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অভিনয় শেষ পর্যন্ত ঘটিয়া উঠিল না। রবীন্দ্রনাথও এই সময় কলিকাতা চলিয়া আসিলেন। অক্টোবরের মাঝামাঝি আর-একবার শান্তিনিকেতনে আসিলেন এবং কলিকাতায় ফিরিলেন নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে।

১৪ নভেম্বর বিচিত্রায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। সেদিন আমার নিজের ছিল অসুখ এবং বাবা ছিলেন অন্য কাজে ব্যস্ত। তবু অনেক কষ্টে বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মেয়েদের জন্য একটি আলাদা প্রবেশ-পথ খোলা হইয়াছে দেখিলাম। তখনো বেশি কেহ আসেন নাই, দুই-চারিজন পরিচিত যাঁহারা ছিলেন, বসিয়া বসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলাম। অন্যান্য বারে মেঝের উপর ফরাশ পাতিয়া দিশি দস্তুরে বসা হইত, এইবার কি জন্য জানি না, দেখিলাম চেয়ার সাজাইয়া বসিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

প্রবন্ধটি বড়ো ছিল, পড়িতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগিল। গান হয় নাই। শ্রোতাদের ভিতর উপন্যাস-লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দেখিলাম। বেশভূষা ধরনধারণ সবই অত্যন্ত সাদাসিধা।

রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করিতে গেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা আবার কবে শান্তিনিকেতনে যাইতেছি। 'শ্রেয়সী'র খোঁজও একবার করিলেন। ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা শান্তার বিবাহ ছিল তাহার পরের দিন। শান্তার জ্যেষ্ঠা দুই ভগিনী এই সভায় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কবিকে বিবাহে যাইতে অনুরোধ করায় তাঁহাদের সঙ্গে একটু হাস্য-পরিহাস করিলেন, বিবাহ-সভায় তাঁহার কিরূপ অভ্যর্থনা প্রয়োজন সেই বিষয়ে। গাড়ি আসিতে দেরি ছিল, সে সময়টা বিচিত্রার একতলায় রক্ষিত নানারকম বই ও ছবি দেখিয়া কাটাইয়া দিলাম।

পরদিন শ্রীমতী শান্তার বিবাহ-সভায় রবীন্দ্রনাথকে দেখিলাম। বরকন্যার আসনের সম্মুখেই তাঁহাকে আনিয়া বসানো হইয়াছিল। তাঁহার পাশেই বসিয়াছিলেন বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়। দুই বন্ধুতে খুব গল্প করিতেছিলেন। বিবাহান্তে গায়িকাদের কাছে গিয়া গানের কিঞ্চিৎ সমালোচনা করিলেন। তাহার পর চলিয়া গেলেন।

২১ নভেম্বর আবার বিচিত্রায় ডাক পড়িল। বিষয় দেখিলাম, 'সংগীত ও সদালাপ।' সংগীত অনেকগুলি শুনিলাম, কয়েকটি গাহিলেন দিনেন্দ্রনাথ, বাকিগুলি অজিতকুমার চক্রবর্তী। সদালাপ যাহা হইল তাহা এত মৃদুকণ্ঠে যে বেশির ভাগ শুনিতেই পাইলাম না। রবীন্দ্রনাথ প্রায় সমস্তক্ষণ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলিয়া সময় কাটাইয়া দিলেন। তাঁহাদের কথাবার্তার ছিটাফোঁটা যাহা কানে আসিল তাহাতে বুঝিলাম যে, সাহিত্যের ভাষা সাধু হওয়া উচিত, না কথ্য হওয়া উচিত, এই বিষয়ে কথা হইতেছে। ভালো করিয়া কিছু শুনিতে না পাওয়ার দুঃখে, শেষ অবধি না বসিয়া, মাঝপথে উঠিয়া বাড়ি চলিয়া আসিলাম।

নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে আমরা আবার শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গেলাম। দুই-তিনদিন পরে রবীন্দ্রনাথও প্রতিমা দেবীকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতা হইতে ফিরিলেন। প্রতিমা দেবী অতিথিশালার বাড়িতে রহিলেন, কবি নিজের ছোটো বাড়িটিতেই আসিয়া উঠিলেন।

পৌঁছিয়াই এক কৌতুকপ্রদ ঘটনার আভাস পাইলাম। আশ্রমের এক অধ্যাপক-পত্নী কিছু অসাবধান ছিলেন। বাসনকোসন রাত্রেও বাহিরে ফেলিয়া রাখিতেন। তাঁহাকে একটু জব্দ করিবার জন্য কয়েকজন মহিলা যুক্তি করিয়া রাতারাতি বাসনগুলি সরাইয়া রাখেন। গিয়া দেখিলাম এই ভয়াবহ চুরি লইয়া ঘোর আলোচনা চলিতেছে প্রতি বাড়িতে। সখীদের কাছে আসল ব্যাপার জানিতে পারিলাম শীঘ্রই, এবং বাসনও একদিন অদৃশ্য থাকিয়া পরেরদিন যথাস্থানে ফিরিয়া গেল। শুক্লপক্ষ তখন, চারি দিকে চাঁদের আলোর জোয়ার, এ-হেন সময়ে কোন চোর ভরসা করিয়া চুরি করিতে আসিল, ইহা আশ্রমের অনেকেই ভাবিয়া পাইল না।

রবীন্দ্রনাথ যেদিন আসিলেন সেদিন বিকালে তাঁহার সঙ্গে একবার দেখা হইল। বলিলেন, 'সীতা, তোমরা কখন সব পালিয়ে এলে, এদিকে কত কি হয়ে গেল। আমি জানতুমও না যে তোমরা এখানে চলে এসেছ, পরে খোঁজ করে জানলুম।'

সন্ধ্যার সময় অনেকদিনই দেখিতাম আশ্রমের পথগুলিতে বা সামনের রাঙা মাটির পথে বেড়াইতেছেন। সেদিনই সন্ধ্যায় যখন আমরা বেড়াইয়া ফিরিতেছি তখন দেখিলাম আশ্রমের অনেকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সামনের রাস্তাটিতে বেড়াইতেছেন। আমাদের দেখিয়া বলিলেন, 'বেড়ানো ভালো, কিন্তু ঠাণ্ডা লাগানো ভালো নয়।'

একদিন বিকালে চা খাইবার সময় হঠাৎ গিয়া পড়িয়াছিলাম। আমাকে বসিতে বলিলেন, চা খাইতেও বলিলেন, অবশ্য সে অনুরোধটা পালন করিলাম না। তাঁহার সামনে খাওয়া তখন আমার কাছে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। দৌহিত্রীর আমাশা

হইয়াছিল, একখানি হোমিওপ্যাথিক পুস্তক খুলিয়া তাহার জন্য ঔষধ বাছিতেছিলেন। আর-একখানা বই দরকার হওয়ায় চাকরকে উপর হইতে সেই বইখানি লইয়া আসিতে বলিলেন। সে বার-পাঁচ-ছয় ওঠানামা করিয়াও ঠিক বইখানি আনিতে পারিল না। চাকরশ্রেণীর জীবদের বিষয় কিছু কথা বলিলেন। আমার গল্প লেখা সম্বন্ধেও খোঁজ করিলেন। আমার সাহিত্যচর্চার খবর প্রায়ই লইতেন, তবে কোনো লেখা কখনো পড়িয়াছেন কী না ইহা আমি কোনোদিনই জিজ্ঞাসা করি নাই। তাঁহার সম্মুখে নিজের লেখার উল্লেখ করিতেই লজ্জা করিত। আমি প্রথম যখন লিখিতে আরম্ভ করি তখন "পথের দেখা" নামে ছোটো একটি গল্প লিখিয়াছিলাম। এই গল্পটির তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন। আরো বলিয়াছিলেন, 'অতো শাড়ির বর্ণনা তো আমি হলে দিতে পারতুম না।' নিজে একদিন 'পাত্র ও পাত্রী' বলিয়া একটি গল্প পড়িয়া শুনাইলেন। গল্পটিতে একশ্রেণীর মেয়ের সম্বন্ধে কিছু তীব্র মন্তব্য ছিল। পড়া শেষ হইলে আমাকে বলিলেন, 'সীতা, তোমাদের বুদ্ধি সম্বন্ধে অনেক remarks আছে, ওগুলো seriously নিয়ো না যেন।'

বুধবার মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ উপাসনা করিলেন। ছেলেরা গান গাহিল। এই কয়েকদিন তাঁহাকে লেখার কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত দেখিতাম। শুনিলাম কলিকাতা হইতে গগনেন্দ্রনাথ তাঁহাকে টেলিগ্রাম করিয়াছেন যে Montague সাহেব তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে চান। বুঝিলাম দুই-চারিদিনের মধ্যেই কবি আবার কলিকাতা চলিয়া যাইবেন।

সন্ধ্যার সময় একদিন কমলা দেবীদের বাড়ি গিয়া দেখি সেখানে খুব গল্প হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ সেইখানে বসিয়া আছেন। কয়েকদিন আগে কলিকাতায় বসুবিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল, কমলা দেবী তাহারই গল্প করিতেছিলেন, কারণ তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বসু-মহাশয়ের ছাত্রেরা খুব করতালি দিয়াছিল এবং একজন জগদীশচন্দ্রকে নিজের গলার মালা খুলিয়া পরাইয়া দিয়াছিল শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'হাততালিই যদি না দেবে তো ছাত্র কিসের? এই আমার ছেলেরাই বড়ো হোক না, তখন দেখবে।' কমলা দেবীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'আমিও ভাবছি শীগগিরই এখানে একটা মালা-বদলের আয়োজন করব, কিন্তু সেটা ছাত্রের সঙ্গে নয়, আমি অত বোকা নই।'

বিজ্ঞানমন্দির-প্রতিষ্ঠার দিনে দিনেন্দ্রনাথ অনেক দেরিতে কার্ড পাইয়াছিলেন এবং তাহাতে কিরূপ মর্মাহত হইয়াছিলেন তাহা লইয়াও কবি খানিক রসিকতা করিলেন। দিনেন্দ্রনাথ সচরাচর মেয়েদের মজলিশের ভিতর আসিতেন না, কিন্তু এইবার বারান্দা হইতে বলিয়া উঠিলেন, 'রবিদাদা মিথ্যে আমার বদনাম রটাচ্ছেন।'

'শ্রেয়সী'র কথা উঠিল। কোনো-একটা লেখায় বানান ভুল ছিল, তাহার উল্লেখ করাতে একটি তরুণী বলিলেন, 'আমরাও এবার ছেলেদের লেখার সমালোচনা করব।' রবীন্দ্রনাথ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, 'বেশি কিছু লিখতে যেয়ো না, তাতেও বানান ভুল হবে।'

৭ ডিসেম্বর বিকালের ট্রেনে তিনি কলিকাতা গেলেন। সকালে আমরা একদল অধ্যাপকদের বাড়ি বাড়ি ঘুরিতেছিলাম একটা কাজের ব্যাপারে। ৭ই পৌষের উৎসবের সময় মেয়েদের একটি আনন্দবাজার হইবে স্থির হইয়াছিল, তাহাতে 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অভিনয় করার কথা আর-একবার উঠিল। তবে এবার আর তরুণী বা মহিলাদের ডাক পড়িল না, স্থির হইল বালিকাদের দ্বারাই কাজ চালাইতে হইবে। সকলের বাড়ি ঘুরিয়া তাই অভিনেত্রী সংগ্রহ করা হইতে লাগিল। জগদানন্দ রায় মহাশয়ের বাড়ি হইতে বাহির হইয়াই রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে পড়িলাম। তিনি দাঁড়াইলেন দেখিয়া আমরাও সেখানে দাঁড়াইয়া গেলাম। অদূরে গাছতলায় বসিয়া সন্তোষবাবু ক্লাসে পড়াইতেছিলেন, তিনিও উঠিয়া পড়িলেন। রবীন্দ্রনাথ খবর দিলেন যে, আগামী সোমবারে মণ্টেগু-সাহেব, লেডি চেমসফোর্ড প্রভৃতি জোড়াসাঁকোয় ভারতীয় সংগীত শুনিতে আসিবেন, সুতরাং তাঁহার ডাক পড়িয়াছে। দিনেন্দ্রনাথকেও তাঁহার সঙ্গে যাইতে হইবে। মীরা দেবী আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তিনি বলিলেন, 'দিনুর যে ক্লাস আছে।' রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'তার কাজটা সীতা ক'রে দেবে।' ক্রমাগত যাওয়া-আসা করা অতি বিরক্তিকর, এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। দুপুরবেলা অধ্যাপকদের সভা হইতেছে দেখিলাম, সেখানেও কবি উপস্থিত। বিকালে তাঁহার বাড়ির সামনে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে দেখিয়া বিদায় লইবার জন্য সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি কয়েক মিনিটের মধ্যেই উপর হইতে নামিয়া আসিলেন। অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিতে আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, 'চললুম সীতা। আশ্রমের শাসনকার্যের যাতে কোনো ত্রুটি না হয়, সে-বিষয়ে তোমার উপর ভার রইল। শান্তার উপর আমার তেমন ভরসা নেই, এ তুমিই ঠিক পারবে, আমি আমার সর্বাধ্যক্ষকে ব'লে যাচ্ছি।' গাড়িতে উঠিবার আগে পর্যন্ত এই রসিকতাই নানাভাবে করিলেন, উপস্থিত সকলে তো হাসিয়া অস্থির। এমন সময় একটি অতি ক্ষুদ্র বালিকা, বোধ হয় সন্তোষবাবুর ভাগিনেয়ী, আসিয়া পরম গম্ভীরভাবে দিনেন্দ্রনাথকে প্রণাম করিয়া এবং রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া সকলের হাসির স্রোতটা অন্য দিকে ঘুরাইয়া দিল। দিনেন্দ্রনাথ যে ছেলেদের কিরকম বিদ্যা দান করিয়াছেন তাহা এইবার সীতার কাছে ধরা পড়িয়া যাইবে বলিয়া তাঁহাকে খেপাইতেও কবি ছাড়িলেন না। অতঃপর সদলে প্রস্থান করিলেন। সমরেশ, বুনী প্রভৃতি কয়েকটি সুকণ্ঠ ছেলেও তাঁহাদের সঙ্গে গেল।

সন্ধ্যাবেলাটা একান্ত শূন্য ঠেকাতে ভুবনডাঙা গ্রাম দেখিতে যাওয়ার প্রস্তাব উঠিল। মীরা দেবী আমাদের পথ দেখাইয়া লইয়া গেলেন। তাঁহাদেরই পরিবারের এক পুরাতন ভৃত্যের বাড়িতে গিয়া হাজির হইলাম। গ্রামটি মন্দ লাগিল না। যে বাড়িতে ঢুকিলাম, তাহারা সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া মাটির দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিতে দিল। অন্ধকার ঘরের ভিতরে নূতন অনেকগুলি স্টীল ট্রাঙ্ক চকচক করিতেছে দেখিলাম। মীরা দেবী পরে বলিয়াছিলেন, শুধু ট্রাঙ্ক নয়, রবীন্দ্রনাথের বাড়ির অনেক তৈজসপত্রই ভৃত্যবর নিজের ঘরে আনিয়া তুলিয়াছেন। বাড়ির দুইজন বউ পান সাজিয়া আনিয়া দিল। অন্ধকার হইয়া আসিতেছে দেখিয়া গ্রামেরই একটি বালকের সাহায্যে বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

১৩ ডিসেম্বর কবি আবার শান্তিনিকেতনে আসিয়া পৌঁছিলেন। ৭ই পৌষের উৎসব শেষ হওয়া পর্যন্ত আশ্রমে থাকিলেন, তাহার পর কলিকাতায় আসিলেন কংগ্রেসে যোগ দিতে। ১৯১৭-র ডিসেম্বরের শেষে এই অধিবেশন হয়।

বহুদিন ধরিয়া শান্তিনিকেতনে যাওয়া-আসা থাকিলেও ৭ই পৌষের উৎসব এতদিন দেখি নাই, এই প্রথম দেখিলাম। তখন প্রচণ্ড শীত, বাহির হইলে মনে হইত ঠাণ্ডা বাতাস যেন তীরের মতো দেহকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করিয়া বিঁধিতেছে। শৈশবে এলাহাবাদে ছিলাম, সেখানে প্রচণ্ড শীত সহ্য করা অভ্যাস ছিল কিন্তু বহুদিন কলিকাতায় বাস করিয়া সে অভ্যাস হারাইয়াছিলাম। শান্তিনিকেতনের শীতে বড়োই কষ্ট হইত, কিন্তু রক্তের জোর ছিল তখন, কষ্টটা সহজেই উপেক্ষা করিতাম।

কলিকাতা হইতে উৎসব উপলক্ষে অনেক অতিথি আসিয়াছিলেন। আমরা এবার আর আগন্তুকের দলে নয় মনে করিয়া বড়োই আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়াছিলাম। ৭ই সূর্যোদয়েরও আগে মন্দিরে উপাসনা হইবে শুনিয়াছিলাম, তাই প্রায় রাত থাকিতেই উঠিয়া পড়িলাম। যথাসাধ্য শীতবস্ত্রে নিজেকে আবৃত করিয়া বাহির হইয়া দেখিলাম, তখনো ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায় না। একটু এদিক-ওদিক ঘুরিয়া সময় কাটাইলাম। যখন দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ উপরের ঘর হইতে নামিয়া মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন তখন তাঁহার পিছন পিছন চলিলাম। তিনি অবশ্য এত জোরে হাঁটিতেন যে, বেশিক্ষণ তাঁহার সঙ্গে থাকিতে পারিলাম না, পিছাইয়া পড়িলাম। পথে নেপালবাবু ও অন্যান্য দু-চারজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। মন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, মেয়েদের বসিবার স্থান এবার আচার্যের সামনের দিকে হইয়াছে, এতকাল পিছনেই হইত। ঠাণ্ডা কনকনে পাথরের মেঝের উপর বসিয়া মনে হইল যেন সর্বাঙ্গ জমিয়া গেল। কয়েকজন পরিচিতা মহিলা কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন দেখিলাম। প্রথম গান হইল, 'বিমল আনন্দে জাগো রে'। পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী একলাই গানটি গাহিলেন। দ্বিতীয় গানটি রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন। অন্য গানগুলি দিনেন্দ্রনাথ ও ছেলেরা মিলিয়া করিলেন। উপাসনা আজ পূর্ণাঙ্গ হইল —উদ্‌বোধন, স্বাধ্যায় ও উপদেশ। উপাসনান্তে বিদ্যালয়ের ছেলেরা ও অতিথিরা রবীন্দ্রনাথকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। বুঝিলাম এখন তাঁহার কাছে যাইবার পথ পাইব না, অন্য সুযোগের অপেক্ষা করিতে হইবে। কলিকাতা হইতে পরিচিতা যাঁহারা আসিয়াছিলেন, দাঁড়াইয়া তাঁহাদের সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলাম।

ভিড় কমিয়া যাইবার পর ফিরিয়া চলিলাম। দেখিলাম কবি তখনো তাঁহার উপরের ঘরে উঠেন নাই, নীচেই দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে প্রণাম করিতে না পাইলে কখনো কোনো উৎসবকে উৎসব বলিয়া বোধ হইত না। সুযোগ দেখিয়া দুই বোনে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিলাম।

বাড়ি আসিয়া জলযোগাদি সারিয়া অতিথিশালায় চলিলাম, কলিকাতা হইতে আগত মানুষগুলির সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিতে। মাঝপথে দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ সেইখান হইতেই ফিরিতেছেন ; আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মেয়েরা কোথায়?' আমি তাঁহাদের

খোঁজ জানিতাম না, সুতরাং দিতেও পারিলাম না। তিনি ফিরিয়া চলিয়া গেলেন, আমি অতিথিদের সন্ধানে চলিলাম নিচুবাংলায়। সেখানেও তাঁহাদের পাইলাম না। হেমলতা দেবী তখন অত্যন্ত ব্যস্ত, কলিকাতা হইতে তাঁহার নাতি-নাতনীর দল আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। সেখানে খানিকক্ষণ বসিয়া বাড়ি ফিরিলাম, দেখি অতিথির দল আমাদেরই ঘরে বসিয়া আছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের সন্ধানে গিয়াছিলেন শুনিয়া তাঁহারা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, তখনি কবির কাছে যাওয়া যায় কি না তাহার খোঁজ লইতে আরম্ভ করিলেন। যাহা হউক, এই সময় শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ আসিয়া খবর দিলেন যে, খাওয়া-দাওয়ার পর কবি আবার শান্তিনিকেতন-ভবনে যাইবেন। মেয়েরা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন। খানিক গল্প হইল, খানিক মেলায় ঘোরা হইল। ১৩৪৬ সালে মেলা যেমন দেখিলাম, তখন ইহার চেয়ে জমিত অনেক বেশি। লোকজনও আসিত ঢের। দুই-চারিটি ছোটোখাটো জিনিসও কেনা গেল। বেলা অনেক হইয়া যাওয়ার পর বাড়ি ফিরিয়া গেলাম স্নানাহার করিতে। সে-সব সারিয়া আবার অতিথিদের সন্ধানে চলিলাম। অতিথিশালার উপরে নীচে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া ও বসিয়া গল্প করা গেল, কিন্তু কবি তখনো আসিয়া পৌঁছিলেন না। দুই-তিন বার দূত পাঠানোর পর, যখন সকলে প্রায় হাল ছাড়িয়া দিয়াছি, তখন রবীন্দ্রনাথ আসিয়া পৌঁছিলেন। মহিলাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারা কী শুনিতে চান। মহিলাদের হইয়া কালিদাসবাবু বলিয়া দিলেন যে কবি যে নূতন ইংরেজি কবিতাগুলি লিখিয়াছেন তাহাই তাঁহারা শুনিতে চান। অনেকগুলি কবিতা পর পর রবীন্দ্রনাথ পড়িয়া শুনাইলেন। বাংলা কোন কবিতার অনুবাদ, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তিনি পড়িবার আগেই বলিয়া আরম্ভ করিয়াছিলেন, 'আজ তোমাদের ঠকাব।' যে খাতাখানি হইতে পড়িতেছিলেন তাহার উপরে লেখা দেখিলাম Crossing, কিন্তু কবিতাগুলিকে মোটেই 'খেয়া'র কবিতা বলিয়া বোধ হইল না। কবিতা পড়ার মধ্যেই একদল মারাঠি, মান্দ্রাজি, গুজরাটি ও পাঞ্জাবি অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহিলাও তাঁহাদের ভিতর দুই-চারিটি ছিলেন। আমরা এইবার সরিয়া পড়ার চেষ্টা করিলাম। রবীন্দ্রনাথ তাহা দেখিয়া বলিলেন, 'পালাচ্ছ কেন? হার মানতে নেই।' যাহা হউক, পালানো তখন অদৃষ্টে ছিল না, দরজা অবধি গিয়া ফিরিয়া আসিলাম। আমাদের স্বজাতীয়াও গুটি-তিন-চার আছেন দেখিয়া তাঁহাদের কাছে গিয়া বসিলাম। একটি সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে অল্পক্ষণের ভিতরেই ভাব হইয়া গেল। তাঁহার নাম শুনিলাম ভানুমতী। কবি হিন্দি ভালো বলিতেন না। সুতরাং ভদ্রলোকদের সঙ্গে ইংরেজিতেই কথা বলিতে লাগিলেন, তাঁহাদের মারফতে মেয়েদের কাছেও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া লইলেন, তাঁহাদের সঙ্গে কথা না বলিতে পারার জন্য। গুজরাটি পরোটার খুব প্রশংসা করিলেন, মেয়েরা বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। Manchester Guardian-এ পাঠাইবার জন্য তখন রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা এবং প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, সেইগুলি নবাগতদের পড়িয়া শুনাইলেন। তাহার পর নানা বিষয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা চলিল, অতঃপর সভা ভঙ্গ হইল। বাহিরে দাঁড়াইয়া খানিক গুজরাটি মেয়েদের সঙ্গে কথা বলা গেল। তাঁহাদের সঙ্গী ভদ্রলোকরা এই সময় আসিয়া জুটিলেন।

আমাদের পরিচয় পাইয়া সকলেই বাবার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সকলকে পথ দেখাইয়া বাড়িতে লইয়া আসিলাম এবং বাবার কাছে ভিড়াইয়া দিয়া সরিয়া পড়িলাম। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী উৎসবের জন্য আমাদের দুইখানি শাড়ি উপহার পাঠাইয়াছেন দেখিয়া খুব খুশি হইয়া উঠিলাম। নূতন শাড়ি পরিয়াই বিকালে বাহির হইলাম এবং প্রথমেই একবার নিচুবাংলায় ঘুরিয়া আসিলাম। তাহার পর গেলাম মীরা দেবীর ঘরে। রবীন্দ্রনাথ দেখিলাম তখন চা খাইতে বসিয়াছেন। আমাকে দেখিয়া Christmas-cake খাওয়াইতে চাহিলেন, তখনি খাইয়া আসিয়াছি বলিয়া এড়াইয়া গেলাম। তাঁহার সামনে খাইতে তখনকার দিনে কিছুতেই পারিতাম না। গুজরাটি মেয়েগুলির কথা উঠিল। বলিলেন, 'ভানুমতী মেয়েটি বেশ দেখতে।' কিছুদিন আগেই শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী অসুখ হইতে উঠিয়াছিলেন, তবুও এবারকার 'শ্রেয়সী'তে অনেকগুলি কবিতা দিয়াছেন এই কথা শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'অসুখের সময়ই তো মানুষ কবিতা লেখে, আমার শরীর যদি চিরকাল ভালো থাকত তা হলে কি ভেবেছ আমি অত কবিতা লিখতুম? অমন কাণ্ড মানুষ সুস্থ শরীরে করে না।' কমলা দেবী 'শ্রেয়সী'তে দিবার জন্য একটি গল্প লিখিয়াছেন শুনিয়া অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করিলেন। গল্পের প্লটের মধ্যে বিবাহ বা বিবাহ-ভঙ্গ একটাও নাই শুনিয়া বলিলেন, 'তুমি কোনো কর্মের নয়, বিয়ে একটা দিয়ে দিতে পারলে না?' প্রতিমা দেবী বলিয়া দিলেন যে গল্পের নায়ক একজন কবি। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত চটিবার ভান করিয়া বলিলেন, 'এ নিশ্চয় আমাকে লক্ষ্য ক'রে লেখা, যাও তোমার সঙ্গে আর কথা নয়', বলিয়া যেন রাগ করিয়াই উঠিয়া উপরে চলিয়া গেলেন।

এই 'শ্রেয়সী' কাগজটি লইয়া কত রঙ্গ-রহস্যের যে সৃষ্টি হইত তাহা এখনো মনে আছে। দিদি কিছুদিন ইহার সম্পাদিকা ছিলেন। একদিন দুপুরবেলা রবীন্দ্রনাথ দেখিলেন যে দিদি কয়েকটি লেখা সংগ্রহ করিয়া নীচের পথ দিয়া যাইতেছেন। উপর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, 'শান্তা, এই দারুণ রোদে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছ লেখার জন্যে, আর আমাকে একেবারে অবজ্ঞা ক'রে চ'লে যাচ্ছ? আমি কি শ-এর [১] চেয়েও খারাপ লিখি?'

৭ই পৌষ সন্ধ্যার সময় আর শান্তিনিকেতনকে চিনিবার জো রহিল না। লোকে লোকারণ্য ; মাঠ, পথ-ঘাট সবেরই যেন চেহারা অন্যরকম দেখাইতে লাগিল। আশেপাশের গ্রামের লোক আসিয়া আশ্রমের ভিতরের পথগুলিতেও দলে দলে ঘুরিতে লাগিল। সব-কিছুই তাহাদের কাছে দেখিবার জিনিস। আজ আর একলা যেখানে খুশি ঘুরিয়া বেড়ানো যাইবে না, তাহা বুঝিতেই পারিলাম। শুনিলাম অন্যান্য বার রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সব আশ্রমবাসিনীদের সঙ্গে করিয়া মন্দিরে লইয়া যান। এবারেও তিনি প্রস্তুতই ছিলেন, মেয়েরা সকলে একত্রে জুটিতে এত দেরি করিলেন যে অবশেষে তিনি একলাই চলিয়া গেলেন। আমরা আরো খানিক দেরি করিলাম, শেষে যখন মন্দিরের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল

১। একটি তরুণী বধূ।

তখন বিনা অভিভাবকেই একরকম ছুটিয়া গিয়া উপাসনার স্থানে উপস্থিত হইলাম। মন্দিরের চারি দিকে যে লোহার রেলিং-দেওয়া প্রাচীর, তাহার গেটগুলি এইবার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, বাজে লোকদের ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য। সমবেত সকলে ঠাসাঠাসি করিয়া মন্দিরের ভিতরেই বসিয়া গেলেন, দরজাগুলিও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, কারণ বাহির হইতে বড়োই গোলমালের শব্দ আসিতেছিল। ধূপধুনার গন্ধে ঘরের ভিতরটি আমোদিত। সমরেশ প্রভৃতি কয়েকটি ছোটো ছেলের ঘুম পাইয়া যাওয়াতে রাত্রে গান তত জমিল না, তবে রবীন্দ্রনাথের উপদেশ সকলে বসিয়া মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনিলাম। উপাসনার পর বাজি পোড়ানো দেখিবার জন্য দল জোটানো গেল। কিন্তু কোথা হইতে যে দেখা যাইবে তাহা স্থির করিতেই অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। এখন যেখানে উত্তরায়ণ অবস্থিত সেইখানেই তখন মেলা হইত। এক পাশে মেথরদের কয়েকটা কুঁড়েঘর ছিল। তাহারই পাশে দাঁড়াইয়া বাজি পোড়ানো দেখা গেল। ত্রিপুরা রাজবংশের একটি যুবক, নাম সোমেন্দ্র দেববর্মা, তিনিই আমাদের প্রহরী হইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিছু পরে সন্তোষবাবুও আসিয়া জুটিলেন। বাজি অনেকরকম হইল— সাপ-বাজি, মন্দির-বাজি, চরকি-বাজি প্রভৃতি। তুবড়ি, পটকাও প্রচুর ফুটিল। আধ ঘণ্টার ভিতর সব শেষ হইল। আমরা কয়েকটি বলবান ছাত্রের সাহায্যে ভিড় ঠেলিয়া আবার আশ্রমের গণ্ডির ভিতর ফিরিয়া আসিলাম। একটি নেপালি ছাত্রকে খুব বেশি মনে পড়ে, তাহার নাম ছিল নরভূপ। শারীরিক শক্তির যেখানেই প্রয়োজন হইত, সে-ই সর্বাগ্রে অগ্রসর হইয়া আসিত। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় বলিয়া আর-একটি ছেলের কথা মনে পড়ে। ক্ষিতিমোহনবাবুর দুই ভ্রাতুষ্পুত্র বীরেন এবং ধীরেন, ইঁহারাও সকল কাজে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিতেন।

ফিরিবার পথে শালবীথিকার ভিতর আর একবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হইল। বাজি পোড়ানো কেমন দেখিলাম তাহার খোঁজ করিলেন। তাহার পর আমাদের প্রণাম গ্রহণ করিয়া অতিথিশালার দিকে চলিলেন মহিলা-অতিথিদের খোঁজ লইবার জন্য। বলিলেন, 'যাই একবার অতিথিসেবা ক'রে আসি।' ৭ই পৌষের শেষ হইল তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া, পূর্ণহৃদয়ে বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

৮ পৌষ সকালে উঠিয়া দেখিলাম বাড়ির চাকরবাকর সবাই অনুপস্থিত। আগের দিন সন্ধ্যায় হইতে সবাই ছুটি পাইয়াছিল আমোদে যোগ দিবার জন্য, আমোদটা এমন পরিপূর্ণভাবে করিয়াছে যে সকালে আর তাহাদের দাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই। অনেক কষ্টে নিজেরাই কাজকর্ম খানিক খানিক সারিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। উপাসনা আরম্ভ হইতে তখনো দেরি ছিল দেখিয়া কলিকাতার বন্ধুদের আড্ডায় উপস্থিত হইলাম, সেখানে বসিয়া অনেকক্ষণ গল্প করা গেল।

এই দিন উপাসনা হইল ছাতিমতলায়, মহর্ষির বেদীর কাছে। ইহা আশ্রমের বার্ষিক সভাও বটে। প্রথমে গান ও উপাসনা হইল, তাহার পর সভার অধিবেশন। বাবা সভাপতি হইয়াছিলেন। পুরাতন ছাত্রের দল সার বাঁধিয়া সভায় প্রবেশ করিলেন। বার্ষিক রিপোর্ট পড়ার সময় আর সর্বাধ্যক্ষকে কিছুতেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পরে পরে অনেকগুলি

দূত গেল তাঁহার সন্ধানে, ততক্ষণ ক্রমাগতই গান চলিতে লাগিল। সপ্তপর্ণীর পাতার ফাঁকে ফাঁকে গায়ে রোদ আসিয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু তখন শীত এমন যে ঐটুকু রোদে কোনোই কাজ হইল না।

যাহা হউক, সর্বাধ্যক্ষ আসিলেন, রিপোর্টও পড়া হইল। রবীন্দ্রনাথ তাহার পর ছোটো একটি বক্তৃতা করিলেন। সভা-ভঙ্গের পর ছেলের দল, 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গাহিতে গাহিতে সমস্ত আশ্রম প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। আমরা ফিরিয়া চলিলাম। অধ্যাপকদের কুটিরগুলির কাছাকাছি যখন আসিয়াছি তখন আর-এক দিক হইতে রবীন্দ্রনাথ, বাবা এবং নেপালবাবু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মহিলা-অতিথিও কয়েকজন আসিয়া জুটিলেন। মেয়েদের জন্য এখানে একটি স্কুল করার কথা উঠিল। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'মেয়েদের জন্যেও একটি স্কুল তো আমি খুবই করতে চাই, কিন্তু তার পথে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে মেয়েদের এবং শিক্ষয়িত্রীদের মান-অভিমানের পালা।' একবার এ চেষ্টা তিনি করিয়াও ছিলেন, তখন নাকি মাঝে মাঝে ছাত্রী এবং শিক্ষয়িত্রী পরস্পরের উপর রাগ করিয়া তিন-চারদিন মুখ ফিরাইয়া বসিয়া থাকিতেন। কথাটা অবশ্য রসিকতা করিয়াও বলিয়া থাকিতে পারেন। এই সময় কলিকাতা হইতে কংগ্রেস সম্বন্ধীয় কী একটা টেলিগ্রাম আসিয়া পড়াতে তিনি উত্তর দিবার জন্য তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। দুপুরবেলা স্পোর্টস্ ছিল, অনেকক্ষণ মাঠের মধ্যে বসিয়া খেলা দেখা গেল। অতঃপর কলিকাতার অতিথিরা বিকালের গাড়িতে প্রস্থান করিলেন।

রাত্রে নিচুবাংলায় 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অভিনয় হইল। মেয়েদের সাজসজ্জা খুবই ভালো হইয়াছিল, অভিনয়ও ছোটো ছোটো মেয়েদের পক্ষে বেশ ভালো হইয়াছিল। সন্তোষবাবুর একটি ভাগিনেয়ী, ডাকনাম রানু, ক্ষীরির ভূমিকায় বেশ ভালোই অভিনয় করিল। সন্তোষবাবুর দুই বোন নুটু আর রেখা লক্ষ্মী এবং রানী কল্যাণী সাজিয়াছিল, অন্যান্য অভিনেত্রীদের নাম এখন মনে পড়িতেছে না। ভিতরবাড়ির উঠানেই অভিনয় হইল। রবীন্দ্রনাথ দেখিতে আসিলেন এবং অভিনয়ের শেষে অভিনেত্রী এবং কর্মকর্ত্রীদের অভিনন্দন জানাইলেন।

৯ পৌষ সকালে আশ্রমের পরলোকগত ছাত্র ও অধ্যাপকদের স্মরণ করা হইল। তখন কাজকর্ম অনেক জুটিয়া গেল বলিয়া যাইতে পারিলাম না। কলিকাতা যাওয়া হইবে কিছুক্ষণ পরেই। জিনিসপত্র গুছাইতে এবং সংসারের কাজকর্ম সারিতেই বেলা কাটিয়া গেল। অন্য বন্ধুবান্ধব সকলের সঙ্গে দেখা করিলাম। বিকালের ট্রেনে কলিকাতা যাইবার কথা।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি তখন লিখিতেছিলেন। আমরা দরজার কাছে পৌঁছিতেই মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, 'কি, পলায়নের চেষ্টা?' সেইখানেই দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ কথা বলিলাম। রবীন্দ্রনাথ অভিযোগ করিলেন যে সকলেই খালি তাঁহাকে ফেলিয়া পলাইবার চেষ্টা করে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম মাঘোৎসবের সময় তিনি কলিকাতায় যাইবেন কি না। বলিলেন, 'না, আমি আর কোথাও যাব না, এইখানে ব'সেই

১১ মাঘ করব।' তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দুই বোনে ফিরিয়া আসিলাম। স্টেশনে যাইবার সময় গাড়ি-বিভ্রাট ঘটিয়া খানিক দেরি হইয়া গেল। ট্রেনে দুই-তিনটি ভারি মিষ্ট ও সরল স্বভাবের মুসলমান তরুণীর সঙ্গে আলাপ হইল। একটি মেয়ের নাম আরেফা, আর-একটির নাম জাহেদা। তাহারা কলিকাতায় আলিপুরে থাকে, ঠিকানাও দিল, গিয়া দেখা করিতে অনুরোধ করিল। সেটা অবশ্য কোনোদিন আর ঘটিয়া উঠে নাই।

শান্তিনিকেতন তখন আমাদের কাছে সত্যই শান্তির নিকেতন ছিল। মাঝে মাঝে যখন কলিকাতায় ফিরিতাম মনে হইত যেন দাবানলের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছি। এখানকার কোলাহল, পরচর্চা, কুৎসা সব অসহ্য ঠেকিত। এবার আবার আসিয়া পৌঁছিলাম কংগ্রেসের হিড়িকের মধ্যে। গোলমালে যেন দিশাহারা হইয়া গেলাম। আমরা আসিবার দিন-দুই পরেই রবীন্দ্রনাথও কংগ্রেস উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। টিকিট জোগাড় করা, সঙ্গের সাথী জোটানো, নানারকম কথা শোনা— এই করিয়াই দিন কাটিতে লাগিল।

১৯১৭-র ২৭ ডিসেম্বর বোধ হয় কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হইল। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বিরাট মণ্ডপ বাঁধিয়া এই সভা হইয়াছিল। দুপুরবেলা গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে কি বিষম ভিড়, গাড়িই চলে না, সারি সারি ট্রাম দাঁড়াইয়া গিয়াছে, গাছে, প্রাচীরে, বাড়ির ছাদে মানুষের মাথা ছাড়া আর কিছু দেখাই যায় না। অনেক ঘোরাঘুরি করিয়া শেষে পাশের একটা গেট দিয়া মণ্ডপের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা অনেকেই হইয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় তাঁহাদের নিকট হইতে সেবা বিশেষ পাওয়া যায় নাই। মেয়েদের জন্য যেদিকে জায়গা হইয়াছিল, অনেক কষ্টে পথ করিয়া সেইখানে গিয়া বসিলাম। শান্তিনিকেতনে ভানুমতী বলিয়া যে গুজরাটি মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল, ঢুকিয়াই তাহাকে দেখিতে পাইলাম।

সামনেই সভাপতির মঞ্চ, তাহার উপরে দেশের যত জ্ঞানী ও গুণীর সমাগম হইয়াছে। একটু ভালো করিয়া তাকাইয়াই রবীন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইলাম। উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে ভূষিত, তাঁহাকে যেন ধূমাবরণে বেষ্টিত জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মতো দেখাইতেছিল। তখন ভাবিয়াছিলাম, আমি যদি চিত্রকর হইতাম তাহা হইলে তাঁহার এই মূর্তি আঁকিয়া রাখিতাম। পরে দেখিয়াছি যে সে ইচ্ছা দেশবিখ্যাত চিত্রকরের মনেও জাগিয়াছিল এবং সে ছবি তিনি আঁকিয়াও ছিলেন। তখনো সভার কার্য আরম্ভ হয় নাই, চারি দিকে বিকট কোলাহল। বাহিরের চিৎকার ভিতরে আসিয়া পৌঁছিবামাত্র মণ্ডপের ভিতরের লোকেরাও প্রাণপণে চিৎকার করিতেছেন। এক-একজন করিয়া নেতার আগমনই উপলক্ষ। মহাত্মা গান্ধী এবং বালগঙ্গাধর তিলক এই দুইজনের আগমনেই হর্ষধ্বনি আকাশ ভেদ করিয়া উঠিল। নানা দেশের দর্শকদের ও মেয়েদের কত রঙের যে বেশভূষা আর শিরাবরণ, তাহার ঠিকানাই নাই, ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথাও এত রঙ একত্রে মিলিত কি না সন্দেহ।

সভার প্রারম্ভে গান হইল, 'সংগচ্ছদ্ধং সংবদদ্ধং সংবোমনাংসি জানতাম্।' গানের দলে দিনেন্দ্রনাথের চেহারাটাই সবার আগে চোখে পড়িল। গানের পর বিপিনচন্দ্র পাল

মহাশয় অনেকগুলি টেলিগ্রাম পড়িয়া শুনাইলেন। ইহার পর 'বন্দে মাতরম্' গান হইল। চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের ভগিনী অমলা দাশ এই গানের নেত্রী ছিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর বর্ণনা করিবার ভাষা নাই, যাঁহারা কোনোদিন উহা শুনিয়াছিলেন তাঁহারা আমার কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি বৈকুণ্ঠনাথ সেন অতঃপর রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার India's Prayer পড়িয়া শুনাইতে অনুরোধ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কবিতা পাঠ করিলেন। তখনকার দিনে প্রতি সভাতেই এত microphone-এর আবির্ভাব দেখা যাইত না, কিন্তু কবির কণ্ঠস্বর মধুর অথচ তীব্র তূর্যনাদের মতো সভার প্রত্যেক অংশ হইতেই শোনা গেল। রবীন্দ্রনাথ উঠিয়া দাঁড়াইতেই জনতার ভিতর হইতে একটা কলরব উঠিল, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বর কানে যাইবামাত্রই সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো স্থির ও নীরব হইয়া গেল। কবিতা-দুইটি পড়িয়া শুনাইতে তাঁহার মিনিট দুয়ের বেশি সময় লাগে নাই।

ইহার পর সুরেন্দ্রনাথ উঠিলেন সভানেত্রীর নাম প্রস্তাব করিতে, কয়েকজন ভদ্রলোক তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ইহার পর নিজের অভিভাষণ পাঠ করিলেন, তাহার ভিতর 'Brother Delegate' ছাড়া আর কিছু শুনিতে পাইলাম না। সভানেত্রী মিসেস বেসান্টা অতঃপর বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। মাথায় চুল হইতে পায়ের জুতা পর্যন্ত সব ধবধব করিতেছে সাদা। বৃদ্ধা মহিলার কণ্ঠস্বর কিন্তু তখনো বেশ সতেজ, শারীরিক শক্তিরও বিশেষ ক্ষয় হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল না, বেশ ঘণ্টা-দুই একটানা বক্তৃতা করিয়া গেলেন। শেষ হইল 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী' গানটি হইয়া। বিরাট ভিড় ঠেলিয়া এবং দুই-চারিটা ছোটোখাটো মারামারি দেখিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম যখন তখন প্রায় সন্ধ্যা। ইহার পর য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর conference দেখিতে যাত্রা করা গেল। সেখানে পৌঁছিয়া সংবাদ পাইলাম যে ভীষণ মারামারি হইয়া সভা ভাঙিয়া গিয়াছে। সে দিনটাই যেন রুদ্র রসের চর্চার জন্য। এখান হইতে সিটি কলেজে থিস্টিক কনফারেন্সের অধিবেশনে গিয়াও প্রচুর মারামারি উপভোগ করিয়া আসিলাম। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু সভানেত্রী ছিলেন, আরো অনেক বিখ্যাত বক্তা ছিলেন। কিন্তু প্রচণ্ড কোলাহলে কাহারো কথা ভালো করিয়া শুনিতে পাইলাম না। এক-একবার ভয় হইতে লাগিল যে জীবন্ত বোধ হয় এই ভয়াবহ সভা হইতে আর ফিরিতে হইবে না। মিসেস নাইডু তিনতলার হলে একবার বক্তৃতা করিয়া আর-একবার দু'তলায় চলিলেন বক্তৃতা করিতে। তখন গোলমাল একটু থামিল। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুজরাটি সাহিত্যিক মিঃ রমনভাই, অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি অনেকে বক্তৃতা করিলেন। সভা-ভঙ্গের পর কোনোমতে ভিড় ঠেলিয়া বাড়ি আসিলাম।

কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতনে ফিরিলাম বোধ হয় ৮ ফেব্রুয়ারি, দুপুররাত্রে আসিয়া পৌঁছিলাম। শান্তিনিকেতনে তখন সহ্বৎ নামক একটি গোরুর গাড়ির চালক

ছিল সেই দেখিলাম আমাদের অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছে। জিনিসপত্র গোরুর গাড়িতে তুলিয়া দিয়া আমরা হাঁটিয়াই চলিলাম। অন্ধকারাচ্ছন্ন মাঠ, সুপ্তিমগ্ন গ্রাম পার হইয়া হাঁটিয়া চলিতে ভালোই লাগিতেছিল। আমরাই আগে পৌঁছিলাম, জিনিসপত্র আরো দেরি করিয়া আসিল। বিছানা করিয়া ঘুমানো গেল, ঘরদোর গুছাইবার চেষ্টা অত রাত্রে আর করিলাম না। সকালে উঠিয়া বড়োমাকে দেখিতে গেলাম, তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন। মীরা দেবী ও কমলা দেবীর সঙ্গেও দেখা হইল।

বিকালবেলা রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ মিলিল। তিনি তখন নিজের ছোটো বাড়িটির নীচের বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমি গিয়া প্রণাম করিতেই বলিলেন, 'এত রোগা হয়ে এলে কেন? এখন কেমন আছ?'

বেলা দেবীর অসুখ তখন অত্যন্ত বাড়িয়াছে, রবীন্দ্রনাথকে সর্বদাই বড়ো ক্লিষ্ট দেখাইত, কিন্তু তাঁহার নির্দিষ্ট কাজ যাহা ছিল তাহার কখনো এক চুল এদিক-ওদিক হইত না। সেই রাত্রেই দিনুবাবুর বারান্দায় বসিয়া 'বলাকা' পড়িয়া শুনাইলেন, গানও হইল। তিনি আশ্রমে থাকিলে সকলেই সন্ধ্যাবেলাটা আশায় উন্মুখ হইয়া উঠে, তাঁহার কাছে কিছু শুনিবে বলিয়া, ইহা তিনি জানিতেন। দারুণ উদ্‌বেগ ও মনঃকষ্টের মধ্যেও তাই আমাদের বঞ্চিত করিতেন না। আগেকার মতো তাঁহার হাস্যরসের ফোয়ারা অজস্র ছুটিত না, মুখে হাসি কমই দেখিতাম। কেবল একদিন তাঁহাকে আগের মতো হাসিতে দেখিলাম। আশ্রমে কি কারণে জানি না কয়েকজন পুলিস কর্মচারীর আবির্ভাব হইয়াছিল। বিকালে তাঁহার বাড়ি গিয়া দেখি তিনি তাঁহার খাইবার ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'এই দেখো সীতা, তোমার সন্ধানে পুলিস এসে হাজির।' আমি বলিলাম, 'আমার সন্ধানে কিরকম?' রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'তা না তো কি? আমি ভালো মানুষ, আমাকে কে বা জানে? ঠিক তোমাদের খোঁজে এসেছে, আমি তবু বাঁচিয়ে দিলুম।'

আর-একদিন কাশী হইতে শ্রীযুক্ত সঞ্জীব রাও-নামক এক ভদ্রলোক ও তাঁহার পত্নী আসিয়াছিলেন শান্তিনিকেতন দেখিতে। কবি সেদিনও অপেক্ষাকৃত প্রফুল্লভাবে তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিলেন। অতিথিদের বাড়ি বোধ হয় কারোয়ারের দিকে ; তিনি তাঁহাদের দুই-চারিটি কারোয়ারী গানও শুনাইয়া দিলেন।

আমরা এবার শান্তিনিকেতনে ফিরিবার পর দিন-দুই সন্ধ্যাবেলা তাঁহার কাছে 'বলাকা'র কবিতা শুনিলাম। তাহার পর তিনি গান রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। দিনরাত গানের স্রোত বহিতে লাগিল। নূতন গান রচিত হইলেই দিনুবাবু, অজিতবাবুর ডাক পড়িত। মধ্যে মধ্যে সেখানে শ্রীযুক্ত তেজেশচন্দ্র সেনকেও দেখিতাম। তাহার পর সন্ধ্যাবেলা গানের ক্লাস বসিত, দিনুবাবু ছেলেদের নূতন গানগুলি শিখাইতেন। রবীন্দ্রনাথও এইখানে আসিয়া বসিতেন, গান শিখানোতে যোগ দিতেন। ছেলেমেয়েরা চলিয়া যাইবার পরও বড়োদের গানের মজলিশ অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিত। আমরা যাহারা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলাম না, তাহারাও সমস্তক্ষণই বসিয়া এই অমৃতের স্রোত উপভোগ করিতাম। সেই দিনগুলির

কথা যখন স্মরণ করি, মনে হয় মহাকালের গলায় মন্দারকুসুমের মালার মতো তাহারা এখনো দুলিতেছে। সময়টা শুক্লপক্ষ ছিল, সন্ধ্যার পরই জ্যোৎস্না উঠিয়া পড়িত। বিকালবেলা বেড়াইতে বাহির হইতাম, রবীন্দ্রনাথের গৃহের কাছে আসিলেই শুনিতে পাইতাম উপর হইতে গানের সুর ভাসিয়া আসিতেছে। সন্ধ্যার পরই দিনুবাবুর গানের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিত। কিছুদিন শিশু-বিভাগের একটি ঘরে গানের ক্লাস হইয়াছিল। ঘণ্টা শুনিলেই শালবীথিকার মর্মর-মুখরিত আলোছায়া-বিচিত্রিত পথ অতিক্রম করিয়া সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইতাম। রবীন্দ্রনাথও রোজ যথাসময়ে আসিয়া বসিতেন। গান শেষ হইলে সকলে দল বাঁধিয়া একসঙ্গে ফিরিয়া আসিতাম। দিনুবাবুর বারান্দায় বা ঘরে বসিয়া এক-একদিন আরো কিছুক্ষণ গান চলিত। একটু ছায়াচ্ছন্ন কোণ খুঁজিয়া বসিয়া গান শুনিতাম তন্ময় হইয়া, শিখিবার চেষ্টা করিতাম না। মধ্যে মধ্যে তাঁহার চোখে ধরা পড়িয়া যাইতাম, হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, 'কি গো, গান-টান কিছু শিখলে?' এই সময়ে রচিত গানগুলি তাঁহার 'গীতপঞ্চাশিকা' বইটিতে স্থান পাইয়াছে।

শ্রীপঞ্চমীর দিন ছেলেরা দল বাঁধিয়া সুরুলে বনভোজন করিতে চলিল। রবীন্দ্রনাথও বিকালে সেখানে যাইবেন শুনিয়া আমরা মেয়ের দলও উৎসাহ করিয়া চলিলাম। যাইবার সময় রোদে বেশ কষ্ট পাইলাম। আমরা গিয়া পৌঁছিয়া দেখিলাম ছেলের দল তখন ফিরিয়া চলিয়াছে। একটু নিরুৎসাহের সঞ্চার হইল, ভাবিলাম ভাঙা হাটে কিছু সুবিধা হইবে না বোধ হয়। কিন্তু কপাল ভালো ছিল, আমরাই সবচেয়ে লাভবান হইলাম। সুরুলে তখন একখানি মাত্র বড়ো দোতলা বাড়ি, ইহা লর্ড সিংহের নিকট হইতে বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ ক্রয় করিয়াছিলেন। ইহারই দালানে বসিয়া খানিকক্ষণ বিশ্রাম করা গেল। তাহার পর কবি যেখানে বসিয়াছিলেন সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাদের আকস্মিক আবির্ভাবে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়াছিলেন বোধ হয়, যাহা হউক, হাসিমুখেই বসিতে বলিলেন। নিজের দুই-একটি কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন, তাহার পর শুরু হইল গানের পালা। পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী কয়েকটি হিন্দি গান করিলেন, তাহার পর 'ফাল্গুনী' উজাড় করিয়া বসন্তের গান চলিল। 'আজি বিজন ঘরে নিশীথরাতে আসবে যদি শূন্য হাতে' গানটি কবি সেইদিনই রচনা করিয়াছিলেন বোধ হয়, সর্বশেষে সেই গানটি তিনি একলা গাহিয়া শুনাইলেন।

রাত হইয়াছিল অনেক, ইহার পর বাড়ি ফিরিবার পালা। গাড়িতে ফিরিব, না হাঁটিয়া ফিরিব, তাহা লইয়াই মহা তর্ক বাধিয়া গেল। মেয়েদের ইচ্ছা তাহারা হাঁটিয়া যায়, অন্য সকলের ইচ্ছা তাহারা গাড়ি চড়ে। রবীন্দ্রনাথও যখন গাড়ি চড়িতে বলিলেন তখন আমরা বিপদে পড়িলাম, কারণ তাঁহার আদেশ কেহ অমান্য করিতে পারি না। আমাকে বলিলেন, 'সীতা, তুমি কলকাতায় থেকে এবার বেজায় রুগ্ন হয়ে এসেছ, তুমি ওঠো।' নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে গাড়িতে উঠিতেছি এমন সময় কি মনে করিয়া তিনি বলিলেন, "বেশ তরুণ জ্যোৎস্নায় পথ চলা যাবে', বলিয়া নিজে হাঁটিয়া অগ্রসর হইলেন। আর তখন কে গাড়ি চড়ে? আমরাও দল বাঁধিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলাম। তবে কয়েক মিনিটের ভিতরেই

রবীন্দ্রনাথ চোখের আড়াল হইয়া গেলেন। তাঁহার সঙ্গে হাঁটা আমাদের কর্ম ছিল না, তিনি বোধ হয় আমাদের এক ঘণ্টা আগে শান্তিনিকেতনে পৌঁছিয়াছিলেন। আমরা সারা পথ খুব গল্প করিতে করিতে আসিলাম, তবে পথে একদল মাতাল আসিয়া পড়ায় কিঞ্চিৎ ভয়ও পাইলাম। বাড়ি পৌঁছিতে প্রায় ১২টা বাজিয়া গেল।

এইবার উপরি-উপরি দুই-তিনটি সপ্তাহে বুধবারে তিনি মন্দিরে উপাসনা করিলেন। মন্দিরের চারি দিকে কয়েকটি আমলকি গাছ ছিল। শীতের প্রকোপে পাতা সব খসিয়া পড়িয়াছে কিন্তু ডালগুলি ফলভারে আনত, এই ছবিটি এখনো বেশ মনে পড়ে।

২১ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন। বেলা দেবীর অবস্থা সংকটাপন্ন, টেলিগ্রাম আসিয়াছে। মীরা দেবীর মুখে টেলিগ্রামের খবর শুনিয়া কবি শুধু বলিলেন, 'এ তো অনেকদিন থেকেই জানি, তবু মনকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলুম।' তৎক্ষণাৎ স্থির হইয়া গেল, দুপুরের গাড়িতেই তাঁহারা কলিকাতা যাত্রা করিবেন। তাড়াতাড়ি করিয়া যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল। মীরা দেবীও পুত্র-কন্যা লইয়া তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল, রবীন্দ্রনাথ উপর হইতে নামিয়া আসিলেন। চারিদিকে বিষণ্নভাবে আত্মীয় বন্ধু শিক্ষক ছাত্র সকলে দাঁড়াইয়া। সকলে প্রণাম করিল, প্রত্যভিবাদন করিয়া গাড়িতে গিয়া বসিলেন। ট্রেনের সময় প্রায় হইয়া গিয়াছিল, গাড়ি দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

শান্তিনিকেতনে তখন শীত কাটিয়া গিয়া ক্রমে বসন্তের পদচিহ্ন ফুটিয়া উঠিতেছে। এক দিকে পাতা ঝরার তখনো অবসান হয় নাই, অন্য দিকে তরুণ কিশলয় সোনালি আভায় ফুটিয়া উঠিতেছে, বাতাস আম্রমুকুলের গন্ধে ভরপুর। আমাদের মন কিন্তু তখন এমন বিষাদভারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল যে এ-সব দিকে চোখই পড়িত না। কলিকাতার খবর প্রায়ই পাইতাম, কখনো-বা কিছু ভালো খবর থাকিত কখনো-বা একেবারেই নৈরাশ্যজনক। চারুচন্দ্র একবার চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের কথা লিখিলেন, 'তাঁকে দেখলেই মনে হয় শোকে আচ্ছন্ন হয়ে আছেন,... হাতের স্পর্শেই যেন মনের সঞ্চিত বেদনা বেরিয়ে পড়ে।'

আবার শুনিলাম বেলা দেবী কিছু ভালো আছেন, কলিকাতায় 'অচলায়তন' অভিনয়ের আয়োজন হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের এক আত্মীয়া বলিলেন, 'ওঁর মতো সব কষ্ট এমন ষোলো আনা অনুভব করতেও কাউকে দেখি নি, আবার সেটা অমন ক'রে ঝেড়ে ফেলতেও দেখি নি। কিন্তু ঝেড়ে যে ফেলেন সে একেবারে অর্ধেক প্রাণ বার ক'রে।' মনে হইত কথাটা সত্যই।

মাঝে আমার ছোটো ভাইয়ের পানবসন্ত হওয়ায় আমরা কিছুদিন খানিকটা একঘরে হইয়া কাটাইলাম। তবে প্রকৃতির উদার অঞ্চল যেখানে বিছানো সেখানে এ-সব জিনিস ততটা গায়ে লাগে না। বাহিরের বাসন্তী সৌন্দর্যের দিকে তাকাইয়া ও মাঠে বনে ঘুরিয়া দিন বেশ কাটিয়া যাইত। বিদ্যালয়ের কয়েকটি ক্লাস পড়াইতেছিলাম, তাহারা পানবসন্তের ভয়ে বাড়িতে আসা বন্ধ করিল।

মাঝে কালীমোহন ঘোষ মহাশয় কলিকাতা ঘুরিয়া আসিলেন, আসিয়া খবর দিলেন যে রবীন্দ্রনাথ শীঘ্রই জাপান হইয়া আমেরিকা যাইতেছেন। সঙ্গে যাইবেন তাঁহার জামাতা ও অ্যান্ড্রুজ সাহেব। পাসপোর্ট পর্যন্ত নাকি লওয়া হইয়া গিয়াছে। বহুকাল হয়তো আর তাঁহার দর্শন পাইব না, যাত্রার আগে হয়তো আর দেখাই হইবে না, মনে করিয়া অত্যন্ত মুষড়াইয়া গেলাম।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই সময় অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়াতে তাঁহার পরিবারের সকলে অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া গেলেন। দিনুবাবুরাও তাঁহার সঙ্গে গেলেন। ইহার মধ্যে ঝড়ে একদিন আমাদের খড়ের ঘরের চাল উড়িয়া যাওয়াতে আমরা বাধ্য হইয়া তাঁহার বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। বিদ্যালয়ের ছেলেরা সদলে আসিয়া পড়িয়া আমাদের প্রচুর সাহায্য করিল, সমস্ত জিনিসপত্র নিজেরা বহন করিয়া এক বাড়ি হইতে আর-এক বাড়িতে লইয়া গেল। ধন্যবাদ দেওয়াতে বলিল, আমরা যখন আপনাদের neighbour, আমাদের তো করাই উচিত।

নেপালবাবুরও এই সময় বসন্ত হইয়াছিল, ছোঁয়াচ বাঁচাইবার জন্য তাঁহাকে সুরুলে রাখা হইয়াছিল। সারিয়া উঠিয়া quarantine-এর পর্ব শেষ হইলে পর তিনি সুরুলের বাড়িতে মস্ত এক ভোজ দিলেন। আশ্রমের অন্যান্য অধিবাসিনীদের সঙ্গে আমরাও গোরুর গাড়ি চড়িয়া ভোজ খাইতে গেলাম। গোরুগুলি পথে যতরকম দুষ্টামি করিতে পারে তাহা করিল। সুরুলে পৌঁছিয়া দেখা গেল যে তখনো রান্না শেষ হইতে অনেক দেরি। আমরা তখন দল বাঁধিয়া নেপালবাবুর সঙ্গে 'চিপ সাহেবের কুঠি' দেখিতে চলিলাম। স্থানীয় নীলকর সাহেবের কুঠির বিরাট ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া খুব ভালো লাগিল। এদিককার খোয়াইগুলি ভুবনডাঙার খোয়াইগুলির চেয়ে দেখিতে আরো অনেক সুন্দর ছিল, এখন তো বেশির ভাগই শস্যক্ষেত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে। কুঠির বাগান যাহা ছিল তাহা তখন পুরাদস্তুর জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল, তাহারই ভিতর অনেকক্ষণ ঘুরিলাম। তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া খাওয়া-দাওয়া করা গেল, খানিকক্ষণ ছেলেদের গানও শুনিলাম। ফিরিবার পথেও গাড়ির গোরুগুলি আগেকারই মতো অভদ্রতা করিল, অগত্যা হাঁটিয়াই বাড়ি ফিরিলাম। মাঝে তিন-চারদিনের মতো দিদি কলিকাতায় চলিয়া গেলেন, একলাই কোনোমতে দিন-কয়টা কাটাইয়া দিলাম।

নববর্ষ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ আশ্রমে আসিবেন বলিয়া শোনা গেল। তবে আসন্ন বিদেশযাত্রার আয়োজনে তিনি খুব ব্যস্ত আছেন শুনিয়াছিলাম, সুতরাং পুরাপুরি আশা করিতে ভরসা হইতেছিল না। মধ্যে তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা বাড়ির কাজে আশ্রমে একবার আসিলেন ; তাঁহার কাছে খবর পাওয়া গেল যে রবীন্দ্রনাথ দুই-একদিনের মধ্যে সত্যই আসিবেন। ১১ বা ১২ এপ্রিল রাত্রে তাঁহার আসিবার কথা। ভোরে উঠিয়া দেখিলাম সত্যই তিনি আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ছোটো ছাদটির উপর পূর্বাকাশের দিকে মুখ করিয়া ধ্যানে বসিয়া আছেন।

বড়োমাও ফিরিয়া আসিয়াছেন দেখিলাম। সেবারকার 'শ্রেয়সী'খানি হাতে করিয়া ও সহ-সম্পাদিকা রেখাকে লইয়া তিনিও কবির কাছেই যাইতেছেন মনে হইল। রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করিবার জন্য আমরাও তখনি চলিলাম। গিয়া দেখি তিনি 'শ্রেয়সী'খানি উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিতেছেন, বড়োমা কাছে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছেন। প্রণাম করায়, কুশল-প্রশ্ন করিয়া আবার কাগজ দেখিতে লাগিলেন, তাহার পর খাইবার ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। আমাদেরও সেইখানে বসিতে বলিলেন। তাঁহাকে কিরকম যেন চিন্তিত ও অন্যমনস্ক দেখাইতেছিল, বেশি কথাবার্তা বলিলেন না। আমার মেজোভাই শ্রীমান অশোক ও প্রশান্তচন্দ্র তখন Bengal Light Horse-এ ছিলেন। তাঁহাদের কথা দু-একটা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি এখানে আসার অনতিপূর্বেই কলিকাতায় বিচিত্রার একটা সভা হইয়াছিল, দিদি তখন কলিকাতায়ই ছিলেন শুনিয়া বলিলেন, 'তাই নাকি? জানলে আমি গাড়ি পাঠিয়ে তোমাদের ধ'রে নিয়ে যেতুম।'

তাঁহার খাওয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষ হইয়া গেল। ক্ষিতিমোহনবাবু এই সময় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে বিদ্যালয়-সংক্রান্ত কথা বলিতে বলিতে রবীন্দ্রনাথ টেবিল ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। জাভাতে তৈয়ারি, শুষ্ক পাতা ঝাঁট দিবার একটা ধাতুনির্মিত ঝাঁটাগোছের জিনিস তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেইটি হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

আমাদের বাড়ি বসিয়াই সারাদিন তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইত। ক্রমাগত লোক আসিতেছে একের পর এক— দেখা করিতে, প্রণাম করিতে, পরামর্শ লইতে। নববর্ষের উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা হইতে দুই-একটি অতিথি-সমাগমও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। দুপুরে দেখিলাম মুলু তাঁহার ঘরে গিয়া নিজের নাইট-স্কুলের জন্য পুরানো কাগজ সংগ্রহ করিতেছে, এইগুলি বিক্রয় করিয়া সে নিজের ছাত্রদের বই-খাতার খরচ চালাইত। সে যখন ফিরিয়া আসিল তখন দেখিলাম, পুরানো কাগজের সঙ্গে কতকগুলি পুরানো চিঠিও সে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। দুই-একটি চিঠি তাহার ভিতর বেশ উল্লেখযোগ্য। একজন পার্শী যুবক খুব উচ্ছ্বসিত ভাষায় রবীন্দ্রনাথকে পত্র লিখিয়াছেন, শেষ করিয়াছেন এই বলিয়া, "I am a Parsee, and ashamed of it too." পার্শী হওয়াতে লজ্জিত হইবার কি আছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

সন্ধ্যাবেলায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছি, এমন সময় শিশুবিভাগের গুটি দুই ছেলে তাহাদের সাহিত্য-সভার বার্ষিক অধিবেশনে নিমন্ত্রণ করিতে আসিল। তাহাদের কয়েকটি মোমবাতির প্রয়োজন, সেইগুলি সংগ্রহ করিতে আবার বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। ছেলে-দুইটিকে বিদায় করিয়া আবার বাহির হইলাম। সেইদিন সন্ধ্যায় বর্ষশেষের উৎসব-উপলক্ষে উপাসনা। ভয় ছিল পাছে দেরি হইয়া যায়। দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ তখনো ছাদেই বসিয়া আছেন। পাশেই ক্ষিতিমোহনবাবু তখন থাকিতেন, তাঁহাদের ঘরে গিয়া ঢোকা গেল। ঠানদি তখন মন্দিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। আমরা একসঙ্গেই মন্দিরে চলিলাম। দেখিতে পাইলাম, রবীন্দ্রনাথও আমাদের পিছনে আসিতেছেন এবং ছেলের
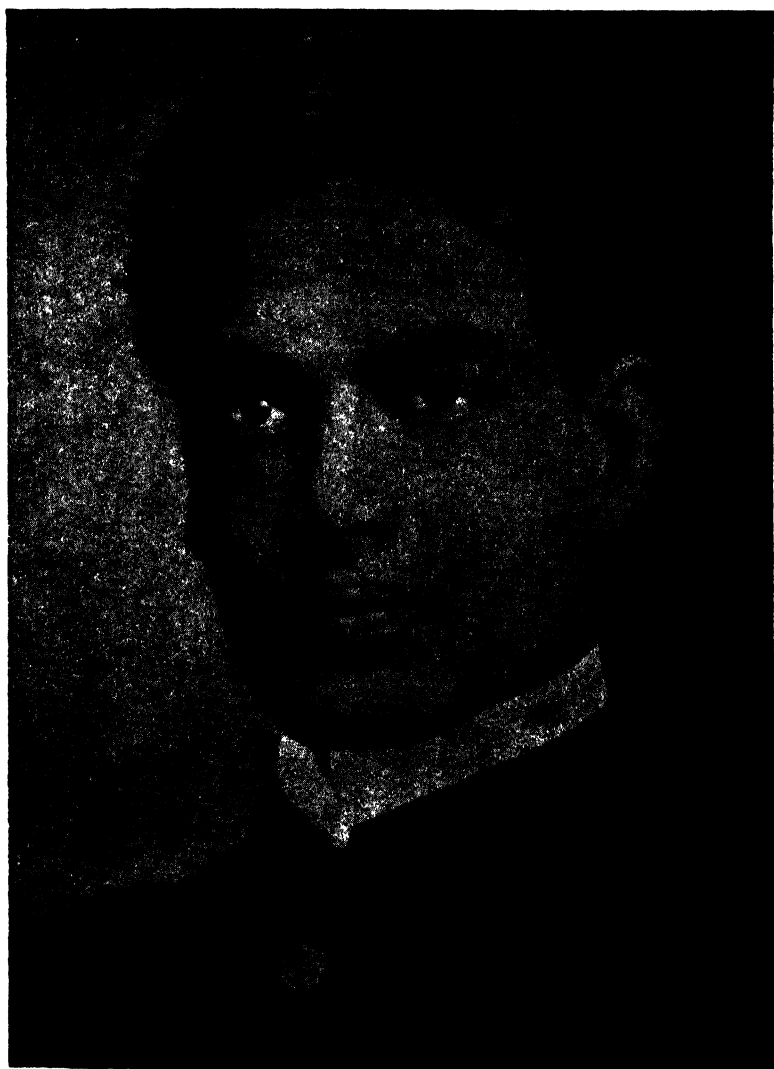
সন্তোষচন্দ্র মজুমদার

দলও লাইন বাঁধিয়া অগ্রসর হইতেছে। তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া মন্দিরে পৌঁছিলাম। আমাদের ঠিক পরেই কবি আসিয়া উপস্থিত হইলেন— আর মন্দিরের জাপানি ঘণ্টাটিও বাজিয়া উঠিল। তাঁহার হাতে এই ঘণ্টাটি যেন সজীব হইয়া উঠিয়া সকলকে পূজায় আহ্বান করিত। আর কাহারো হাতে এই সুরটি লাগিত না।

দিনুবাবু তখনো কলিকাতা হইতে ফিরেন নাই, সুতরাং উপাসনার আগে গান হইল না। কিন্তু বাহিরে উৎসবের আয়োজনের অভাব ছিল না, মন্দিরের ভিতরেও উৎসব-দেবতা সকলের হৃদয় পূর্ণ করিয়া আবির্ভূত হইলেন।

উপাসনা শেষ হইবার পর ছেলের দল কবিকে প্রণাম করিবার জন্য ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তখন আমরা আর তাঁহার নিকট অবধি পৌঁছিতেই পারিলাম না। ছেলেদের প্রণামের পালা শেষ হইতেই তিনি অতিথিশালা-ভবনের দিকে চলিয়াছেন দেখিলাম। আমরা তখনো শালবীথিকার কাছে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিলাম। অল্প পরেই রবীন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিলেন, সঙ্গে সাহিত্য-সভার উদ্যোগকারীগণ। তাহার অতিথিশালার দোতলায় সভা সাজাইয়াছে, কিন্তু কবি কিছুতেই সেখানে যাইতে সম্মত হইলেন না। সভায় সাজ না হইলেও চলে, কিন্তু সভাপতিকে না হইলে চলে না, ইহা তাহারা দুঃখের সহিত স্বীকার করিল এবং সভার স্থান পরিবর্তনের ব্যবস্থা করিতে গেল। আমরা এই সময় অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম, দুই-চারটি কথা বলিয়া তিনি নিজের দোতলার ঘরে উঠিয়া গেলেন।

দিনুবাবুর বাড়ির বারান্দায় ছেলেদের সাহিত্য-সভা বসিল। রবীন্দ্রনাথ নামিয়া আসিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। আবৃত্তি, গল্প পড়া প্রভৃতি হইল, একজন ছাত্রের (বোধ হয় ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মার) অঙ্কিত একটি ছবি এবং তাহারই দ্বারা গঠিত একটি নরমুণ্ডের cast দেখানো হইল। পঠিত গল্প-দুইটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করিলেন যে, লেখকরা যেখানে নিজেদের জানাশোনা বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন সেগুলি ভালোই হইয়াছে, কিন্তু প্রথমজন হাস্যরসের এবং দ্বিতীয়জন করুণরসের চেষ্টাকৃত আতিশয্যে জিনিসগুলিকে অনেকখানি মাটি করিয়া ফেলিয়াছেন। অতঃপর ছেলেদের সভার সেক্রেটারি প্রভৃতি নির্বাচন আরম্ভ হইল। সভাপতি তখন উঠিয়া চলিয়া গেলেন, আমরাও বাড়ি ফিরিলাম।

নববর্ষের দিন অন্ধকার থাকিতেই উঠিয়া পড়িলাম, কি জানি যদি দেরি হইয়া যায়! কিন্তু সূর্যোদয়ের আগে উপাসনা আরম্ভ হইল না। রবীন্দ্রনাথ উপর হইতে নামিয়া মন্দিরের পথে চলিয়াছেন দেখিয়া আমরাও তাড়াতাড়ি বাহির হইলাম। কবি পণ্ডিতজিকে ডাকিয়া কি যেন বলিলেন, অনুমান করিলাম গানের কথাই হইবে। আরম্ভে পণ্ডিতজি দুই-তিনজন ছেলেকে লইয়া একটি গান করিলেন। দ্বিতীয় গানটি রবীন্দ্রনাথ নিজেই করিলেন। উপাসনান্তে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বাড়ি ফিরিলাম।

দিনুবাবু তখনো কলিকাতা হইতে ফিরেন নাই, তবু তাঁহারই বাড়ির বারান্দায় গানের আসর বসিতেছে দেখিলাম। আমরাও গিয়া জুটিতে দেরি করিলাম না। গান অনেকগুলি
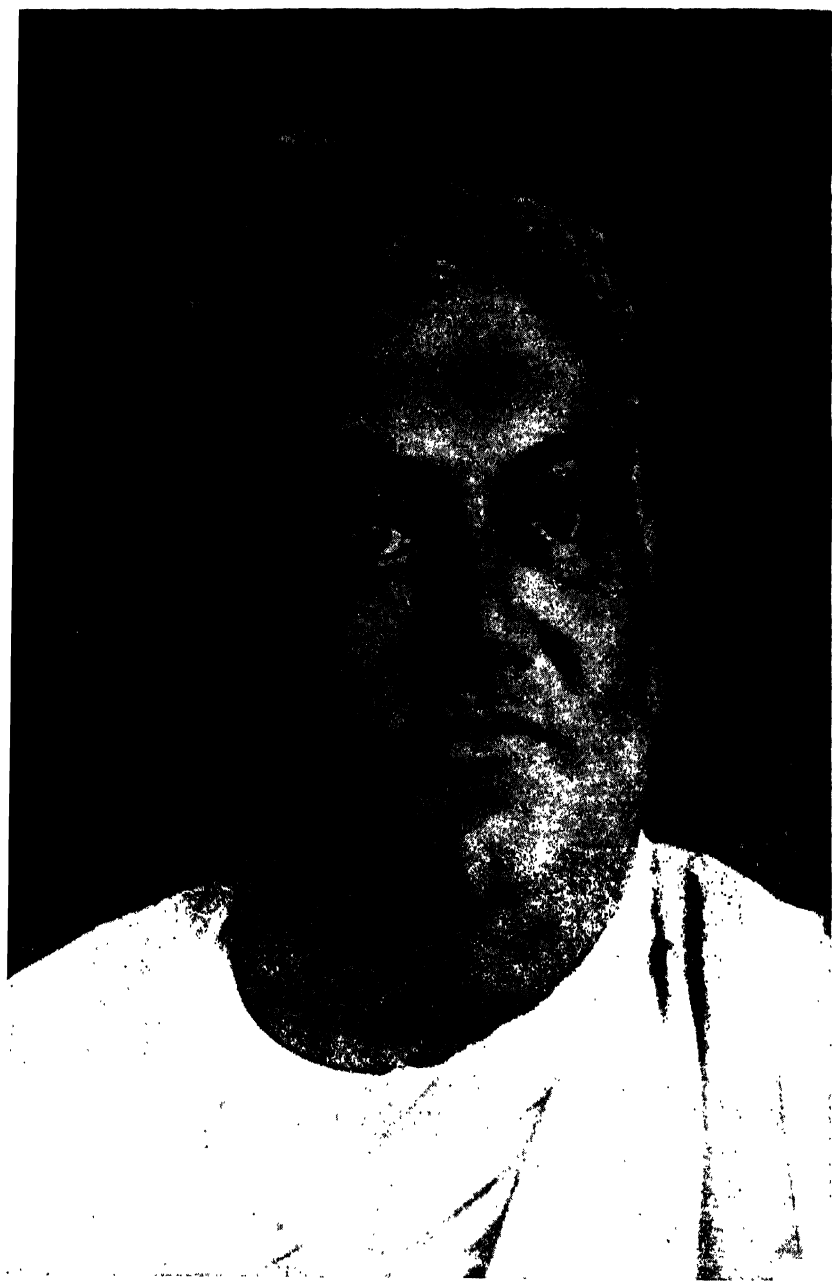
দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

হইল, বেশির ভাগই 'ফাল্গুনী'র। নূতন গানও কয়েকটি হইল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দুই-তিনটি গান গাহিলেন এবং সদ্য-রচিত তিনটি কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন। এইগুলি পরে 'পলাতকা'য় স্থান পাইয়াছিল। তাহার পর সাধু বাংলা ভাষা ও কথ্য বাংলা ভাষা, ইহার ভিতর কোনটা কবিতার উপযুক্ত বাহন তাহা লইয়া কথা চলিল। জাপান হইতে কবি একটি ভারি সুন্দর ছাতা আনিয়াছিলেন; বলিতেন, 'এটি আমার রাজছত্র', সেটি সকলকে দেখানো হইল। এটি জাপানবাসীদেরই উপহার। সভা ভঙ্গ হইলে বাড়ি ফিরিলাম। কলিকাতা হইতে দুই-তিনজনের বেশি অতিথি এবারে আসেন নাই, কবি হঠাৎ আসিয়া পড়িবেন এটা বোধ হয় কলিকাতায় জানাজানি হয় নাই।

মুলুর নাইট-স্কুলের ছেলেদের বিকালে খাওয়ানো হইবার কথা ছিল, সুতরাং সারা দুপুরবেলাটা তাহারই আয়োজন করিতেই কাটিয়া গেল। বিকালের দিকে দেখিলাম রবীন্দ্রনাথের শয়নকক্ষে ছোটোখাটো একটা সভা হইতেছে। ব্যাপার কি বুঝিলাম না, মেয়েরা কেহ সেখানে উপস্থিত নাই দেখিয়া নিজেরা যাইতেও সংকোচ বোধ করিলাম। পরে নেপালবাবুর কাছে শুনিলাম যে মণ্টেগু-সাহেবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের Home Rule সম্বন্ধে যে চিঠিপত্র চলিয়াছিল, সেইগুলিই তিনি পড়িয়া শুনাইতেছিলেন।

বিকালবেলা নাইট-স্কুলের ছেলেরা বেশ রীতিমতো মার্চ করিয়া আমাদের উঠানে আসিয়া জমা হইল। ঘাসের উপরেই সকলে বসিল, দুই লাইন করিয়া। এক দল হিন্দু, আর-এক দল মুসলমান। হিন্দু রমণীর হাতে রান্না খাইতে অবশ্য মুসলমান ছেলেরা কোনো আপত্তি করিল না। তখনো ধর্ম্মমত লইয়া পাগলামিটা বেশি দূর গড়ায় নাই। আমরা খাবারগুলি সাজাইয়া দিলাম, মুলু এবং বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছেলে পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিল। কালীমোহনবাবুও দলে যোগ দিলেন। অনেকগুলি দর্শকও জুটিয়া গেলেন। কলিকাতা হইতে আগত কালিদাসবাবু, সন্তোষবাবু সস্ত্রীক, নেপালবাবু, বড়োমা প্রভৃতি একে একে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মা বলিলেন, কবিকেও ডাকিয়া আনিলে ভালো হয়, তিনি ছেলেদের খাওয়া দেখিয়া খুশি হইবেন। মুলুদের সঙ্গে বিজয় বাসু বলিয়া এক মান্দ্রাজি ছেলে পড়িত, সেই তাঁহাকে ডাকিতে ছুটিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ ছাদের উপর দাঁড়াইয়া ছেলেদের খাওয়া দেখিলেন, তাহার পর নামিয়া আসিলেন। ঘরে যে দুই-চারিখানি চেয়ার ছিল তাহা বাহির করিয়া রাখিলাম, তবে রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন আর কেহ চেয়ারে বসিলেন না। ছেলেমেয়েগুলি সত্যই এত আনন্দ করিয়া খাইতেছিল যে তাহা দেখিলেই মন খুশি হয়। নাইট-স্কুলের কর্তৃপক্ষের দল যে তাঁহার সব পুরানো কাগজ তুলিয়া আনিয়াছেন, তাহা কবি সকলকে জানাইয়া দিলেন। বাবা সেই পার্শী ছেলেটির চিঠির কথা উল্লেখ করাতে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন যে অদ্ভুত অদ্ভুত চিঠি অসংখ্য আসে। বলিলেন, 'আমি যদি সে চিঠিগুলো বই করে ছাপাতুম, তা হলে সেখানা খুব remarkable বই হত। অবশ্য লেখকদের permission নিতে হত, কিন্তু সম্ভবত বেচারিরা তাতে আপত্তি করত না।' মডার্ন রিভিউ-ও ছাপাইবার জন্য মান্দ্রাজ হইতে নাকি অনেকে তাঁহার কাছে কবিতা পাঠান। রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, 'সেগুলি এতই চমৎকার

মশায়, যে ছাপালে আপনার কাগজের গ্রাহক না বেড়ে যায় না।' ত্রিবঙ্কুর হইতে মেনন-উপাধি-ধারী এক ব্যক্তি তাঁহাকে চিঠি লিখিয়া জানিতে চাহিয়াছেন যে, 'মানভঞ্জন' গল্পের নায়িকা গিরিবালার পরে কি হইল? এবং ভদ্রলোক যদি নিজের নবজাতা কন্যার নাম গিরিবালা রাখেন তাহাতে রবীন্দ্রনাথের কোনো আপত্তি আছে কি না। রবীন্দ্রনাথ বাবাকে বলিলেন, 'আমি ভাবছিলুম তাঁকে আপনার কাছে refer করে দেব, গল্পের নামের copyright আছে কি না তা তো আমি জানি না।'

রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি বালিকা বন্ধুর কথা শোনা গেল। সকলেই চিঠি লেখে, বড়ো বড়ো উত্তর চায় এবং না পাইলে চটিয়া যায়, তাহাদের পত্রে উত্তর দিতে কবিকে মধ্যে মধ্যে বড়োই মুশকিলে পড়িতে হয়।

চিত্রকর Rothenstein-এর কন্যা Rachel রবীন্দ্রনাথকে চিঠিতে খবর দিয়াছে যে, তাহার calf-টার যদিও মাত্র দুই মাস বয়স, তাহা হইলেও এমন wonderful calf দেখা যায় না। সে যেমন বড়ো, তেমনি সুন্দর। আরো একটা খবর আছে যে Betty এখন আর caterpillar ধরে না। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, এখন এর উত্তর আমি কি দিই বলুন তো? বরং আমাকে যদি জিগগেস করতো যে Home Rule সম্বন্ধে তোমার কি বলবার আছে, তা হলে না-হয় অনেক কথা বলতুম, কিন্তু Betty এখন আর caterpillar ধরে না, এর উত্তরে কি বলা যায়? শান্তা, তুমি বলো তো একটা কিছু ভেবে।'

শান্তা অবশ্য ইহার উপযুক্ত উত্তর কিছুই দিতে পারিলেন না। সর্বাপেক্ষা ভালো চিঠি লিখিয়াছে একজন রেড ইন্ডিয়ান মেয়ে। সে রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি ইংরেজি প্রবন্ধ পড়িয়াছে ও কাগজে তাঁহার একটি ছবি দেখিয়া সেটি কাটিয়া রাখিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যদি তাহাদের দেশে যান তাহা হইলে বালিকা অত্যন্ত খুশি হয়, তাহার ধারণা East এবং West Indies-এর লোকেরা একই জাতের। ইন্ডিয়ান লোকদের সে খুব পছন্দ করে, তাহার ইচ্ছা যে সে একজন হিন্দুকে বিবাহ করে। বিবাহের ঘটকালির সুবিধার জন্যেই বোধ হয় সে নিজের চেহারার খুব নিখুঁত বর্ণনা পাঠাইয়াছে। তাহার চিঠি শেষ করিয়াছে সে এই বলিয়া, 'But don't think it is a love letter to you.' আমরা তো চিঠির কথা শুনিয়া হাসিয়া অস্থির। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'তার চিঠিতে এমন কিছু sentiment ছিল না, যাতে আমি তা মনে করতে পারি, তবু সে সাবধান করে দিয়েছে। আমি ভাবলুম, না-হয় লিখতেই বাপু আমাকে love letter, তাতে তোমার কোনো ক্ষতি হত না।'

নাইট-স্কুলের ছেলেদের ইতিমধ্যে খাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল, তাহারা কিছু দূরে বসিয়া পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করিয়া নিজেদের চিত্তবিনোদন করিতেছিল। রবীন্দ্রনাথ এই সময় উঠিয়া চলিয়া গেলেন। নাইট-স্কুলের শিক্ষক কয়েকজন অতঃপর খাইতে বসিলেন। মা তাঁহাদের পরিবেশন করিতে গেলেন। আমরা দুই বোনেও খাওয়া-দাওয়া সারিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। ছেলেদের সার্কাস এই সময় আরম্ভ হইল। যথারীতি কাপড়ের বেড়া দিয়া, চিৎকার করিয়া, টিন পিটাইয়া সার্কাস শুরু হইল। যথাসম্ভব

তাড়াতাড়ি গিয়াও দেখিলাম, খেলা ইহারই মধ্যে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। টিকিট খালি দুইরকম, এক বক্স, আর-এক সর্বসাধারণের জন্য। বক্সও একটি, তাহাতে দুইটি চেয়ার পাতা। একটি চেয়ারে রবীন্দ্রনাথ আসিয়া বসিয়াছেন, আর-একটি তখনো খালি, শুনিলাম উহা বাবার জন্য। সার্কাসে অবশ্য ছেলেদেরই খেলা শুধু দেখানো হইল, জন্তু-জানোয়ার কিছু ছিল না। ছেলেদের ভিতর দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ও সন্তোষবাবুর একটি ক্ষুদ্র ভাগিনেয়, ডাক নাম রুনী, এই দুইজনেই খুব বাহবা পাইল। সার্কাসে একটু ভাঁড়ামি থাকা দরকার। যতীন কর নামক একটি বালক আর-একটি সাথী লইয়া এই অংশের ভার গ্রহণ করিয়াছিল। ক্লাউনের খেলার নাম হইয়াছিল 'মোজাকে খেল'। 'মোজা'গুলি অবশ্য বালকবালিকারা যতটা উপভোগ করিল, আমাদের ততটা ভালো লাগে নাই, অবশ্য বিশেষ মন্দও লাগে নাই। সার্কাসে ব্যান্ডও বাজিল, ফাঁকা বন্দুকের আওয়াজও হইল। রবীন্দ্রনাথ খেলা শেষ হইবার কিছু আগে চলিয়া গিয়াছিলেন। আমরা যখন ফিরিতেছি তখন দেখিলাম তিনি তাঁহার নীচের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন। অন্ধকারেই বোধ হয় গলার স্বরে চিনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী সীতা, "মোজাকে খেল" কেমন দেখলে?'

এইভাবে সেবারকার নববর্ষের দিন শেষ হইল।

২রা ভোরবেলা উঠিয়াই একটা নিমন্ত্রণ লাভ করা গেল। শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায় চৌধুরীর পত্নী আসিয়া তাঁহার পুত্রের নামকরণ ও অন্নপ্রাশন উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। বাড়ির সকলেই তখন ঘুমাইতেছেন, আমিই তাঁহাদের বসাইলাম। রবীন্দ্রনাথ আচার্যের কাজ করিবেন শুনিয়া সকলকে তাড়াতাড়ি তুলিয়া দিলাম, এবং স্নানাদি সারিয়া যথাকালের আগেই গিয়া সুধাকান্তবাবুদের বাড়িতে উপস্থিত হইলাম। তখন সকলেই কাজে ব্যস্ত, রান্নাবান্নার আয়োজন খরস্রোতে চলিতেছে। শিশুকে স্নান করানো হইল। এবং হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্রে সজ্জিত করা হইল। সে কাপড় পরিতে যথারীতি আপত্তি প্রকাশ করিল। অধ্যাপক-কুটিরের সামনের বারান্দা, পূর্ণঘট আম্রপল্লব ও আলপনা দিয়া সাজানো হইল। রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহনবাবু উভয়ে আচার্যের কার্য করিলেন। শিশুর মুখে প্রথম অন্নদান রবীন্দ্রনাথই করিলেন, ও তাহার নাম রাখিলেন 'সৌম্যকান্ত'।

সেইদিনই কবির কলিকাতা যাত্রার কথা, দুপুরের ট্রেনে। নিজের জিনিসপত্র গুছাইবার জন্য এই সময় তিনি উঠিয়া চলিয়া গেলেন। শান্তিনিকেতনের গরম বৈশাখ মাসে বেশ ভয়াবহ, যাঁহারা উপভোগ করিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিবেন। খাওয়া-দাওয়া হইতে তখনো বেশ কিছু দেরি আছে, বুঝিতেই পারিলাম। এই রৌদ্রে হাঁটিয়া বাড়ি ফিরিতে তখন ইচ্ছা করিল না। কবির সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছায় তাঁহার বাড়িতেই চলিলাম, কারণ ইহার পর তাড়াতাড়ির মধ্যে হয়তো আর দেখা করার সুবিধাই হইবে না। সিঁড়ি তখন আগুনের মতো তাতিয়া উঠিয়াছে, তাহাই বাহিয়া দুই বোনে উপরে উঠিয়া দেখিলাম, রবীন্দ্রনাথ নিজের বই-খাতা সব গুছাইতেছেন। আমাদের দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি, বিদায় নিতে এসেছ?'

তিনি দাঁড়াইয়া বই গুছাইতেছিলেন, সুতরাং আমরাও দাঁড়াইয়াই কথা বলিতে লাগিলাম। অ্যান্ড্রুজ-সাহেব বড়ো চঞ্চল, দুদিন কোথাও স্থির হইয়া বসিতে পারেন না, কবির মুখে এই মন্তব্য শুনিয়া বড়ো কৌতুক অনুভব করিয়াছিলাম, কারণ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সে-সময়ে অন্তত এক জায়গায় স্থির হইয়া বসার জন্য বিখ্যাত ছিলেন না। অস্ট্রেলিয়ায় মেয়েদের পড়ানোর ব্যবস্থা খুব ভালো, সেই বিষয়ে কথা বলিতে বলিতে একবার বলিলেন, 'কিছু পড়তে চাও তো চলো-না? Lady doctor হতে চাও?' সবিনয়ে জানাইলাম সেরূপ কোনো ইচ্ছা আমার নাই।

হঠাৎ একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা, এখানকার গরম সহ্য হয়?'

আমি বলিলাম, 'এলাহাবাদে থাকতে এর চেয়ে বেশি গরমও সয়েছি তো। এখানে তত অসহ্য কিছু লাগে না।' কবি বলিলেন, 'শুধু গরম লাগা তো নয়। কিন্তু গ্রীষ্মের সময় এখানটায় কিরকম একটা desolation আসে, চারি দিক ধূ-ধূ করছে কেউ কোথাও নেই, সমস্ত আকাশটার যেন জ্বর হয়েছে, সব জড়িয়ে ভারি একটা desolate ভাব। আমার কিন্তু তখন নেহাত মন্দ লাগে না। আমি গরমকে কোনোকালেই বিশেষ আমল দিই নে, কাজেই আমার কষ্ট হয় না। গরম যে লাগছে সেটা মুখ ফুটে বললেই, গরম আরো বেড়ে ওঠে।' যাওয়া-আসা ও বিদেশ-বাস সম্বন্ধে কথা বলিতে বলিতে বলিলেন, 'আমি ভাবছি কাকে কি legacy দিয়ে যাই। আচ্ছা, আমার এই মোড়াগুলো নিয়ে যাও, বেশ ব'সে ব'সে গল্প করবে।' কিন্তু শেষ অবধি মোড়াগুলি আর দিলেন না। নিজের স্বল্প গৃহসজ্জার উপকরণগুলির উপর আর-একবার চোখ বুলাইয়া বিচিত্র কারুকার্য-সংযুক্ত দুটি শিকা'র দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'এই ঠিক মেয়েলি জিনিস, আমি তো আর মশলা-টসলা বাটি না, এ দুটো তোমাদেরই কাজে লাগবে।' শিকা-দুইটি তিনি নামাইয়া রাখিলেন। জিনিস-দুইটি দেখিতে ভারি সুন্দর ছিল, বহুকাল আমাদের কাছে ছিল, তাহার পর কালের প্রকোপে ধ্বংস পায়। আবার বলিলেন, 'যদি সাবমেরিন-টৈরিন-এ লেগে জাহাজ ডুবে যায় তা হলে তবু মনে রাখবে যে দুটো শিকে দিয়ে গিয়েছিল।' এইরকম ঠাট্টা চিরদিনই আমাদের সঙ্গে করিতেন। তাঁহার কাছে আসিবার পরম সৌভাগ্য যাহার কখনো হইয়াছে, সে যে ইহজীবনে অন্তত কোনোদিনও তাহাকে ভুলিতে পারিবে না, তাহা কি তিনি জানিতেন না?

নীচে আরো লোকজন তাঁহার সাক্ষাতের অপেক্ষায় আছে জানিয়া আমরা এইবার বিদায় লইয়া চলিয়া আসিবার চেষ্টা করিলাম। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'যতই যাবার আয়োজন করছি ততই কিন্তু মন বলছে, এবার তোমার যাওয়া হবে না। এক-একবার ভাবি থেকে যাই, আবার থাকতেও ইচ্ছা করে না। আমাদের এই খোলা মাঠের মধ্যে, এই নিস্তব্ধতার মধ্যে কেমন একটা মোহ আছে, সে কেবলি যেন বলে "এই ভালো।" কিন্তু এটা একটা মোহেরই আবরণ, একে ছিন্ন করে যেতে হবে।' তাঁহার দুই চোখ যেন তখন দেশকাল পার হইয়া কোন সুদূরের দিকে চাহিয়াছিল। জোর করিয়া আবার যেন মনকে ফিরাইয়া আনিলেন, আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'যদি না যাওয়া

হয় তা্ হলে চন্দননগর কি আর কোথাও গঙ্গার ধারে বাড়ি ভাড়া করে থাকব, দু-চারটে কবিতাও লিখতে পারি, যদি তোমরা যাও তা হলে শুনিয়ে দেব।' এইবার যাইবার সময় উপস্থিত বুঝিলাম, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ভারাক্রান্ত চিত্তে নামিয়া চলিয়া আসিলাম।

সুধাকান্তবাবুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। অতঃপর কয়েকবার প্রচণ্ড রোদে ঘোরাঘুরি করিয়া শরীরটা কিছু খারাপ বোধ হইতেছিল, তবে সঙ্গিনীদের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে সে কথা ভুলিয়া গেলাম। বড়োমা শৈলবালাকে খবর দিলেন যে বোলপুরের নিকটবর্তী এক গ্রামে একটা চিতাবাঘ কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। গ্রামবাসীরা সন্ত্রস্ত হইয়া সন্তোষবাবুকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে, তাহাদিগকে ব্যাঘ্রভয় হইতে উদ্ধার করিবার জন্য। সন্তোষবাবুর কাছে তখন একটি বন্দুক ছিল, আমরাও সেটি অনেকবার দেখিয়াছিলাম। শৈলবালার সেইদিন কলিকাতায় যাওয়ার কথা, এই সংবাদে কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া তিনি ব্যাঘ্র সম্বন্ধে আরো কিছু বিশদ সংবাদ জানিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু আর কোনো খবর পাওয়া গেল না।

দ্বিপ্রহরে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। সে সময় লোকের ভিড়ে আর তাঁহার কাছে যাওয়ার সুবিধা ঘটিল না। দিনুবাবুর বাড়ির বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাঁহার যাত্রাপথের দিকে তাকাইয়া রহিলাম, হয়তো তাঁহার বিদেশযাত্রার পূর্বে তাঁহাকে আর দেখিতে পাইব না মনে করিয়া মন অত্যন্ত বিষাদাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

বিকালবেলা বাড়িতে বসিয়া কি করিয়া সময় কাটানো যায় ভাবিতেছি, এমন সময় মুলু আসিয়া খবর দিল যে বাঘ আসার কথাটা নিতান্ত গল্প নয়, বড়ো কঠিন সত্য। কারণ অল্পক্ষণ আগেই দুইজন আহত গ্রামবাসীকে বিদ্যালয়ের হাসপাতালে আনা হইয়াছে, বাঘ তাহাদের আক্রমণ করিয়াছিল, গ্রামবাসীদের সমবেত চিৎকার এবং ইট-পাটকেল ছোঁড়ার ফলে এখন একটি পুকুরপাড়ের ঝোপের ভিতর গিয়া বসিয়া আছে, তাহাকে কেহই সেখান হইতে বাহির করিতে পারিতেছে না। ঐ স্থানটির নাম তালতোড়। চারি দিকের ছোটো ছোটো গ্রামের অধিবাসীরা অত্যন্ত ভয় পাইয়া গেল। আশ্রমেও মহা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। নানারকম কথা শোনা যাইতে লাগিল, একজন অধ্যাপকপত্নী বলিলেন, তিনি রাত্রে বাঘের ডাক শুনিতে পাইয়াছিলেন। আরো শুনিলাম, সন্তোষবাবুর গোশালার অতিকায় মহিষটা রাত্রে শিকল ছিঁড়িয়া কাহাকে যেন তাড়া করিয়া গিয়াছিল। গরমের সময় আশ্রমবাসীদের ভিতর অনেকেই খোলা বারান্দায়, উঠানে, এমন-কি খোলা মাঠেই শুইয়া থাকিতেন, সুতরাং এ-হেন সংবাদে সকলেই বিশেষভাবে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। আদ্যবিভাগের কয়েকজন বড়ো বড়ো ছেলে লাঠি, ভোজালি, রাম-দা, যে যাহা পাইল তাহা লইয়াই বাঘ শিকার করিতে যাত্রা করিল। সন্তোষবাবু তখন পা ভাঙিয়া শুইয়াছিলেন, তাঁহার যাওয়া চলিল না। ক্রমে অধ্যাপকেরা, মাঝারি ছেলেরা এবং অবশেষে শিশুবিভাগের বাচ্চার দলও যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইল। এখন ভাবিলে অবাক লাগে যে কেহ তাহাদের বারণ করে নাই কেন। সাধারণ বাঙালি ছেলের তো শুধু-হাতে বাঘ মারিতে

যাওয়ার উৎসাহ কখনো হয় না, হইলেও অভিভাবকবর্গ তাহাতে উৎসাহ মোটেই দেন না। তখনকার আশ্রমের আবহাওয়াই ছিল অন্যরকম।

আমরা অবশ্য তালতোড়ে যাইতে পারিলাম না, নিজের নিজের বারান্দা এবং উঠানে দাঁড়াইয়া পথের দিকে উদবিগ্নভাবে তাকাইয়া রহিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার যখন প্রায় নামিয়া আসিতেছে তখন মুলু দূর হইতে চিৎকার করিয়া খবর দিল যে বাঘটা মারা পড়িয়াছে। কে মারিয়াছে তাহা অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াও কোনো উত্তর পাইলাম না, সে ঐটুকু খবর দিয়াই আবার কোথায় দৌড়াইয়া চলিয়া গেল। আমরাও এবার রাস্তায় বাহির হইয়া আসিলাম। ভাবিলাম, যদি এধার-ওধার হইতে কোনো সংবাদ সংগ্রহ করা যায়। যখন শান্তিনিকেতনের সীমান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছি তখন শুনিতে পাইলাম, রাস্তায় একটি লোক আশ্রমের একজন চাকরকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'বাঘটা কে মারল হে?' চাকরটি অত্যন্ত গর্বের সঙ্গেই উত্তর দিল 'ইস্কুলের ছেলেবাবুরা।'

এমন সময় দেখা গেল সেই খোয়াইপারের তালবন হইতে পিল পিল করিয়া ছেলের দল বাহির হইতেছে। প্রথমে ব্যাপার ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। পরে একটি গোরুর গাড়িও বাহির হইল, সেটাকে ছেলেরা তৎক্ষণাৎ এমনভাবে ছাঁকিয়া ধরিল যে সেটা আর দেখাই গেল না। আমরাও মাঠের উপর দিয়া সেই দিকে চলিলাম। গোরুর গাড়িটা অপেক্ষাকৃত কাছে আসার পর দেখা গেল যে তাহার উপর একটি লাল গামছাকে পতাকা করিয়া টাঙাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এতক্ষণে আশ্বস্ত হইয়া ভাবিলাম, গোরুর গাড়িতে করিয়া শিকারই আসিতেছে, কোনো আহত শিকারী নয়। সন্তোষবাবুর গোয়ালের কাছাকাছি আসিয়া গাড়িটা দাঁড়াইয়া গেল। ছেলের দল প্রচণ্ড উৎসাহে তখন এত কথা বলিতেছে এবং চিৎকার করিতেছে যে, প্রথমে ভালো করিয়া কিছু বুঝিতেই পারিলাম না। উত্তেজনা একটু কমিলে পর শ্যামকিশোর বলিয়া একটি ছোটো ছেলে বলিল, 'নরভূপদা আধঘণ্টা ধরে বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে মেরেছেন।' আবার সমবেত কলরব! বাঘ মারার কতরকম বর্ণনা যে শুনিলাম তাহার আর ঠিক-ঠিকানা নাই। কয়েকজন বড়ো ছেলে গাড়ির উপর উঠিয়া বাঘটাকে টানিয়া দাঁড় করাইয়া সকলকে দেখাইয়া দিল। মাঝারিগোছের চিতা বাঘ, মাথাটা ভোজালির আঘাতে প্রায় দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন। আশ্রমের বলীশ্রেষ্ঠ দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়কে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম বাঘটাকে কে মারিয়াছে, সে বলিল তাহারা পাঁচজন ছেলে মিলিয়া মারিয়াছে, অবশ্য বেশিরভাগ লড়িয়াছে নরভূপ। পাঁচজনের নাম তখন শুনিয়াছিলাম, এখন ভালো মনে নাই। নরভূপ ও দ্বিজেন বাদে বোধ হয় ক্ষিতিমোহনবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র বীরেন সেন সেই দলে ছিলেন, কালীমোহন ঘোষ মহাশয়ের একজন ভাগিনেয়ও ছিলেন বোধ হয়। নরভূপকে একবারও দেখিলাম না, শুনিলাম বাঘটা তাহাকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া দেওয়ায় তাহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। আরো দুই-একজনের হাতে-পায়ে বেশ সাংঘাতিক আঁচড়ের চিহ্ন দেখিলাম। চিতাবাঘ হইলেও বাঘ তো বটে, নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়া এই ছেলেগুলি যেভাবে লাঠি ও ভোজালির সাহায্যে সেটাকে মারিয়া আনিয়াছিল, তাহাতে

যতটা প্রশংসা তাহারা পাইল তাহার চেয়ে বেশিই তাহাদের পাওনা ছিল। শুনিলাম স্থানীয় এক জমিদার-পুত্র একটা ভাঙা বন্দুকের সাহায্যে বাঘটাকে একবার গুলিও করিয়াছিলেন, তবে সেটা তাহার মুখে লাগাতে সে বিশেষ জব্দ হয় নাই। বন্দুকটি তিনি পরে আশ্রমের ছেলেদেরও দিয়াছিলেন, তাহারা সেটিকে গদারূপে ব্যবহার করিয়া তাহার বন্দুকলীলা প্রায় সাঙ্গ করিয়া দিয়াছে।

গোরুর গাড়ি আবার চলিল এবং আশ্রমের গণ্ডির ভিতর আসিয়া দাঁড়াইল। যে যে আগে দেখিতে পায় নাই, সকলে ভিড় করিয়া বাহির হইয়া আসিল। ছেলের দল মিলিয়া শিকারীদের জয়ধ্বনি শুরু করিল, সে আর থামেই না। রবীন্দ্রনাথকে ট্রেনেই টেলিগ্রাম করা হইল, চিঠিও একখানা তখনি লেখা হইয়া গেল। তিনি বেশি আহত ছেলেগুলিকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতে বলিলেন।

রাত্রেই আবার আশ্রমের মধ্যে একটা বড়ো সাপ মারা হইল। শিকার-পর্বেই সারাটা দিন কাটিয়া গেল। তাহার পর হইতে রোজই খবর পাওয়া যাইত যে নিকটস্থ কোনো গ্রামে আর-একটা বাঘ বাহির হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে সে বাঘটা শেষ পর্যন্ত চক্ষুর অগোচরেই থাকিয়া গেল।

ইহার দিন-দুই পরে আমরা কি একটা কারণে দিন কয়েকের জন্য কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। যাত্রাটা বড়ো অশুভ লগ্নে করিয়াছিলাম বোধ হয়, এত দুর্ভোগ জীবনে আর কখনো ভুগিতে হয় নাই। স্টেশনে গিয়াই দেখিলাম যে মেয়েদের গাড়িতে তিল রাখিবার জায়গা নাই, অগত্যা পুরুষদের গাড়িতেই উঠিতে হইল। সহযাত্রীদের অভব্য ব্যবহারে বিষম বিরক্ত হইয়া আড়ষ্টভাবে বসিয়া কোনোমতে হাওড়া স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। পথেই বৃষ্টি হইতেছিল, সে বৃষ্টি যে কলিকাতায় মহাপ্লাবনের রূপ ধরিয়াছে তাহা ট্রেনে থাকিতে বুঝিতে পারি নাই, ট্রেনের মধ্যেই দুই-একবার যদিও ছাতা খুলিয়া বসিতে হইয়াছিল। হাওড়ায় নামিয়া দেখা গেল, স্টেশনের কম্পাউণ্ডের ভিতর একখানি গাড়ি বা ট্যাক্সি নাই, কুলিরা বলিল প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির চোটে সব গাড়োয়ান পলায়ন করিয়াছে। স্টেশনের বাহিরে আসিয়া দুইখানি অচল ট্যাক্সির দর্শন লাভ করা গেল। কুলিরা অনেক হাঁকাহাঁকি করিয়া একখানি সচল ট্যাক্সি জোগাড় করিল। প্রচুর বকশিস পাইবার আশায় চালক সমস্ত লটবহর-সমেত আমাদের তুলিয়া লইয়া শৃঙ্গধ্বনি করিয়া তো বাহির হইয়া পড়িল, কিন্তু হ্যারিসন রোডের মাঝামাঝি আসিতে-না-আসিতে আমরা এক বিপুল জলস্রোতের মধ্যে গিয়া পড়িলাম। ড্রাইভার আতঙ্কিতভাবে গাড়িকে পিছন হটাইয়া আবার শুষ্ক ডাঙায় ফিরিয়া আসিল। চিৎকার করিয়া আশেপাশের দোকানদারদের জিজ্ঞাসা করিল সামনে জল কতখানি। উত্তরে যাহা পাওয়া গেল তাহা সম্পূর্ণ নৈরাশ্যজনক। বাবা তাহাকে বলিলেন, আর কোনো রাস্তা দিয়া কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে পৌঁছানো যায় কি না দেখিতে। ইহার পর ঘণ্টাখানিক যেভাবে ভ্রমণ করিলাম তাহাকে ঠিক উপভোগ্য বলা যায় না। কলিকাতা যেন সেদিনকার মতো Venice-এর রূপ ধারণ করিয়াছিল, ট্যাক্সি যে পথেই যাইতে চেষ্টা করে, খানিক পরে ঝুপ করিয়া এক কোমর জলে গিয়া পড়ে। পথ

অপথ বিপথ, পাটগুদাম, মহিষের আস্তানা, কত জায়গায় যে ঘুরিলাম তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই। বৃষ্টি সমানে চলিয়াছে, গায়ের কাপড় একবার করিয়া ভিজিতেছে আবার গায়েই শুকাইতেছে। একবার একটা ঘোড়ার গাড়ি আসিয়া হুড়মুড় করিয়া ট্যাক্সির ঘাড়ে পড়িল, অল্পের জন্য ঘোড়ার কামড় খাইতে হইল না। ঘণ্টাখানিক ঘোরার পর বোঝা গেল যে ট্যাক্সি চড়িয়া অন্তত বাড়ি পৌঁছানো যাইবে না, স্টেশনেই ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমাদের সারথি এইবার বলিলেন যে তিনি পথ চিনিতে পারিতেছেন না। যাহা হউক, কোনোমতে হাওড়া স্টেশনে ফিরিয়া আসিলাম। তখন ওয়েটিং রুমগুলি সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কাজেই বিরাট গাড়িবারান্দার এক কোণে একপাল কুলির মধ্যে নিজেদের বাক্স-বিছানার উপর বসিয়া রহিলাম। ঝড়বৃষ্টির প্রবল ঝাপ্‌টা হইতে তো বাঁচিলাম। সেই অনন্তবিস্তৃত জলরাশির মধ্যে এক ভীত পাঞ্জাবির উপর নির্ভর করিয়া অন্ধকারে রাত্রে ঘুরিয়া বেড়ানোর পর এই সামান্য আশ্রয়টুকুও অমূল্য বোধ হইতেছিল। ট্যাক্সিওয়ালা ভাড়া গনিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। দেখিলাম, তখনি আর-একজন অসমসাহসী যাত্রী তাহাকে ডাকিয়া গাড়িতে চড়িয়া বসিলেন। তাঁহাকে যে ড্রাইভার-পুঙ্গব কোন খানায় বা জলাশয়ে নামাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা আর জানিতে পারিলাম না। কুলির ভিড়ের ভিতর ভিজা কাপড় বদলানো গেল না, আপাদমস্তক সিক্ত বস্ত্র লইয়াই বসিয়া রহিলাম। স্টেশনে ফিরিতে পারিয়াই যেন আমাদের ভয়-ভাবনা সব দূর হইয়া গিয়াছিল, নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলাম। অল্প বয়সে মানুষের শারীরিক সহ্যশক্তি বেশি থাকে এবং মন থাকে কল্পনাপ্রবণ, বাস্তবের আঘাত তাহাকে সহজে ধরাশায়ী করে না। এখন হইলে এই নৈশভ্রমণের ধাক্কা সামলাইতে কতদিন লাগিত কে জানে? তখন ইহা একটা খুব হাসিবার জিনিস মনে হইয়াছিল। একজন রেলওয়ে কর্মচারী এবং একজন পুলিস সার্জেন্ট আমাদের উদ্ধার করিবার অনেক চেষ্টা করিল, তবে চেষ্টাগুলি কোনো কাজে লাগিল না। বাবাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া তাহারা ওয়েটিং রুম খুলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু যে সাহেবের হাতে তখন এ-সবের ভার ছিল তিনি বলিলেন, একবার এইরূপ অবস্থায় অসময়ে ওয়েটিং রুম খুলিয়া তিনি দশ টাকা জরিমানা দিয়াছেন, আর বেলতলায় যাইতে রাজি নহেন। অতঃপর আরো খানিক ঘোরাঘুরি করিয়া তাহারা একখানা ঘোড়ার গাড়ি জোগাড় করিয়া আনিল, সার্জেন্ট বলিল সে সাইকেলে করিয়া আমাদের সঙ্গে গিয়া বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে। কিন্তু গাড়োয়ান মহা চেঁচামেচি জুড়িয়া দিল যে তাহার ঘোড়ার পায়ের নাল পড়িয়া গিয়াছে, এমন অবস্থায় সে সওয়ারি লইতে সাহস করে না। আমরাও তাহার গাড়িতে উঠিতে সাহস করিলাম না। ঘণ্টা-তিন এইভাবেই কাটিয়া গেল। দুইটি মুসলমান যুবক এই সময় কোথা হইতে আসিয়া জুটিল। আমাদের অবস্থা দেখিয়া তাহারাও সাহায্য করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিল। সেই বৃষ্টির মধ্যে বাহির হইয়া খানিক পরে তাহারা আর-একটা ঘোড়ার গাড়ি ডাকিয়া আনিল। আবার পোঁটলা-পুঁটলি লইয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিলাম। অশুভ যাত্রার ফল তখনো সবটা কাটিয়া যায় নাই, মেছুয়াবাজার স্ট্রিটের কাছে আসিয়া গাড়ি আবার এক জায়গায় কাত হইয়া প্রায় উল্টাইয়া

পড়িল। একটা খোলা ম্যান্‌হোলে তাহার চাকা ঢুকিয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, সলিলসমাধি লাভ করা সে-যাত্রা অদৃষ্টে ছিল না, উদ্ধার লাভ করিয়া রাত তিনটার সময় বাড়ি আসিয়া পৌঁছিলাম। জিনিসপত্র গুছাইয়া তুলিতে, ভিজা কাপড় ছাড়িতে ও বিছানা করিতে করিতেই প্রায় ভোর হইয়া গেল।

পাড়ার এই সময় কয়েকজন বাল্যসঙ্গিনীর উপরি উপরি বিবাহ হইয়া গেল। কনেদের বস্ত্রালংকার দেখা, বরের গল্প শোনা, আইবুড়োভাত ও বিবাহের নিমন্ত্রণ খাওয়া প্রভৃতির মধ্য দিয়া কয়েকটা দিন দ্রুতবেগে কাটিয়া গেল।

১৯১৮-র ২৪ এপ্রিল বিচিত্রায় একটা সভা হইল। কার্ডে দেখিলাম 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' হইবে। জোড়াসাঁকো পৌঁছিলাম যখন তখন মহিলা অতিথি আর কেহ আসেন নাই। প্রতিমা দেবীর সাক্ষাৎ পাইলাম উপরে উঠিয়াই। দু'তলার ঘরের সজ্জার একটু পরিবর্তন দেখা গেল, অবগুণ্ঠিত বৈদ্যুতিক আলোর পরিবর্তে বড়ো বড়ো চিত্র-বিচিত্র জাপানি লন্ঠন আলোক বিতরণ করিতেছে। মীরা দেবীর পুত্র ও কন্যার সঙ্গেও দেখা হইল। নীতু শান্তিনিকেতনে যেমন সারাক্ষণ মিষ্ট গলায় গল্প করিত এখানে তাহা করিল না, সলজ্জ হাসি হাসিয়া পলায়ন করিল। নন্দিতা তখন সবে হাঁটা-চলা আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি খুব ব্যস্তভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, মালীরা ফুলদানিতে যত ফুল সাজাইয়াছিল, সবগুলি টানিয়া বাহির করিতেছিলেন। একটি ফুল হাতে করিয়া কিছুক্ষণ সংগীতচর্চাও করিলেন। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ আসিয়া প্রবেশ করিলেন। কাছে গিয়া প্রণাম করাতে বলিলেন, 'এই যে তোমরা এসেছ, আমি রোজ ভাবি একবার তোমাদের বাড়ি যাবো, তা এখানে এসে এমন politics-এর পাল্লায় পড়েছি যে কিছুতেই আর সময় হয়ে ওঠে না।' চেহারা অনেক খারাপ দেখিলাম। অমানুষিক ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তিনি অন্তরের বেদনা চাপিয়া বাহির-সংসার ও জনসাধারণের দাবি মিটাইয়া চলিতেন, কিন্তু সংগ্রামের চিহ্ন সবটাই চাপা দিতে পারিতেন না, মুখশ্রীর ভিতর শ্রান্তি ফুটিয়া উঠিত অনেক সময়ই। দুই-তিন মিনিট পরেই কি একটা প্রয়োজনে তিনি নীচে নামিয়া গেলেন, যাইবার আগে নাতনীকে বলিয়া গেলেন, 'যদিও তুমি ভদ্র বেশভূষা করে এসেছ, তবুও তোমার এ সভায় থাকা চলবে না।'

ক্রমে ক্রমে অভ্যাগত-সমাগম হইতে লাগিল। সভার কাজ আরম্ভ হইতে প্রায় সাড়ে সাতটা বাজিল। ভদ্রলোক কয়েকজন উপরে উঠিয়া আসিবার পর রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে আসিয়া বলিলেন, 'তোমরা এবারে নিজেদের সিংহাসন অধিকার করো গিয়ে।' আমরা এতক্ষণ পুরুষদের বসিবার স্থানটি অধিকার করিয়া বসিয়াছিলাম, এখন নিজেদের নির্দিষ্ট আসনে গিয়া বসিলাম।

'বিচিত্র প্রসঙ্গে'র মধ্যে হইল গান বাজনা এবং কবিতাপাঠ। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী, নলিনী দেবী এবং অরুন্ধতী সরকার বাজাইলেন, গানের দলে ছিলেন কবি স্বয়ং, অজিতকুমার চক্রবর্তী এবং একজন অপরিচিত ভদ্রলোক। কবিতা পাঠ অবশ্য রবীন্দ্রনাথ একলাই করিলেন। একটি নূতন কবিতা ও একটি আগেকার লেখা। সভা শেষ হইল

Moonlight Sonata দিয়া। ইহার পর অনেকক্ষণ বসিয়া যথেচ্ছ গল্প চলিতে লাগিল। সাড়ে-নয়টা বাজে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের কাছে বিদায় লইতে গেলাম। বেশ একটি ব্যূহ অতিক্রম করিয়া তবে তাঁহার কাছে পৌঁছিতে পারিলাম। আমি প্রণাম করাতে হঠাৎ মুখ তুলিয়া তাকাইয়া বলিলেন, 'ভালো কথা, আমার শিকে-দুটো কি করলে বলো।' বলিলাম, সেগুলি নিরাপদেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আশে-পাশের কয়েকজন ভদ্রলোক তাঁহার মুখে এমন কথা শুনিয়া বিস্মিত মুখ করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। বাড়ি ফিরিতে অনেক রাত হইয়া গেল।

১লা মে বিচিত্রা-সম্মিলনীর আর-একটি অধিবেশন হইল। এবার আরম্ভ হইল দিনেন্দ্রনাথের গান দিয়া। তাহার পর রবীন্দ্রনাথ কাব্য সম্বন্ধে অল্প কিছু বলিলেন এবং নিজের নবরচিত একটি কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন। ইহার পর উপস্থিত কবিবৃন্দকে তিনি তাঁহাদের রচনা কিছু পড়িয়া শুনাইতে বলিলেন, কিন্তু কেহই কিছু পড়িতে সম্মত হইলেন না। মীরা দেবী বলিলেন, 'এ যে দেখি আমাদের আশ্রমের মেয়েদের সাহিত্য-সভার দশা।'

বোমানজি নামক এক পার্শী ভদ্রলোক এবং রংপুর কলেজের ইংরেজ প্রিন্সিপ্যাল উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও যাহাতে কিছু রস উপভোগ করিতে পারেন এইজন্য কবি গুটিকয়েক ইংরেজি কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন। কে একজন ইহার পর তাঁহাকে বিদায় অভিশাপ পড়িয়া শুনাইতে বলিলেন। তিনি সমস্তটি পড়িয়া শুনাইলেন। 'বিদায় অভিশাপ' পড়া শেষ হইলে আর-একটি নূতন কবিতা পড়িলেন।

রবীন্দ্রনাথের পাঠের পর সভায় উপস্থিত এক ভদ্রলোক 'বলাকা'র 'তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে' কবিতাটি পাঠ করিলেন। কবির কবিতা পাঠের পর এটি শুনিতে আমাদের একেবারেই ভালো লাগিল না। ভাবিতে লাগিলাম, রবীন্দ্রনাথ ভদ্রলোককে পড়িতে না বলিলেই ভালো হইত।

তখনি বাড়ি ফেরা গেল না, মীরা দেবীর সঙ্গে তাঁহাদের তিনতলার ঘরে গিয়া বসিলাম। পথে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হইল, তিনি দাঁড়াইয়া কয়েকজন অভ্যাগতের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। আমাদের দেখিয়া দুই-চারিটি কথা বলিলেন। বাবা যদি এত ঘন ঘন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন তাহা হইলে গভর্নমেন্ট তাঁহাকে পাসপোর্ট দিবেন না বলিয়া কিঞ্চিৎ কৃত্রিম শঙ্কা প্রকাশ করিলেন। অতঃপর উপরে গিয়া খানিক গল্পস্বল্প করিয়া কিঞ্চিৎ রাত করিয়াই বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

দুই-তিনদিন পরেই হঠাৎ শোনা গেল যে এখনকার মতো রবীন্দ্রনাথের যাওয়া বন্ধ হইল। তখন প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ পর্ব চলিতেছে, ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরেও জর্মান সব্‌মেরিন ও যুদ্ধজাহাজ দেখা গিয়াছে বলিয়া রব উঠিল। আত্মীয়বন্ধুদের প্রচণ্ড আপত্তির ফলেই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ তখন যাত্রা স্থগিত করিলেন।

২৫ বৈশাখ কবির জন্মদিন উপলক্ষে নিমন্ত্রণ পাইলাম। ইহা ১৯১৮ খৃস্টাব্দে ৮ কি ৯ মে অনুষ্ঠিত হয়। সেইদিনই দুপুরবেলা প্রতিবেশিনী এক তরুণীর গায়েহলুদ ছিল,

সেখানে নিমন্ত্রণ খাওয়া সারিয়া বাড়ি ফিরিতেই বেলা পড়িয়া গেল। তাহার উপর প্রচণ্ড বেগে বৃষ্টি শুরু হইল, ভয় হইতে লাগিল যে শেষ পর্যন্ত জোড়াসাঁকো যাওয়াটাই না বাদ পড়িয়া যায়। যাহা হউক, সন্ধ্যার সময় বৃষ্টি ধরিয়া আসিল, আমরাও যাত্রা করিলাম। পৌঁছিয়া শুনিলাম, বসিবার জায়গা এবার গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বৈঠকখানায় করা হইয়াছে। বিচিত্রার দোতলায় খাওয়ানো হইবে, তাহা এখন হইতে সেইভাবে সাজানো হইতেছে, সেখানে সভা চলিবে না। তখনো অনেকেই আসেন নাই, সুতরাং গগনবাবুদের বৈঠকখানায় না বসিয়া আমরা প্রতিমা দেবীর ঘরে গিয়াই বসিলাম। এণা দেবী অসুস্থ ছিলেন, তাঁহাকেও একবার তাঁহাদের ঘরে গিয়া দেখিয়া আসিলাম। এইবার সভা আরম্ভ হইবে শুনিয়া একটি বালিকা পথ-প্রদর্শিকার সঙ্গে ৫নং বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। রবীন্দ্রনাথও প্রায় সেই সময়েই সভায় প্রবেশ করিলেন। সকলেই তাঁহাকে অভিনন্দন ও প্রণাম করিয়া ফুলের মালা পরাইতে লাগিলেন, তাঁহার নাতি নাতনী ও নাতবউ সম্পর্কের যাঁহারা তাঁহারাই হইলেন অগ্রণী।

ফুলের মালার ভার যখন কিছু ভয়াবহ হইয়া উঠিল তখন কবি বলিলেন, 'না, আর বহন করতে পারব না, নাতনী-নাতবউদের সব মালাই গ্রহণ করেছি, কিন্তু নাতিদের বেলায় আমি ঐখানেই গণ্ডি টানছি।' অগত্যা অবশিষ্ট যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা তাঁহার হাতেই মালা দিয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর আসিতে একটু দেরি হইয়াছিল, এইজন্য গান-বাজনা তখনো আরম্ভ হয় নাই। তিনি আসার পর গান আরম্ভ হইল। পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী প্রথমে দুইটি গান করিলেন। কিছুক্ষণ পরে অজিতবাবু একটি গান গাহিলেন, এবং তাহার পর রবীন্দ্রনাথ, শ্রীমতী সুপ্রভা রায়, রমা দেবী ও অজিতবাবু মিলিয়া আর-একটি গান করিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবির জন্মোৎসব উপলক্ষে রচিত একটি কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন। কবিতাটি শুনিয়া সকলেই অতিশয় প্রীত হইলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গানের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে ছোটো একটি বক্তৃতা করিলেন। উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগকে লাগাম ছাড়িয়া দেওয়ার বিরুদ্ধে কিছু বলিলেন, সেই সময় দুই-একজন ভদ্রলোকের কাতর মুখের ভাব দেখিয়া আমাদের হাস্যসংবরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। ইঁহারা আমাদের তখনকার কালে উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ প্রকাশের জন্য কিঞ্চিৎ কুখ্যাতই ছিলেন। ইহার পর আরো অনেকগুলি গান হইল, বেশির ভাগই 'মায়ার খেলা'র গান। গুটিকয়েক বর্ষার গানও হইল, তখন বাহির হইতে মৃদঙ্গের গুরুগম্ভীর ধ্বনি শোনা গেল। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি 'মায়ার খেলা'র গানের মধ্যে হঠাৎ উঠিয়া দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেলেন।

গানের আসর শেষ হইল প্রায় রাত সাড়ে-নয়টার সময়। সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথ 'তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে' গানটি গাহিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন। অনেকেই জোর করিয়া চোখের জল সংবরণ করিলেন।

পুরুষ-অতিথিরা তাড়াতাড়ি বিচিত্রার দিকে অগ্রসর হইলেন, কারণ রাত হইয়াছিল অনেক। আমরা মেয়েরা রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করিবার জন্য পিছাইয়া রহিলাম। তাঁহাকে

প্রণাম করিয়া ও দুই-চারিটি কথা বলিয়া, তাঁহার পিছন পিছন গিয়া আমরাও বিচিত্রার দোতলায় উঠিলাম। ঘরটি ভারি চমৎকার সাজানো হইয়াছিল, এখনো যেন সব চোখের সম্মুখে দেখিতে পাই। 'বিচিত্রা' সেদিন শুধু বিচিত্রা নয়, অপরূপা হইয়া উঠিয়াছিল। আলপনায় আলোকে ও ফুলসজ্জায় ঘরটি যেন ইন্দ্রপুরীর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ঘরের চারি ধার ঘুরাইয়া আসন করা হইয়াছিল, আসনের সারি সম্মুখে পশ্চাতে আলপনার ছবি। প্রত্যেক অতিথির বসিবার জায়গায় তাঁহার নাম লেখা একখানি কার্ড, পাছে স্থানচ্যুত হয় বলিয়া এক-একটি অস্ফুট পদ্মকলিকার দ্বারা কার্ডগুলি চাপা রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের আসনের পাশেই আমার নামের কার্ড রহিয়াছে দেখিয়া বিস্ময়ে ও পুলকে বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল।

রবীন্দ্রনাথ বসিবার পরে অতিথিরা নিজের নিজের স্থানে গিয়া বসিলেন। নাম লেখা থাকা সত্ত্বেও দুই-একটি ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত ভুল হইল। রবীন্দ্রনাথের অপর পার্শ্বের আসনটি ছিল শ্রীমতী কমলা সরকারের। আর-একটি তরুণী আসিয়া গায়ের জোরে সেখানে বসিয়া পড়াতে, যাঁহার স্থান তিনি বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইলেন। একজন কর্মকর্তা ভুল সংশোধন করিবার একবার চেষ্টাও করিলেন, তবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তরুণীটিকে তাহাতে টলানো গেল না।

অমন লোভনীয় স্থানে বসিয়া, পরম আনন্দ উপভোগ করিলাম বটে, তবে খাওয়াটা মোটেই হইল না। প্রসন্নময়ী দেবী আমার নিকটেই বসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে উৎসাহিত করিবার জন্য বাল্যকালে তাঁহারা কিরূপ খাইতে পারিতেন তাহার অনেক গল্প শুনাইলেন, কিন্তু আমার তাহাতেও কিছু লাভ হইল না। একজন কর্মকর্তা আমি কিছু খাইতেছি না কেন জিজ্ঞাসা করাতে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'তোমরা ওকে যথেষ্ট আদর-যত্ন কর নি, তাই বিরক্ত মুখ করে বসে আছে, যদিও আমি ওকে খেতে বলেছিলুম।'

আহারাদির পর আবার গানের আসর বসিল। তবে তখন রাত হইয়া গিয়াছে অনেক, বেশিক্ষণ আর বসা চলিল না। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কয়েক মিনিট গল্প করিয়া .ও রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম, তখন রাত সাড়ে-এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে।

১২ মে রবিবার ছিল। গ্রীষ্মের জন্য মাস-দেড়েক বিচিত্রা সম্মিলনী বন্ধ থাকিবে, তাই এই দিন ছুটির আগেরদিন বলিয়া একটা অধিবেশন হইয়া গেল। বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করিব বলিয়া নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই আমরা গিয়াছিলাম। তিনতলায় উঠিয়া ছাদে বসিয়া কিছুক্ষণ গল্প করা গেল। জোড়াসাঁকোর বিরাট বাড়ির সবটা তখনো আমরা দেখি নাই, সেদিন আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া অনেকখানি দেখিয়া আসিলাম। রবীন্দ্রনাথের থাকিবার ঘরও দেখিয়া আসিলাম। তাহার পর সভার সময় হইয়াছে দেখিয়া চলিলাম সভাস্থলে।

বিচিত্রা দেখিতে দেখিতে ভরিয়া উঠিল। তবে সেদিন আসর তেমন জমিল না। একজন অখ্যাতনামা বিদেশিনী মহিলা কবি ও তাঁহার স্বামী সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া

সব-কিছুতে কেমন যেন বেসুর লাগাইয়া দিলেন। রবীন্দ্রনাথকে বাধ্য হইয়া অনেকক্ষণ বসিয়া তাঁহাদের কথা শুনিতে হইল, এবং নিজেকেও কথা বলিতে হইল। নূতন অভ্যাগতদের খাতিরে গুটি-দুই ইংরেজি কবিতাও পড়িয়া শুনাইলেন। তাহার পর সকলের অনুরোধে বাংলা কবিতা পড়িলেন এবং 'চিরকুমার-সভা'র খানিকটা পড়িয়া শুনাইলেন। কিন্তু শ্রোতাদের ভিতর দুইজন কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না, বোকার মতো মুখ করিয়া বসিয়া আছে, ইহাতে তিনি নিজেই যেন কেমন নিরুৎসাহ হইয়া গেলেন। তাঁহার পড়া শেষ হইতেই এক ভদ্রলোক ছুটিয়া আসিয়া কবিকে অনুরোধ করিলেন যে তিনি যদি ঐ মহিলা কবিকে তাঁহার রচনা পড়িয়া শুনাইতে বলেন তো ভালো হয়। রবীন্দ্রনাথ অনুরোধ করিবামাত্র মহিলা তৎক্ষণাৎ রাজি। দাঁড়াইয়া উঠিয়া নিজের কবিতার পুস্তক খুলিয়া অনর্গল পড়িয়া চলিলেন, থামিবার আর নামই করেন না। সে উৎকট কবিতা এখনো কিছু কিছু মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ স্থির হইয়া বসিয়া শুনিতেছেন, সুতরাং আমরা উঠিয়া পলাইতেও পারিলাম না, যতক্ষণ কর্মভোগ ছিল বসিয়া শুনিতে হইল। অবশেষে মেমসাহেব থামিলেন এবং আরো কিছুক্ষণ সৌজন্যের আদান-প্রদান করিয়া স্বামীসহ প্রস্থান করিলেন। আমরা তো হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। ইঁহারা চলিয়া যাওয়ার পর আশা হইল যে অতঃপর হয়তো কবির রচনা কিছু শুনিতে পাইব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন তিনি তখন আর কিছু না করিয়া সভা ভঙ্গ করিয়া দিলেন। আমরাও অল্প পরেই বাড়ি ফিরিলাম।

পরদিন ১৩ মে সকালে রবীন্দ্রনাথ একবার আমাদের বাড়ি বেড়াইতে আসিলেন। সেদিন আবার ঠিকা রাঁধুনীটি আসে নাই, রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তবু কোনোমতে বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গেলাম, এবং খানিক রান্নাঘরে খানিক বাবার ঘরে পালা করিয়া বসিয়া দুই দিক বজায় রাখিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম। কবি তাঁহার শিলাইদহের জীবনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'যেমন করে হোক আমাকে আবার তার মধ্যে ফিরে যেতে হবে। এখানে আমার চলবে না। ওখানে না থাকলে বোধ হয় আমি গোরা লিখতে পারতুম না।'

আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা আর বোলপুরে যাবে না?' বলিলাম, 'ছুটির শেষে যাব।' তিনি বলিলেন, 'কেন, ছুটির মধ্যে গেলে কোনো দোষ আছে?' বাঁকুড়া জায়গাটা কিরূপ সে-বিষয়ে মায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলিলেন, তাহার পর আমাদের শান্তিনিকেতনের ক্ষুদ্র কুটিরটির আর কি উন্নতি সাধন করা যায় তাহার আলোচনাও হইল। অতঃপর কবি আর কোথায় যেন দেখা করিবার জন্য চলিয়া গেলেন।

ইহার পরেরদিন আবার আমরা জোড়াসাঁকোতে গেলাম। কমলা দেবী দুইবার আমাদের বাড়ি আসিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে মা গেলেন, আমরাও সঙ্গে চলিলাম। গিয়া শুনিলাম, কমলা দেবী সেইদিনই বাপের বাড়ি বেড়াইতে গিয়াছেন, আমরা তখন প্রতিমা দেবীর সন্ধানে চলিলাম। এইবারই বোধ হয় মীরা দেবীদের দিদিমাকে দেখিয়াছিলাম। তিনি কয়েক দিনের জন্য কলিকাতায় বেড়াইতে আসিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তখন চা খাইতে বসিয়াছিলেন, খাইবার ঘরে তাঁহার কাছে গিয়া কিছুক্ষণ বসা গেল। ঘরটির সজ্জা দেখিলাম অনেকটা জাপানি ফ্যাশানের হইয়াছে, চায়ের বাসনগুলিতেও জাপানি প্রভাব পরিস্ফুট। তিনি কবে শান্তিনিকেতনে যাইবেন জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, 'কবে যাব তা ঠিক করি নি, তবে যাব যে সেটা ঠিক করেছি। আমি না গেলে তোমাদের বাড়ির বেড়া দেবে কে?'

কিছুক্ষণ পরে তিনি উঠিয়া গেলেন। আমরা আরো কিছুক্ষণ গল্প করিয়া ও জলযোগাদি করিয়া বাড়ি ফিরিলাম।

১৯১৮-র ১৬ মে রাত্রে খবর পাইলাম, সকালে বেলা দেবী মারা গিয়াছেন। বাবা জোড়াসাঁকো গিয়াছিলেন, সেখানে এই অশুভ সংবাদ শুনিয়া আসিলেন। মন দারুণ পীড়িত ও ক্লিষ্ট হইয়া উঠিল। নিজেদের আত্মীয়বিচ্ছেদে মানুষ যে দুঃখ পায়, ইঁহার পরলোকগমনে সেই দুঃখই অনুভব করিয়াছিলাম। জোড়াসাঁকোয় গিয়া একবার রবীন্দ্রনাথ ও পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা উচিত, কিন্তু মন যেন ভয়ে পিছাইয়া যাইতে লাগিল। তবু এই বাধা অতিক্রম করিয়া চলিলাম। বাড়ির সম্মুখে আসিয়া গাড়ি দাঁড়াইতেই দেখিতে পাইলাম, রবীন্দ্রনাথ দোতলার বারান্দায় বসিয়া আছেন। কাছেই শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী ও রথীন্দ্রনাথ বসিয়া। আমরা আসিয়াছি সে খবরটা প্রমথবাবুই বোধ হয় তাঁহাকে দিলেন। কবি বারান্দা ছাড়িয়া বসিবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। আমরাও সেইখানে গিয়া বসিলাম। প্রণাম করাতে, অন্য দিকে চাহিয়া শুধু বলিলেন, 'বোসো।' মুখের চেহারা অত্যন্ত বিবর্ণ ও ক্লিষ্ট যেন অনেকদিন রোগ ভোগ করিয়া উঠিয়াছেন। মায়ের সঙ্গে খানিক পরে দুই-চারিটি কথা বলিলেন। বাবার সঙ্গেও কয়েকবার কথা বলিলেন, তবে মধ্যে মধ্যে একেবারে স্তব্ধ হইয়া যাইতেছিলেন। কি কথায় একবার একটু হাস্য করিলেন, হাসিটা তাঁহার মুখে কি নিদারুণ দেখাইয়াছিল তাহা এই চব্বিশ বৎসর পরেও মনে আছে।

তাঁহার আমেরিকা যাত্রার সঙ্গে জার্মানির গুপ্ত যোগ আছে এই ধরনের একটা মিথ্যা গুজব তখন কোথাও উঠিয়া থাকিবে বোধ হয়। এই বিষয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করিলেন। বাবাকে বলিলেন, 'ভাবছি এখানে আর এ বিষয়ে কিছু বলব না, একেবারে ওখানে গিয়ে আমার যা বলবার তা বলব। দেখি অগাস্ট মাসে যদি একটা জাহাজ পাই।'

আরো খানিকক্ষণ নীরবে সেইখানে বসিয়া রহিলাম। অবশেষে মীরা দেবী ও প্রতিমা দেবীর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য উঠিয়া গেলাম। প্রতিমা দেবী বিচিত্রা-ভবনের দোতলার একটি ঘরে ছিলেন, তিনিও সেদিন কিছু অসুস্থ। আমরা যাইতেই উঠিয়া বসিলেন। পরলোকগতা বেলা দেবীর সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা এইখানে শুনিলাম। রবীন্দ্রনাথ কন্যাকে দেখিতে গিয়া এই নিদারুণ সংবাদ শুনিতে পান, গাড়ি হইতে না নামিয়াই তখনি ফিরিয়া চলিয়া আসেন। বাড়ি আসিয়া দুপুর ১টা পর্যন্ত তেতলার ছাদে বসিয়াছিলেন, কেহ তাঁহাকে ডাকিতেও সাহস করে নাই।

বেলা দেবী ফুল অত্যন্ত ভালোবাসিতেন, মৃত্যুর পর পুষ্পসজ্জায় সজ্জিত করিয়াই তাঁহার দেহ মোটরকারে করিয়া শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। প্রতিমা দেবী বলিলেন, তখন যেন তাঁহাকে আরো সুন্দর দেখাইতেছিল।

ইহার পর মীরা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। ক্রমে ক্রমে এ-বাড়ি ও-বাড়ি হইতে আরো দুই-চারিজন মহিলা আসিয়া জুটিলেন। মীরা দেবী বেশি কথা বলিতেছিলেন না, তবে একেবারে নীরবও ছিলেন না। যখন মানুষ অনেকগুলি জুটিয়া গেল তখন শয়নকক্ষে স্থান-সংকুলান হইতেছে না দেখিয়া আমরা সকলে উঠিয়া বিচিত্রার দোতলার বড়ো ঘরে গিয়া বসিলাম। কিছু পরে কয়েকজন ভদ্রলোককে সঙ্গে করিয়া রবীন্দ্রনাথও সেইখানে আসিয়া বসিলেন। কথাবার্তা বলিতেছেন দেখিলাম, কিন্তু মুখের ভাবে কোনো পরিবর্তন হয় নাই। যাঁহারা আসিয়াছিলেন, সকলেই চেষ্টা করিয়া কথা বলিতেছেন বুঝিতে পারিলাম। নীরবতাকে সকলেই ভয় করিতেছিলেন। কিছু পরে গাড়ি আসিয়াছে শুনিয়া উঠিয়া চলিয়া আসিলাম। সমস্তদিন-রাত তাঁহার সেই স্তব্ধ ছায়াচ্ছন্ন মুখ মনের মধ্যে জাগিয়া রহিল।

ইহার পর কয়দিন আর তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলাম না। বাবা রোজই জোড়াসাঁকোয় যাইতেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য, তাঁহারই কাছে কবির খবর পাইতাম। শুনিলাম কয়েকদিন পরেই তিনি শিলাইদহ চলিয়া যাইবেন। যে শক্তিশেল তাঁহার বুকে আসিয়া বাজিল, কথাবার্তায় তাহার আর উল্লেখ মাত্র করিতেন না।

আর-একবার শুনিলাম গরমটা রবীন্দ্রনাথ পাহাড়ে গিয়া কাটাইবেন। তিনধরিয়া যাওয়া স্থির হইল, হঠাৎ আবার মত পরিবর্তন করিয়া তিনি শান্তিনিকেতনে চলিয়া গেলেন।

আমরাও ১৫ কি ১৬ জুন বোধ হয় শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলাম। মা ও অশোক আমাদের সঙ্গেই আসিলেন, তবে Bengal Light Horse-এর route march উপলক্ষে অশোকের ডাক পড়াতে দুই-একদিন পরেই মা তাহাকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন। আসিবার দিন একেবারে মুষলধারে বৃষ্টি, আষাঢ়ের আরম্ভের বর্ষণ, ইহা যে আমাদের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য থামিবে এমন কোনো আশা পাওয়া গেল না। ট্রেনে বোলপুর-যাত্রিণী আরো দুই-একটি মহিলাকে দেখিলাম। আকাশ সমানেই কাঁদিতে লাগিল। স্টেশনে নামিয়াও গোরুর গাড়ি ভিন্ন আর-কিছু জুটিল না, তাহাতেই বসিয়া যাত্রা করা গেল। বাড়ি যখন পৌঁছিলাম তখন সর্বাঙ্গ বাহিয়া জলস্রোত ঝরিতেছে। দেখিলাম দেহলীর দোতলার ছোটো ঘরটিতে বসিয়া কয়েকজন যুবক কি যেন শুনিতেছেন। সুকুমারবাবু, কালিদাসবাবু প্রভৃতি কয়েকজনকে দূর হইতেই চিনিতে পারিলাম। ইঁহারা পূর্বের দিন কবিবরের সহিত 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবস' যাপন করিতে আসিয়াছেন শুনিলাম। আমাদের তখন যা অবস্থা এবং জিনিসপত্রের যা অবস্থা, অন্য কোনো দিকে আর মন দিবার সুবিধা হইল না। বাক্সের কাপড়চোপড় এবং বিছানা প্রভৃতিও কিছু কিছু ভিজিয়া গিয়াছিল, এই-সকলের প্রতিকার ও সংশোধন চেষ্টাতেই দিন কাটিয়া

গেল, কাহারো সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিবার আর সুযোগ ঘটিল না। পথের কষ্টে মাথা ধরিয়া শীঘ্রই শয্যাগ্রহণ করিতে হইল।

পরদিন দিনুবাবুর বাড়ি রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পাইলাম। বেলা দেবীর মৃত্যুর পরে তাঁহার যেরকম ক্লিষ্ট চেহারা দেখিয়াছিলাম, এখনো দেখিলাম প্রায় তাহাই আছে। দুই-চারটি কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন।

কাশী হইতে অধ্যাপক ফণিভূষণ অধিকারী মহাশয় এই সময়ে আশ্রমে আসিয়া সপরিবারে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার তৃতীয়া কন্যা রানুকে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ইঁহাদের সকলের সঙ্গেই আলাপ হইল। অ্যান্ড্রুজ-সাহেবও তখন শান্তিনিকেতনেই রহিয়াছেন দেখিলাম।

মেঘাচ্ছন্ন দিনগুলি ভালোই কাটিতে লাগিল। সেইদিনই দুপুরে বোধ হয় একটু ভিজিবার লোভে বাহির হইয়াছিলাম। বয়োজ্যেষ্ঠা কয়েকজন আসিয়া জোটাতে সে আশা ত্যাগ করিতে হইল। রবীন্দ্রনাথের বাড়ির সামনের পথ দিয়ে অতিথিশালার বাড়ির দিকে চলিয়াছি, এমন সময় আমাদের কণ্ঠস্বর শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ বাহির হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমাদের কী ষড়যন্ত্র হচ্ছে?' সেইখানেই দাঁড়াইয়া খানিক গল্প হইল, তাহার পর তিনি আবার ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন। আমরা ভিজা মাঠে, লাল মাটির রাস্তায় ঘুরিয়া অনেকটা সময় কাটাইয়া দিলাম। ফণিভূষণবাবুর বাড়ি গিয়া একবার তাঁহাদের সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়াও আসিলাম। আমরা থাকিতে থাকিতেই কবিও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা অল্প পরেই চলিয়া আসিলাম।

সুকুমারবাবুরা দিন-চার ছিলেন বোধ হয়। এ চারদিনই গান গল্প কবিতাপাঠ প্রভৃতি একটানা চলিত। দিন-দুই charde play-ও হইল। যাত্রার দিন বার-তিন-চার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা-পূর্বক ট্রেন ফেল করিয়া, শেষে সত্য সত্যই তাঁহারা চলিয়া গেলেন।

রবীন্দ্রনাথ এই সময় ছেলেদের ক্লাসে রীতিমতো পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। আমরা যাহারা ক্লাসের ছাত্র বা ছাত্রী নয়; তাহারাই বোধ হয় ক্রমে দলে ভারী হইয়া উঠিতেছিলাম। অন্য শিক্ষকরা আসিয়া বসিতেন, এমন-কি অ্যান্ড্রুজ-সাহেবও প্রায়ই আসিয়া বসিতেন, যদিও বাংলা তিনি বিশেষ বুঝিতেন না। দশ-বারো বছরের ছেলের দল সমানে বসিয়া শেলী বা ব্রাউনিঙের কবিতা পড়িতেছে— এ এক দেখিবার জিনিস ছিল। অন্য জিনিসও অবশ্য তিনি পড়াইতেন। তবে ছোটোদের অন্যায়রকম ছোটো ভাবার পক্ষপাতী রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই ছিলেন না, কাজেই তাহারা বুঝিতে পারিবে না বলিয়া যথার্থ সুন্দর জিনিস তাহাদের পরিবেশন করিতে তিনি কোনোদিনই পশ্চাৎপদ হইতেন না। আমরা রবিবারে আসিয়াছিলাম, বুধবারে মন্দিরে নিয়মিত উপাসনা হইল।

গ্রীষ্মের ছুটির পর বিদ্যালয় খুলিল, ছেলের দল হুড়মুড় করিয়া ফিরিতে আরম্ভ করিল। তখন আশ্রমে ঘর ছিল কয়খানি বা? চারি দিকে মাঠ আর খোয়াই। বর্ষায় তখন শান্তিনিকেতনের কি অপূর্ব শোভা হইত! চারি দিকে একেবারে হাজার জলস্রোত একসঙ্গে নামিয়া পড়িত, যে দিকে তাকাইতাম বোধ হইত চোখের সামনে যেন ঘূর্ণমান জলের

পরদা দুলিতেছে। সহস্র অজগর সর্পের মতো আকাশে বিদ্যুৎ বঙ্কিম গতিতে খেলিতে থাকিত, আর বাজ পড়ার কি প্রচণ্ড শব্দ! বৃষ্টির জল সোজা মাটির বুকে ঝরিয়া পড়িতে চায়, তীব্র বায়ু তাহাকে তাড়া করিয়া শূন্যে নাচাইয়া লইয়া ফিরে। আবার বৃষ্টি যখন থামিয়া যায় তখন মাঠ-বন সবুজের হাসিতে ঝলমল করে, শত শত শিশু-জলস্রোত চারি দিকে কলধ্বনি তুলিয়া বহিতে আরম্ভ করে, রক্তিম মাটির বুকের উপর দিয়া নাচিয়া ছুটিয়া চলে। ইন্দ্রধনু বিরাট বিচিত্র খিলানের মতো মাঠের এ-পার হইতে ও-পার পর্যন্ত রাঙাইয়া তোলে।

১৩ জুলাই বোধ হয় দেহলীর ছাদে বসিয়া অনেকগুলি পুরাতন কবিতা রবীন্দ্রনাথ পড়িয়া শুনাইলেন। ব্যাখ্যাও কিছু কিছু করা হইয়াছিল। "স্বর্গ হইতে বিদায়" ও "সিন্ধুর প্রতি" এই দুইটি কবিতা আমরা শুনিলাম। আরো কয়েকটি কবিতা আগে পড়া হইয়া গিয়াছিল, আমরা প্রতিমা দেবীর সঙ্গে সুরুলে বেড়াইতে গিয়া ফিরিতে দেরি করিয়া ফেলিয়াছিলাম, সুতরাং সেগুলি আর শুনিতে পাই নাই।

ইহারই দিন-কয়েক আগে এখানকার মেয়েদের সাহিত্য-সভার জন্মোৎসব হইয়া গেল। মন্দ ধুমধাম হয় নাই। প্রত্যেকেই বাড়ি হইতে কিছু-না-কিছু খাবার করিয়া আনিয়াছিলেন, কাজেই আহারের ব্যাপারটাও ভালোই হইল। নিচু-বাংলাতেই সভা হইল, বড়োমার শয়নকক্ষটি ফুল দিয়া খুব ভালো করিয়া সাজাইয়া, সকলে সেখানেই বসিলাম। গান, পাঠ, গল্প করা, খাওয়া, সব-কিছুই বেশ উপভোগ্য হইল।

ইহার মধ্যে ছোটোখাটো একটা ভূমিকম্পও হইয়া গেল। খাটে বসিয়া আছি, হঠাৎ তাহা রকিং চেয়ারের মতো দুলিতে আরম্ভ করিল। চাহিয়া দেখিলাম দরজা-জানালার কপাটগুলিও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দেখিলাম, ছেলেরা মহা হৈ চৈ বাধাইয়া দিয়াছে। যাহা হউক, অল্পক্ষণেই ব্যাপার চুকিয়া গেল, কাহারো কোনো ক্ষতি না করিয়া।

রবীন্দ্রনাথ এই সময় খুব বেশি করিয়া কাজে ডুবিয়া ছিলেন—গান রচনা করা, ক্লাস পড়ানো, গান শিখানো, নিজের রচনা পাঠ করিয়া সকলকে শুনানো, এই-সবের ভিতর দিয়াই তাঁহার দিন কাটিয়া যাইত। বিশ্রাম যে কখন করিতেন দেখিতে পাইতাম না। আমাদের বাড়ি মধ্যে মধ্যে আসিতেন, বেশিক্ষণ বসিতেন না, বাবার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলিয়া, আমাদের হয়তো-বা একটা-কিছু প্রশ্ন করিয়া চলিয়া যাইতেন। বিকালে নিজের ছোটো ছাদটিতে বসিতেন, চারি দিক হইতে অনেকে গিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিত, দেখিতে দেখিতে স্থানটি সভায় পরিণত হইত।

প্রতি বুধবারে মন্দিরে সকলকে লইয়া তিনি উপাসনা করিতেন। এই দিনটির জন্য আমরা সারা সপ্তাহ আগ্রহ-সরকারে অপেক্ষা করিয়া থাকিতাম।

এই সময় আমার প্রথম ছোটোগল্পের বই 'বজ্রমণি' বাহির হয়। বই একখানা আমার কাছে আসিবামাত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি সেখানা পড়িবার জন্য চাহিয়া লইয়া যান। তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, যেন বইখানা আর কাহাকেও না দেখান। বইখানা ফিরাইয়া দিবার

সময় তিনি খবর দিলেন যে, আর কেহ দেখে নাই, শুধু রবীন্দ্রনাথ সেখানা চাহিয়া লইয়া দেখিয়াছেন ; জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 'বইয়ের নাম বজ্রমণি কেন হল?'

পরদিনই তাঁহার সঙ্গে দেখা হইল। সন্ধ্যাবেলা তাঁহার ছোটো ছাদটিতে বসিয়া আছেন, প্রণাম করিয়া কাছে গিয়া বসিলাম। আমাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, তোমার বইয়ের নাম বজ্রমণি কেন হল বলো তো? এই বিষয়ে আমার নগেনের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। আমি প্রথমে ভেবেছিলুম তুমি খুব শক্ত রকমের কিছু লিখেছ, পরে দেখলুম তা নয়।' আমি নামকরণের কোনো ভালো জবাবদিহি করিতে না পারাতে নিজেই বলিলেন, 'অবশ্য নামের মানেটার সঙ্গে জিনিসটাকে যে ঠিক মিলে যেতে হবে তার কোনো মানে নেই। মানুষের নামের বেলাতেও তো এরকম মিল হয় না। নাম জিনিসটা নাম মাত্রই, definition হবার তার দরকার নেই।'

কথাবার্তা অনেকক্ষণ চলিল, বাবার সঙ্গেও খানিক আলোচনা হইল। এই সময় রোজই প্রায় গানের ক্লাস বসিত, আজ কবি গানের ক্লাসটিকে উপরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সুধাকান্তবাবু উপরে আসিয়া খবর দিলেন যে গানের ক্লাস আজ আর হইবে না, কারণ পাচক ঠাকুরদের সকলেরই প্রায় পীড়া হইয়াছে, একজন মাত্র সুস্থ আছে, সে কোনোমতে রান্না করিতেছে বটে, তবে বেশিক্ষণ ছেলেদের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিবে না। অতএব গানের ক্লাস সেদিন আর বসিল না, অল্পক্ষণ পরে আমরাও চলিয়া আসিলাম।

'বজ্রমণি' তাঁহাকে একখানি দিয়া আসিয়াছিলাম। হাতে করিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, পড়ে দেখব।' পড়িয়াছেন কি না সে খোঁজ কোনোদিন করি নাই। তাঁহার নিকট হইতে প্রশংসাপত্র আদায় করিয়া, কাগজে ছাপাইয়া, নাম কিনিবার ইচ্ছা কোনোদিন হয় নাই, তাই এ বিষয়ে কখনো উৎসাহ প্রকাশ করি নাই। নিজে যখন যাহা দুই-এক কথা অযাচিতভাবে বলিতেন তাহাই ভগবৎ-আশীর্বাদের মতো কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করিতাম।

আর-একদিন সন্ধ্যায় কমলা দেবী ও প্রতিমা দেবীর সঙ্গে তাঁহার সেই ছাদটিতে গিয়া বসিলাম। সেদিন তাঁহার প্রথম-জীবনের অনেক কৌতুকপ্রদ কাহিনী রবীন্দ্রনাথ বলিয়া গেলেন। এক মান্দ্রাজি জমিদার কিরকম তাঁহাকে কন্যাদান করিবার চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সে গল্প শুনিলাম। গল্প শেষ করিয়া বলিলেন, 'সে বিয়ে যদি করতুম তা হলে কি আর আজ কাছে দাঁড়াতে পারতে? সাত লাখ টাকা আয়ের জমিদারির মালিক হয়ে, কানে হীরের কুণ্ডল পরে, মান্দ্রাজে বসে থাকতুম, তা না এখন two ends meet করাতে পারি নে, বসে বসে কবিতা লিখছি।' ভাবিলাম, তাহা হইলে কাছে দাঁড়াইতে চাহিতাম কি না সন্দেহ, কারণ সাত লাখ টাকার জমিদারি অনেক লোকের নিশ্চয়ই আছে, কে বা তাহাদের খোঁজ রাখে?

স্যার্ তারকনাথ পালিত নাকি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'আমি guarantee দিচ্ছি, তুমি যদি ব্যারিস্টার হও তো খুব বিখ্যাত হবেই।' রবীন্দ্রনাথ অতঃপর বিলাতে গিয়া একসঙ্গে অনেক-কিছু পড়িতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, 'ল্যাটিন, গ্রীক, History of

Rome, কিছু বাকি রাখি নি। ব্যারিস্টার হলে এতদিন কত লম্বা লম্বা বক্তৃতা করে কত লোককে জেলে পাঠাতুম, কত লোককে জেল থেকে বাঁচাতুম। কিন্তু কপালে ছিল না। 'য়ুরোপ-প্রবাসী পত্রে'র ঘটা দেখে আমার পিতা ভাবলেন যে ছেলেটা মেম বিয়েই করে না কি, তাড়াতাড়ি লিখে পাঠালেন, তোমার ঢের পড়া হয়েছে, ফিরে এসো। কিন্তু বাস্তবিক সেরকম কোনো ভয় ছিল না।'

দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রার সময় তিনি কিরকম ভুল করিয়া অন্যের কম্বল লইয়া গিয়া, পরে ভুল বুঝিতে পারিয়া কম্বল ফিরানোর চেষ্টায় এক মেমের ঘরে ঢুকিয়া পড়েন, সে গল্পও শুনিলাম। রবীন্দ্রনাথ নিজের সম্বন্ধে মন্তব্য করিলেন, 'আমার মতো অক্ষম মানুষ আর নেই। সর্বদা আমাকে আগলাবার জন্যে আর-একজন লোক দরকার। তা না হলে কোথায় উঠতে কোথায় উঠি, কোথায় নামতে কোথায় নামি, তার ঠিকানা থাকে না। বিলাতে আমাকে কেউ নিমন্ত্রণ করলেই আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হত, আমি তো আর বলতে পারি নে যে আমার সঙ্গে আর-একজনকেও নিমন্ত্রণ করো ; কোন ট্রেনে যে উঠতুম, কোথায় যে ভুল করে নেমে যেতুম, সে এক কাণ্ড! পিয়ার্সন সেবার আমাকে নিয়ে টের পেয়েছে। খুব করেছে আমার জন্যে। অ্যান্ড্রুজ-সাহেবের এ-সব কোনো ক্ষমতা নেই, সে আমার চেয়েও সেরা।' প্রতিমা দেবীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'এরা ও-সব খুব পারে। একলাই ট্রামে উঠতে যায়, লাল আলো কিসের, গ্রীন আলো কিসের সব জানে, দেখেশুনে আমারই নিজের জন্যে লজ্জা করতো।'

Strand Magazine-এ তখন অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির শিশুকাল হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত ছবি একসঙ্গে বাহির হইতেছিল। আমি সেইগুলির উল্লেখ করিয়া বলিতেছিলাম যে বাল্যকালের চেহারার সহিত মানুষের পরবর্তী কালের চেহারার বিশেষ সাদৃশ্য থাকে না। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'অনেক স্থলেই তাই ঘটে বটে। আমিও হঠাৎ বদলে গেলুম। প্রথমে নেহাত থ্যাবড়া মুখ ছিল, নাকটাকের কোনো সন্ধানই মিলত না, একেবারে বোকার মতো দেখতে ছিলুম। বারান্দার রেলিং-এর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে থাকতুম, বড়দাদা এক-একবার এসে মাথাটা নেড়ে দিয়ে বলতেন, 'রবি ঠিক ফিলসফার হবে, কিরকম ভাবতে শিখেছে।' হঠাৎ এক সময়ে লম্বা হয়ে বাড়তে আরম্ভ করলুম, লম্বা নাক বেরিয়ে পড়ল।'

গুজরাটি বালক কতকগুলি তখন আশ্রমে পড়িতে আসিয়াছিল, জিতেন্দ্র বলিয়া একটি ছোটো ছেলের চেহারার প্রশংসা করিলেন, গুজরাটবাসিনীদের রূপ লইয়াও একটু আলোচনা হইল। রাত্রি গভীর হইয়া আসিতেছে দেখিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম।

সন্ধ্যাবেলা সুবিধা পাইলেই তাঁহার কাছে গিয়া বসিতাম। কখনো অন্য মেয়েদের সঙ্গে যাইতাম, কখনো-বা একলাই যাইতাম। তাঁহার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার পক্ষে এই সময়টিই ছিল প্রকৃষ্ট। কিছুদিনের জন্য আমাদের কলিকাতা যাইবার কথা হইতেছিল, হয়তো বহুদিন তাঁহার দর্শন পাইব না মনে করিয়া পরেরদিন সন্ধ্যাবেলা একলাই তাঁহার কাছে গিয়া বসিলাম। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, 'বোসো।' আমাদের কলিকাতা যাওয়ার

কথা শুনিয়া আপত্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'তোমার বাবার কাছে একটা deputation পাঠাব, সব বেশ ছিলে এখানে, আবার খালি করে দিয়ে চলে যাবে?'

এই সময় আরো কয়েকজন মহিলা ও ভদ্রলোক আসিয়া বসিলেন। ছেলেদের পড়ানোর প্রসঙ্গে বলিলেন, 'Fifth Class-টা আমার খুব ভালো লাগে। ১৯১৮ খৃস্টাব্দে যাঁহারা এখানে Fifth Class-এর ছাত্র ছিলেন তাঁহারা যদি এই মন্তব্যের কথা পাঠ করেন, নিঃসন্দেহ আনন্দিত হইবেন। ছেলেদের একটু বয়স হইয়া গেলেই মহিলাদের কাছে পড়িতে তাহারা বেশ কিছু সংকোচ অনুভব করে, ইহা আমি নিজে দেখিয়াছিলাম। সে কথা বলাতে তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'ছেলে আর মেয়ের মাঝখানের এই বাধাটা আমি ভেঙে দিতে চাই, কিন্তু কিছুতেই হয়ে ওঠে না।'

একটি অবিবাহিতা তরুণী আশ্রমে শিক্ষয়িত্রীরূপে আসিতে চাহিয়াছিলেন। কবি তাঁহাকে আনিতে একরকম সম্মতই ছিলেন। হঠাৎ শোনা গেল মহিলাটির বিবাহ হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'না, ওদের দিয়ে চলবে না, কে কখন বিয়ে করে বসবে আর কাজকর্ম সব থাকবে পড়ে। বিধবা হলে একরকম চলতে পারে।' সন্তোষবাবু তাঁহার আমেরিকার Lady Professor-দের অনেক গল্প করিলেন। শান্তিনিকেতনেও মেয়েরা এবং শিক্ষয়িত্রীরা কিরকম পরস্পরের উপর অভিমান করিয়া কথা বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিতেন, সেই কথা বলিয়া কবি আবার খানিক হাসিলেন। কবে এই ব্যাপার হইয়াছিল জানি না, কিন্তু যখনি উহার উল্লেখ হইত, তিনি অত্যন্ত হাসিতেন।

শান্তিনিকেতনে মশা বেশ আছে। সন্ধ্যার সময় সর্বদাই দেখিতাম কবির হাতের কাছে একটি তেলের শিশি, তেলটার নাম Mosquitol, অল্প করিয়া হাতে ঢালিয়া তিনি বার বার পায়ে মাখাইতেন। তেলটিতে লেবুফুলের মতো একটা মিষ্ট গন্ধ ছিল। আমাদের দিকে তাকাইয়া বলিতেন, 'ভেবো না যে, বুড়োমানুষ, বাত হয়েছে বলে পায়ে তেল মালিশ করছি, এ-সব মশার ভয়ে। শান্তিনিকেতনের মশারা ভারি নম্র, সারাক্ষণই পদসেবা করছে, কাজেই এই উপায় অবলম্বন করেছি।'

'শ্রেয়সী' কাগজটি তখনো বাহির হইতেছিল। তাহাতে আমি "নাটকের পঞ্চমাঙ্ক" নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। আমেরিকান ও ইংরেজি কাগজ হইতে সংকলন করিয়া অনেকগুলি উদাহরণ দিয়া প্রমাণ করিয়াছিলাম যে বৃদ্ধ বয়সেও মানুষ যথেষ্ট কর্মক্ষম থাকে। রেখা এবং নুটু, সন্তোষবাবুর দুই বালিকা ভগিনী, 'শ্রেয়সী'র প্রচার-বিভাগের কর্ত্রী ছিলেন, 'শ্রেয়সী' বাহির হইবামাত্র সর্বাগ্রে রবীন্দ্রনাথের হাতে গিয়া পড়িত। এইবার 'শ্রেয়সী' বাহির হইবার পরদিনই সন্ধ্যাবেলা টের পাইলাম যে উনি পাইবামাত্র পত্রিকাখানি আগাগোড়া পড়িয়া ফেলেন। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী এবারকার 'শ্রেয়সী' কেমন হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিবামাত্র রবীন্দ্রনাথ কাহার লেখা কেমন হইয়াছে তাহা বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, 'সীতার' লেখা আমার সব-চেয়ে ভালো লেগেছে। ওতে কিরকম যে উৎসাহ পেয়েছি তা আর কি বলব। ভরসা হচ্ছে যে এখনো অনেকদিন কাজ করতে

পারব। তুমি নব্বই বছর অবধি মেয়াদ দিয়েছ না?' কয়দিন ধরিয়া যখনি তাঁহার সঙ্গে দেখা হইত, এই লেখাটি লইয়া রসিকতা করিতেন। দুই-একদিন পরে, বাবা ও দিদির সঙ্গে আবার তাঁহার কাছে গেলাম। তখনো এই লেখাটির কথা তুলিলেন। আমাকে বলিলেন, 'দিশি বুড়োদের নাম এত কম দিয়েছ কেন?' দিদি বলিলেন, 'আমাদের দেশের লোকদের ঠিক বয়স জানাই যায় না।' রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত যেন সন্ত্রস্ত হইয়া বলিলেন, 'না, আমি মোটেই বয়স লুকোচ্ছি না, সাল তারিখ সব বলে দিচ্ছি, ঠিক করে হিসাব করে নাও। তোমার প্রবন্ধটা ক্রমশ-প্রকাশ্য, নয়?' ঝড়বৃষ্টি আসিয়া পড়াতে সেদিন তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলাম।

কয়েকদিন আগে আশ্রমের উপর দিয়া বেশ মাঝারিগোছের একটি ঝড় বহিয়া যায়। সেদিন আবার ঝড়ের সময় দুই-তিনজন বন্ধু মিলিয়া মাঠে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিবার চেষ্টা করিলাম বটে, কিন্তু ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়া পারিয়া উঠিলাম না। সে কি ধুলার ঘটা! চোখে প্রায় কিছুই দেখিতে পাই না, এদিকে প্রবল বাতাসের ধাক্কায় পথ চলা বা দাঁড়াইয়া থাকা দুইই অসম্ভব হইয়া উঠিল। সঙ্গে সেদিন ছোটো ছেলেমেয়ে কেহ থাকিলে অত্যন্তই বিপদে পড়িতে হইত। ঝড়ের ঠেলায়ই বাড়ির প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিলাম। মাঝপথে প্রবল বৃষ্টি নামিল। দেহলীর সম্মুখে আসিয়া দেখিলাম উপরের বারান্দায় রবীন্দ্রনাথ ও অ্যান্ড্রুজ-সাহেব বসিয়া আছেন। জলসিক্ত মূর্তি-কয়টি চোখে পড়িবামাত্র রবীন্দ্রনাথ উপর হইতে ভর্ৎসনাসূচক কী একটা বলিয়া উঠিলেন, আমি আর তাহা শুনিবার জন্য না দাঁড়াইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিলাম। পরেরদিন তাঁহার সামনে পড়িবামাত্র বলিলেন, 'আমি কাল তোমায় দেখে বউমা ঠিক করে খুব বকে নিলুম।' তখন যা ঝড়বৃষ্টির ঘটা, যে-কোনো মানুষকে অন্য যে-কোনো মানুষ বলিয়া ভ্রম করা চলিত। এই ঝড়টিতে আমাদের বাড়ির গোটা-দুই হুড়কা ভাঙিয়া গেল, হরিচরণবাবু যে খড়ের ঘরটিতে বাস করিতেন তাহার উপর বাজ পড়িয়া আগুন লাগিয়া গেল। বিদ্যালয়ের ছেলেদের তৎপরতায় অবশ্য আগুন শীঘ্রই নিবিল, তবে ঘরের ভিতর একটি বালিকা বাজ পড়ায় shock লাগিয়া অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে, ও তাহার হাত পুড়িয়া গিয়াছে শুনিলাম। ইহার পর আশ্রমে থাকিতে বেশি ঝড় দেখিলেই কেমন ভয়-ভয় করিত।

সন্ধেবেলা আর-একদিন তাঁহার কাছে বসিয়া আছি, নীচ দিয়া কয়েকটি তরুণী কলকণ্ঠে গল্প করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'আচ্ছা, একটা রহস্যের মীমাংসা করো তো। তোমরা যাদের সারাদিনই দেখছ, তাদের সঙ্গেও কী করে সারাদিন গল্প করো? মেয়েদের গল্প কখনো শেষ হতে তো দেখি না। আমাদের যদি পলিটিক্স্ শেষ হল, তা হলেই সব চুপ।' আমি বলিলাম, 'মেয়েরা খুব যা তা বকতে ভালোবাসে, ছেলেরা গুরুগম্ভীর বিষয় না হলে কথাই বলতে চায় না।' রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'যা-তা গল্পই তো গল্প। আমার ভারি soothing লাগে। ছোটো ছেলের সঙ্গে ছোটো মেয়ের ঐখানে প্রভেদ। অভি আমার পিছনে দাঁড়িয়ে সারাদিন ঐরকম বকে

যেত।' আমি বলিলাম, 'কাবুলিওয়ালার মিনির মতো?' কবি বলিলেন, 'বেলাটা ঠিক অমনি ছিল, মিনির কথায় প্রায় তার কথাই সব তুলে দিয়েছি।'

জুলাই মাসের শেষের দিকে গুরুসদয় দত্ত মহাশয় সস্ত্রীক আশ্রমে বেড়াইতে আসেন। সন্ধ্যার সময় যথানিয়মে আমরা কবির ছাদে বসিয়া তাঁহার কথা শুনিতেছি এমন সময় সন্তোষবাবু আসিয়া খবর দিলেন যে অতিথিরা গান শুনিতে আসিতে চাহিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'এখন আমি গাইতে পারিই না তো কি শোনাবো?' কিন্তু তাঁহার আপত্তি এ-সকল বিষয়ে কেহ কোনোদিন গ্রাহ্য করিত না। সন্তোষবাবু অতিথিদের আনিতে গেলেন, ভৃত্য তাঁহাদের জন্য চেয়ার আনিতে ছুটিল। রবীন্দ্রনাথের পিছনে চেয়ার আনিয়া রাখাতে তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'এই, পিছনে চৌকি দিচ্ছিস্ কেন? এখনো তো একঘরে হই নি?' আমরা এইবার উঠিবার উপক্রম করিতেছি দেখিয়া বলিলেন, 'ম্যাজিস্ট্রেটের নাম শুনে যেন আমায় একলা ফেলে পালিয়ো না।' তিনি ছেলেবেলায় কেমন সুন্দর গান করিতেন, এখন গলা কত খারাপ হইয়া গিয়াছে, এই-সব নানা বিষয়ে গল্প করিতে লাগিলেন। আমরা এলাহাবাদে কখন তাঁহাকে প্রথম দেখিয়াছি ও কখন তাঁহার গান প্রথম শুনিয়াছি সে কথাও বলিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই যে তুমি হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলে, না?'

অতিথিরা সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছেন দেখিয়া বলিলেন, 'পালিয়ো না, বোসো, আমি একটু আতিথ্য করি।' আশ্রমের অনেকের সঙ্গে গুরুসদয় দত্ত মহাশয় ও তাঁহার পত্নী আসিয়া বসিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের এক ভ্রাতুষ্পুত্রও সস্ত্রীক তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। গান কয়েকটি হইল, কবির গলা সেদিন সত্যই ভাঙিয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর অতিথিরা বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন। রাত অনেক হইয়াছে বলিয়া আমরাও উঠিলাম বাড়ি যাইবার জন্য। তাঁহাকে প্রণাম করাতে পিঠে মৃদু করাঘাত করিয়া বলিলেন, 'চললে? যাও, তোমরা সব যানেওয়ালা লোক, তোমাদের সঙ্গে আর ভাব রাখবো না।' দেখিলাম আমাদের আসন্ন কলিকাতা-যাত্রার কথা তখনো ভোলেন নাই।

অগাস্ট মাসের গোড়াতেই কলিকাতায় আসিলাম। যাত্রার দিন সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিতে ও লাইব্রেরির যত বই আনিয়াছিলাম তাহা ফিরাইয়া দিতেই বেলা প্রায় কাটিয়া গেল। ক্ষিতিমোহনবাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের তখন আয়োজন চলিতেছে, ঠান্‌দি বিছানা বালিশ প্রভৃতি তৈয়ারি করাইতে মহা ব্যস্ত। তাঁহার সঙ্গে একটু গল্প করিয়া ও অন্যান্য অধ্যাপক পত্নীদের কাছেও বিদায় লইয়া ফিরিয়া গেলাম। প্রতিমা দেবীর সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম অল্পক্ষণ পরে। তিনি তখন খাইতে বসিয়াছেন, চারি দিক ঘিরিয়া তাঁহার পোষ্য কয়েকটি কুকুরও বসিয়া গিয়াছে। ইহারা ঘরের ছেলেরই মতো নানারকম সুবিধা উপভোগ করিত। সেইখানে বসিয়াই গল্প করিতে লাগিলাম। বিদ্যালয়ের ছেলেরা তখন মাঝে মাঝে এক-এক দল আসিয়া গুরুদেবের বাড়ি নিমন্ত্রণ খাইয়া যাইত। সেদিন Fifth Group-এর নিমন্ত্রণ খাইবার পালা, তাহারা আসিয়া প্রতিমা দেবীকে একটা

তালিকা দিয়া গেল, ক'জন খাইবে এবং ক'জন খাইবে না। যাহারা খাইবে না তাহারা শুনিলাম ব্রাহ্মণের ছেলে। তাহারা চলিয়া যাইতেই রবীন্দ্রনাথ আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ছেলেদের খাওয়া বিষয়ে পুত্রবধূর সঙ্গে দুই-একটা কথা বলিয়া, আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'তোমাদের যাওয়া কি আজ নিতান্তই ঠিক?' আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ।' কবি বলিলেন, 'আমার ছেলেদের খাওয়াটা দেখে গেলে না। তাদের পড়ার চেয়ে খাওয়াটাই বেশি দেখবার জিনিস। এক-একজন যেরকম খাবে বলে রেখেছে সে একেবারে ভয়ানক। আমি অবিশ্যি তাদের অত খেতে দেব না, এখান থেকে উঠেই যে হাসপাতালে গিয়ে ঢুকবে তা হচ্ছে না', বলিয়া চলিয়া গেলেন।

প্রতিমা দেবীর সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করিয়া আমরা উপরে গেলাম রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করিয়া আসিবার জন্য। মেঝেয়-পাতা বিছানায় শুইয়া তিনি তখন একখানা মাসিক পত্র পড়িতেছেন, আমাদের দেখিয়া সাদরে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'এসো।' আমরা নিকটে গিয়া প্রণাম করিলাম। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পনেরো দিনের জন্য যাচ্ছ তো?' আমি বলিলাম, 'তা ঠিক জানি না।' কবি বলিলেন, 'হ্যাঁ, আমি তো তাই শুনলুম সাহেবের (অ্যান্ড্রুজ-সাহেব) মুখে, সে যে তোমার বাবার কাছে গিয়েছিল।' খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিলেন, 'বেশ ছিলে এখানে ওখানে গিয়েই জ্বরে পড়বে, তখন আমার কথা মনে হবে।' একটু পরেই বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম। ট্রেনে এবার বিশেষ ভিড় ছিল না, ভালোয় ভালোয় কলিকাতা পৌঁছিলাম। এবার পনেরোদিন থাকিব শুনিয়া আসিয়াছিলাম, ঠিক পনেরো-ষোলোদিন পরেই আবার ফিরিয়া গেলাম। ভরপুর বৃষ্টির ভিতর হাওড়া স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। আমাদের বাল্যবন্ধু এবং শ্রীমান অশোকের সহপাঠী শ্রীমান বিমল সিদ্ধান্ত এইবার আমাদের সঙ্গে চলিলেন। বোলপুরে নামিয়া দেখিলাম সেখানেও বৃষ্টি, তাহা ছাড়া স্টেশনে কোনোপ্রকার গাড়িই নাই। অগত্যা মুটের মাথায় জিনিস তুলিয়া হাঁটিয়াই যাত্রা করা গেল। বাড়ি আসিয়া, খাওয়া-দাওয়া সারিয়া, ভিজা কাপড় ও বিছানার ব্যবস্থা করিয়া, শুইতে প্রায় রাত একটা বাজিয়া গেল।

সকালে উঠিয়া দেখা গেল আকাশ তখনো মেঘাচ্ছন্ন, তবে বৃষ্টি পড়িতেছে না। ঘরদ্বার যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া ও প্রাতরাশ সারিয়া আমাদের অতিথিটিকে লইয়া একবার আশ্রম দেখাইবার জন্য বাহির হইলাম। বিস্তৃত মাঠের উপর দিয়া রেল লাইন পর্যন্ত হাঁটিয়া গিয়া ফিরিয়া আসিলাম। একটানা বেশিক্ষণ বাহিরে থাকিতে ভরসা হইতেছিল না, যা আকাশের অবস্থা! জলে ভেজাকে তখন অবশ্য বিশেষ-কিছু ভয় করিতাম না, মোটের উপর ভালোই লাগিত। তবে আগের দিন অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাত-আট ঘণ্টা ভিজিয়া আজ আর ভেজার শখ ছিল না। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর আবার বিমলকে লইয়া বাহির হইয়া তাহাকে আশ্রমের ভিতরটা, ছাতিমতলা, মন্দির, প্রেস প্রভৃতি দেখাইয়া আনিলাম। তাহার পর তাহাকে বাড়ি পাঠাইয়া দিয়া আমরা চলিলাম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিতে। তিনি উপরের ঘরেই ছিলেন, আমাদের দেখিয়াই বলিলেন, 'গেলে যে আসতেই চাও না?' বসিয়া কিছুক্ষণ গল্প করা গেল। তাঁহার মুখেই প্রথম শুনিলাম যে

প্রভাত মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও আমার সহপাঠিনী বাল্যবন্ধু সুধাময়ী শীঘ্রই বিবাহবন্ধনে যুক্ত হইবেন। সুধা আমার বন্ধু শুধু নহেন, কলিকাতার বাড়ির নিকটতম প্রতিবেশিনী, কাজেই তাঁহার বিবাহের খবর কলিকাতায় না শুনিয়া এখানে আসিয়া শোনাতে কিঞ্চিৎ অবাক হইয়া গেলাম। কন্যা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যাহা-কিছু প্রশ্ন করিলেন, সবের উত্তর দিয়া খানিক পরে চলিয়া আসিলাম। বিকালে এমন সহস্রধারায় বৃষ্টি নামিল যে আর ঘরের বাহির হইবার কোনো সম্ভাবনাই রহিল না।

পরদিন সকালে মেঘ থাকিলেও বৃষ্টি ছিল না, খানিক পথে ও মাঠে ঘুরিয়া আসা গেল। দুপুরে ঠানদির বাড়ি নিমন্ত্রণ খাইলাম তাঁহার কন্যা-জামাতার আগমন উপলক্ষে। বিবাহে উপস্থিত থাকিতে পারি নাই, এইবার গিয়া নূতন বরকে দেখিয়া আসিলাম।

বিকালে মেঘ দেখিয়াই বাহির হইয়াছিলাম, আশা ছিল বোধ হয় বৃষ্টি হইবে না, হয়ও যদি তো অল্পস্বল্প হইবে। কিন্তু আমাদের আশাটা নিতান্তই দুরাশা বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। কোপাই নদীর দিকে যাইতে গোয়ালপাড়া বলিয়া ছোটো একটি গ্রাম পথে পড়ে। সেই গ্রামটির কাছে আসিতে-না-আসিতেই ঝম্‌ঝম্ করিয়া বৃষ্টি নামিল, সঙ্গে সঙ্গে ঝড়। কোথাও কোনো আশ্রয় ছিল না, কাজেই বেশ পুরাদস্তুর ভিজিতে ভিজিতে এবং ঝড়ের দাপটে অতি বিপন্ন অবস্থায় কোনোমতে আশ্রমের গণ্ডির ভিতর ফিরিয়া আসিলাম। দেহলীর সম্মুখে আসিয়াই একবার ভীতভাবে উপরের দিকে তাকাইলাম, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না।

বাড়ি পৌঁছিয়া ভিজা কাপড়চোপড় ছাড়িলাম। কিঞ্চিৎ চা এবং প্রচুর বকুনি উদরস্থ করা গেল। প্রতিমা দেবী এই সময় বেড়াইতে আসিলেন, তাঁহার সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছি এমন সময় বাহিরে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। পাশের ঘরে গিয়া দেখিলাম তিনি বসিয়া বাবার সঙ্গে গল্প করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, 'তোমাদের visit return করতে এলুম।' আমি তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য অবনত হওয়া মাত্রই একরাশ ভিজা চুল তাঁহার পায়ের উপর গিয়া পড়িল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'এই দেখো, কি কাণ্ড! সন্ধেবেলায় এত বড়ো চুলগুলো ভিজিয়ে এলে, তোমাদের মাথা নেড়া করে দেওয়া উচিত।' বাবা আমাদের বৃষ্টিতে ভেজার কাহিনীটি তাঁহাকে শুনাইয়া দিলেন। কবি বলিলেন, 'আচ্ছা তোমরা আমাদের আগেকার দিনের ধূপ দিয়ে চুল-শুকোনোর প্রথাটা চালাও-না। তোমরা মাথায় কত কি তেলটেল মাখো, নিশ্চয় কিছু কিছু germ হয়, বেশ fumigate করাও হয়ে যাবে। ধূপের ধোঁয়ায় হয়তো চুলে একটু আঠা হতে পারে, তা চন্দনকাঠের গুঁড়ো দিয়ে দেখতে পারো। সেটা একটু বেশি শৌখিন হবে বটে, তবে আমাদের চেয়ে একটু বেশি শৌখিন হওয়াই তোমাদের দরকার।' তাহার পর বাবার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করিলেন, আমি দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলাম। সন্ধ্যা হইয়া আসাতে তিনি চলিয়া গেলেন।

ইহার দুই-একদিন পরে শিশুবিভাগের ছেলেরা একটা সাহিত্যসভা করিল।

গুরুদেবকে সভাপতি করিতে হইবে, সুতরাং সভাটা তাঁহার ছাদেই হইল। সভাপতির কর্তব্য যে এত দুরূহ তাহা জানা ছিল না, ধাঁধার উত্তরসুদ্ধ তাঁহাকে বলিতে হইল।'

দিন আবার সেই আগেরই মতো কাটিতে লাগিল। সকালটা কাটিত কাজকর্মে, দুপুরে পড়াশুনার কাজ যাহা থাকিত তাহা সারিয়া রাখিতাম, বিকাল ও সন্ধ্যা বেড়াইয়া, গল্প করিয়া ও গান শুনিয়া কাটিত। সন্ধ্যার সময়টার জন্য সকলে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতাম, তিনি ছাদে আসিয়া বসিলেই একে একে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইতাম। যেদিন কোনো বাধা পড়িত সেদিন আর আমাদের দুঃখের সীমা থাকিত না। এই সময় রবীন্দ্রনাথের বহুদিন পূর্বের যত ব্রহ্মসংগীত ছেলেদের শিখানো হইতেছিল বৈতালিকের সময় গাহিবার জন্য। অনেক গানেরই সুর কলিকাতায় অতিশয় বিকৃত করিয়া গাওয়া হয়, এখানে ঠিক সুরটি শুনিয়া অবাক হইয়া যাইতাম।

বিকালে বেড়াইতে বেড়াইতে একদিন প্রতিমা দেবীর ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি তখন ভাঁড়ার তদারকে ব্যস্ত, চায়ের সময় হইয়া আসিয়াছে, টেবিলে চা-ও সাজানো। একটা প্লেটে দেখিলাম কয়েকটি সুপক্ব পেয়ারা। প্রতিমা দেবী সঙ্গিনীদের সাহায্যে সেগুলির সদ্‌গতি করিবার জন্য কয়েকটি তুলিয়া আনিলেন, এবং লবণ সংযোগ করিলে ব্যাপারটা আরো রুচিকর হইবে এই আশায় ভাঁড়ার-ঘরে গেলেন লবণ আনিতে। মনে রাখিতে হইবে ইহা প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বের কথা, আমরা কেহই তখন গুরুগম্ভীর গৃহিণীপদবাচ্য হই নাই। প্রতিমা দেবী এক দরজা দিয়া বাহির হইবামাত্র, রবীন্দ্রনাথ আর-এক দরজা দিয়া আসিয়া প্রবেশ করিলেন। আমাদের তখন হইল উভয়-সংকট। তাঁহার সামনে পেয়ারা খাওয়া চলে না অথচ ছুটিয়া পলাইলেই বা তিনি কি ভাবিবেন? আমি তাড়াতাড়ি একটা থামের আড়ালে সরিয়া গেলাম, প্রতিমা দেবী ও দিদি পেয়ারাগুলি আঁচল-চাপা দিলেন। রবীন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, 'কী যেন একটা গোলমাল চলছে, কী ব্যাপার?' কোনো সদুত্তর না পাইয়া খাইবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন, প্রতিমা দেবীও তাঁহার পিছন পিছন চলিয়া গেলেন। আমরা পাশের ঘর হইতে শুনিতে পাইলাম, তিনি পুত্রবধূর নিকট রহস্যটির মীমাংসা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কি উত্তর তিনি পাইলেন তাহা না শুনিয়াই আমরা তখনকার মতো পলায়ন করিলাম। অ্যান্ড্রুজ-সাহেবও তখন আসিয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত বিস্ময়বিমূঢ় মুখ করিয়া সকলের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ মাঠে ঘাটে ঘুরিয়া আবার ফিরিয়া আসিলাম। আমাদের বাড়ি যাইতে হইলে দেহলীর সম্মুখের রাস্তা দিয়াই প্রথমটা যাইতে হইত। নীচের বারান্দায় কমলা দেবী ও প্রতিমা দেবী বসিয়া আছেন দেখিয়া সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বিকালের ব্যাপার লইয়া হাসাহাসি করিতেছি এমন সময় রবীন্দ্রনাথ উপর হইতে নামিয়া আসিলেন। আমাদের দেখিয়াই বলিলেন, 'আচ্ছা, তোমরা পেয়ারা খাচ্ছিলে তো অত লজ্জিত হয়ে পালালে কেন? ও তো সব ভদ্রলোকেই খায়। আমি ভাবলুম বুঝি নুন তেঁতুল কাঁচালঙ্কা

দিয়ে কোনো মহিলাজনোচিত কুপথ্যের সৃষ্টি করছো, তাই মনে করছিলুম রামানন্দবাবুর কাছে গিয়ে নালিশ করি।' ইহা লইয়াই আরো খানিকক্ষণ রসিকতা করিলেন। আকাশে তখন মেঘের রাশি ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতেছে দেখিয়া বলিলেন, 'আমাকে তো ছাদ থেকে তাড়াবে এখুনি, আমি এখানে বসলে তোমাদের সখী-সমিতির আপত্তি নেই তো?' তাঁহার জন্য একখানি ইজিচেয়ার জোগাড় হইল, আমরা বারান্দায় একখানা নিচু তক্তপোশের উপর মাদুর পাতিয়া বসিয়া গেলাম। অনেকক্ষণ গল্প চলিল নানা বিষয়ে। তিনি ছোটোগল্পের ভিতর কোনটি প্রথম লিখিয়াছেন জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, 'কোনটা জানো? সেই-যে নিরুপমার গল্প, যার বাবা তার খুব বড়োলোকের ঘরে বিয়ে দিয়েছিল, শেষে টাকা দিতে পারলে না, বাড়ি-ঘর সব বিক্রি করে টাকা জোগাড় করল, কিন্তু মেয়ে সে টাকা ফিরিয়ে দিলে।' কিছুদিন আগে 'বশীকরণ' অভিনয় হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ তাহা দেখেন নাই, কমলা দেবী তাহার অনেক বর্ণনা দিলেন।

এই সময় গানের ঘণ্টা পড়াতে, রবীন্দ্রনাথ উঠিয়া দিনুবাবুর বাড়ি চলিয়া গেলেন। আমরাও খানিক পরে অনুসরণ করিলাম। গিয়া দেখি গানের নামগন্ধও নাই, অভিনয় সম্বন্ধে গল্প হইতেছে। আমরাও অন্ধকার বারান্দায় কিছু দূরে বসিয়া গল্পই করিতে লাগিলাম। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী রাজর্ষি রামমোহন সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা বলিলেন, যাহা আগে শুনি নাই। রামমোহন যখন অন্দরমহলে আসিতেন, তাহার আগে চাকররা তিনখানি চেয়ার লইয়া গিয়া ভিতরের ঘরে সাজাইয়া রাখিত। তিনি ভিতরে আসিয়া প্রথমে তাঁহার দুই পত্নীকে চেয়ারে বসাইয়া পরে নিজে বসিতেন। পরিবারের মহিলাদের গুরুর কাছে মন্ত্র নেওয়া তিনি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি নিজে তাঁহার পত্নীকে মন্ত্র দিয়াছিলেন। অন্য মেয়েরা রাজর্ষির পত্নীর নিকটেই মন্ত্র লইতেন। প্রথমা পত্নী রামমোহন রায়ের পূর্বেই মারা যান, দ্বিতীয়া তাঁহার মৃত্যুর পরেও বাঁচিয়া ছিলেন অনেকদিন। রামমোহন যখন বিলাত যান তখন জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদকে বলিয়াছিলেন, 'তোমার মায়ের সঙ্গে একবার দেখা করে যাব।' পুত্র তাহাতে বলেন, 'তা হলে আর আপনার যাওয়া হবে না।' এই কথা শুনিয়া তিনি পত্নীর সহিত দেখা না করিয়াই যাত্রা করেন, দেখা আর ইহজীবনে হয় নাই। এই কারণে তাঁহার পত্নী আমরণ জ্যেষ্ঠপুত্রের উপর মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন।

গল্প থামিয়া শেষের দিকে গানও কিছু হইল। তবে রাত বেশি হইয়া গিয়াছিল, গানের ক্লাস সংক্ষেপেই সমাপ্ত হইল।

কবির বিদেশযাত্রার একটা কথা চলিয়াই আসিতেছিল। ৯ সেপ্টেম্বর আমাদের বাড়ি একবার তিনি বেড়াইতে আসিলেন। হাতে একটি ইংরেজি কবিতা, সেটি বাবার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া খবর দিলেন যে, গভর্নমেন্ট তাঁহার এবং অ্যান্ড্রুজ-সাহেবের পাসপোর্ট রদ করিয়া দিয়াছেন। বলিলেন, 'ভালোই হল, যাবই না ঠিক করেছিলুম, এরা একটা ছুতো দিয়ে মনটাকে খুশি করে দিলে।'

প্রভাতবাবুর বিবাহ তখন আসন্ন, তিনি ক্রমাগত কলিকাতা ও শান্তিনিকেতন

করিতেছেন, প্রায় ডেলি-প্যাসেঞ্জারের দশা। মা তাঁহার হাতে আমাদের জন্য প্রায়ই কিছু-না-কিছু জিনিস পাঠাইতেন। একবার একবাক্স সাবান পাঠাইয়াছিলেন। সাবান যে পাঠানো হইয়াছে তাহা চিঠিতে জানিয়াছিলাম। সকালবেলা সামনের বারান্দায় বাহির হইয়া দেখি, রবীন্দ্রনাথ সেই সাবানের বাক্সটি হাতে করিয়া আমাদের বাড়ির দিকে আসিতেছেন, পিছন পিছন অতি ভালোমানুষের মতো আসিতেছেন প্রভাতবাবু। কাছে আসিয়া আমার দিকে তাকাইয়া কবি বলিলেন, 'তোমার বাবার কাছে একটা দরবার করতে এসেছি। তা তিনি যখন বাড়ি নেই, তোমাকেই বলে যাই। এই জিনিসটা কলকাতার থেকে এসেছে তোমাদের জন্যে, কিন্তু যিনি এনেছেন তিনি বলেছেন, my need is greater than thine. নিজে বলতে লজ্জা পান, তাই আমি তাঁর হয়ে বলে দিলুম। মেয়েদের দয়ালু হৃদয়, যদিই দিতে রাজি হও। এখন ভেবে দেখো।' প্রভাতবাবু কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, 'আমার সাবানের কোনো দরকার নেই।' রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'দেখেছ একবার জাঁক! আগে তো এরকম তুমি ছিলে না, এখন বুঝি এইরকম কথা মাঝে মাঝে শোনা তোমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে?' ইহা লইয়া বেশ খানিকক্ষণ হাস্য-পরিহাস করিয়া ও-সব কথা সুধাময়ীকে যেন লিখিয়া দিই আমাকে এই অনুরোধ করিয়া কবি চলিয়া গেলেন।

দিন-কয়েক পরে কলিকাতা হইতে প্রশান্তচন্দ্র ও কালিদাসবাবু শান্তিনিকেতনে বেড়াইতে আসিলেন। নূতন লেখা শুনিবার আবদার করিয়া তাঁহারা দুইজনে কোথায় যে উধাও হইয়া গেলেন, কবি আর তাঁহাদের খুঁজিয়া পান না। সন্ধ্যাবেলা আমরা যথানিয়মে বেড়াইতে বাহির হইয়া দেখি রবীন্দ্রনাথ নিজের manuscript-এর খাতাখানি লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। আমাদের দেখিয়া খবর দিলেন যে অতিথিদ্বয় নিরুদ্দেশ হওয়ায় তিনি তাঁহাদের খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। বলিলেন, 'লেখা যদি শুনতে চাও তো কাছাকাছি থেকো।' আমরা খানিক বেড়াইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম, কারণ পাঠ যে হইবে তখনো তাহার কোনো লক্ষণ দেখিলাম না। বাড়ি আসার কিছু পরে প্রশান্তচন্দ্র আসিয়া খবর দিলেন যে এইবার পড়া হইবে। সভাস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কবির ঘরের বাহিরে আসিতেই শুনিলাম তিনি আমাদের ডাকিবার জন্য কাহাকে যেন আদেশ করিতেছেন।

সেদিন সতী, বিদায় অভিশাপ, নরকবাস, কর্ণকুন্তীসংবাদ আর গান্ধারীর আবেদনের ইংরেজি অনুবাদ পড়িয়া শুনাইলেন। আমি মাটিতে বসিয়াছিলাম বলিয়া একটু বকুনি খাইলাম। বলিলেন, 'তোমরা জায়গা থাকতেও মাটিতে বসে লোককে কেন উদবিগ্ন করে তোল বলো তো?' অগত্যা উঠিয়া গিয়া তাঁহার কাছেই বসিলাম, কারণ আসন ঐ একটি শতরঞ্চি ভিন্ন সেখানে কিছু ছিল না। পড়া শেষ হইতে বেশ রাত হইয়া গেল।

শান্তিনিকেতনে শরৎ আসিয়া পড়িল। বর্ষা বড়ো সুন্দর লাগিয়াছিল, শরৎ অপরূপ লাগিল। কিন্তু তাহা শরৎ বা বর্ষার গুণ যতটা না, চোখেরই গুণ তাহার চেয়ে বেশি। সে চোখই তো আর নাই। ভূস্বর্গে গেলেও এখন আর সে সৌন্দর্য কোথাও দেখিব

না। সেই কাশফুল এখনো শারদার আনন্দবিকশিত হাসির মতো ফুটিয়া উঠে, শেফালি গাছের তলা মুক্তার আচ্ছাদনে যেন সাজাইয়া তোলে, কিন্তু আমাদের চোখে সে দৃষ্টি তো আর ফিরিবে না। সকালে প্রায়ই ফুল কুড়াইতে যাইতাম মনে পড়ে, ফিরিবার পথে মধ্যে মধ্যে কবির সঙ্গেও সাক্ষাৎ হইয়া যাইত।

সন্ধ্যার আসর সমানেই চলিতেছিল। তবে এই সময়ে আশ্রমে ইনফ্লুয়েঞ্জার উৎপাত বেশি রকম আরম্ভ হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ একটু উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। ঘুরিয়া ঘুরিয়া রোজই পীড়িত ছেলেদের দেখিয়া বেড়াইতেন, চিকিৎসাও করিতেন। সাধারণ উদ্ভিদ হইতে কি একটা প্রতিষেধকও তৈয়ারি করিলেন, যথাকালে সেবন করিয়া অনেকে জ্বরের হাত এড়াইল। তবু আমরা সন্ধ্যা হইলেই তাঁহার ছাদে গিয়া বসিতাম, যদি কিছু কথাবার্তা বলেন। একদিন উপরে উঠিয়া দেখিলাম, গোধূলির অস্পষ্ট আলোয় তিনি কি একখানি বই পড়িতেছেন। আমাকে দেখিয়া বইখানা কোলের উপর নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, 'এই যে এসো, দিনের আলোও নিবে এলো।' সেদিন আর হাসপাতাল তদারকে বাহির হইলেন না, অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া গল্প করিলেন। অতিশয় ফিরিঙ্গী স্বভাবের বাঙালি মেয়েদের কথা উঠিল, কয়েকজনের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, 'এরা যেন কি এক বেয়াড়া রকমের তৈরি হয়েছে। বিলেতে এক ধরনের প্রজাপতি-জাতীয় এবং loud-mannered মেয়ে আছে বটে, কিন্তু সব ডিঙিয়ে এরা তাদের ধরনই বা পেল কোথা থেকে?' তাহাদের কণ্ঠস্বরের কিঞ্চিৎ নকল করিয়া শুনাইলেন। হঠাৎ ঠাট্টার সুর ছাড়িয়া আবার গম্ভীর হইয়া গেলেন। দেশের যত দুঃখ-দারিদ্র্য, অভাব-অভিযোগের কথা এবং নিজের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। নিজের জীবনের নিরন্তর টানাটানির কথা তুলিলেন, বলিলেন, 'আমাদের দেশে সবাইকে সব হতে হবে। আমি বাস্তবিক কবি হতেই জন্মেছিলুম, কিন্তু আমায় কি না করতে হল! কিন্তু আর তো পারি নে।' সেদিন একটু ম্লান জ্যোৎস্নার উদয় হইয়াছিল, যদিও আমরা যখন বাড়ি ফিরিলাম তখন মাঠে আঁধার নামিয়া আসিয়াছে।

তিনি এই সময় ছেলেদের ইংরেজি পড়াইতেন তাহা আগেই বলিয়াছি। উপরি উপরি তিনটি ক্লাস নিতেন, আমরা সমানে তিনটিতেই বসিয়া থাকিতাম। Fifth Group-এর ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করিতেন। তিনি ক্লাসে আসিয়া বসিবামাত্র তাহারা আশ্রমের যত খবর ইংরেজিতে তাঁহাকে শুনাইত। বয়সের পক্ষে ইংরেজি নিতান্ত মন্দ বলিত না। শ্যামকিশোর-নামক একটি ছোটো ছেলে সবচেয়ে ভালো সংবাদদাতা ছিল বলিয়া মনে পড়ে। Third Group-কে তখন রবীন্দ্রনাথ Shelley-র কবিতা পড়াইতেছিলেন। প্রথম চারদিনে Hymn to Intellectual Beauty শেষ করিলেন। এই সময় সঙ্গে সঙ্গে শারদোৎসবের রিহার্সাল আরম্ভ হইল। সেখানেও রীতিমতো হাজিরা দিতে আরম্ভ করিলাম। এত-সবের ভিতর সংসারের কাজকর্ম যে কি করিয়া চালাইতাম তাহাই এখন ভাবিয়া পাই না। কিন্তু অল্প বয়সের উৎসাহ এবং আগ্রহ কোনো বাধাকেই বাধা বলিয়া মানে না, তাহাও ভাবি।

তাঁহার ক্লাসে ছেলেরা এক-একদিন বকুনিও খাইত দেখিতাম। অন্য মাস্টারে বকেন যদি ছাত্র পড়া না করে বা ভুল উত্তর দেয়, রবীন্দ্রনাথ বকিতেন নীরব হইয়া থাকিলে; ভুল হউক, ঠিক হউক, ছাত্র বলিতে চেষ্টা করিবে ইহাই ছিল তাঁহার উপদেশ। দুই-একজন ছেলে তবু চুপ করিয়া যাইত, তিনি শেষ পর্যন্ত তাহাদের দিয়া বলাইয়া ছাড়িতেন, ভালো কথায় না কাজ হইলে বিরক্ত হইয়া কড়া সুর ধরিতেন। ছাত্রদের কাছে ব্যাপারটা কি প্রকার লাগিত তাহা জানি না, আমরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিতাম।

আমাদের ছাদের সান্ধ্য মজলিসে মাঝে মাঝে ছোটোখাটো তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া স্নেহের তিরস্কার লাভ করিতে হইত। একটা কারণ ছিল আসন থাকিতেও মাটিতে বসা, আর-একটা কারণ ছিল তাঁহার পিছনে গিয়া বসা। একদিন উপরে উঠিয়া দেখিলাম, বাবা এবং আর-একজন কে ভদ্রলোক বসিয়া কবির সঙ্গে কথা বলিতেছেন। কথাবার্তার ভিতর বাধা না জন্মাইবার ইচ্ছায় পিছনে একটু দূরে বসিলাম। কিন্তু আমাদের আগমন তাঁহার চোখ এড়ায় নাই। তৎক্ষণাৎ বলিলেন 'এই দেখো, বসলেই যদি তো পিছনে বসলে কেন? এমন জায়গায় বোসো যাতে মুখ দেখা যায়।' অগত্যা সরিয়া আসিয়া পাশের দিকে বসিলাম। Shelly পড়ানো বুঝিতে পারিতেছি কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। কথাবার্তা চলিতে লাগিল এমন সময় প্রতিমা দেবী উপরে আসিয়া, আমরা প্রথমে যে জায়গাটায় বসিয়াছিলাম, সেইখানেই গিয়া বসিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিলেন, 'আচ্ছা, এটার psychology কে বলতে পারে? বউমা তো তোমাদের আসতে দেখেনও নি, তবে এরকম হল কী করে?'

ইহার পর Co-operative Society সম্বন্ধে ছেলেদের সব বুঝাইয়া বলা হইবে বলিয়া ছাদেই একটি ছোটোখাটো সভা হইল। ছেলের দল আসিল, আমরা অবশ্য নড়িলাম না। রবীন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাদের জিনিসটা কি তাহা বুঝাইলেন। বড়োরা নিবিষ্ট মনে শুনিল, ছোটোর দল ঘুমাইতে আরম্ভ করিল। অনেক রাত্রি হইয়া গেল সভা ভঙ্গ হইতে।

তাঁহার Shelley-র ক্লাস নিয়মিতই চলিতেছিল। প্রকাণ্ড গাছের তলায় একটি গোল ছত্রাকার মণ্ডপ, ভিতরে অশ্বখুরের আকৃতির একটি মাটির বেদী, ছেলেরা নীচে আসন পাতিয়া বসিয়া বেদীটিকে ডেস্করূপে ব্যবহার করিত। এধারে-ওধারে বেতের চৌকি ও মার্বেল পাথরের চৌকি গোটাকয়েক সাজানো থাকিত, সেখানে আমাদের মতো রবাহূত শ্রোতা ও শ্রোত্রীরা গিয়া বসিত। চারি দিকে তখন সবুজের বন্যা, মাথার উপর পাতা ঝরিয়া পড়িতেছে, হাওয়ায় বই-খাতাও উড়িয়া পলাইতে চায়। বসিয়া ভাবিতাম, Ode to West Wind পড়িবার ঠিক স্থান ও কাল বটে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অসাধারণ কর্মী পুরুষ, নিজে বিশ্রাম কাহাকে বলে তাহা তো জানিতেন না, অন্তত তখনকার দিনে। কাছে যাহারা থাকিত তাহারাও যে অলসের মতো বসিয়া থাকিবে ইহা তিনি দেখিতে পারিতেন না, ধরিয়া যাহা হউক একটা-কিছু কাজে লাগাইয়া দিতেন। ভালো করিয়া পারুক বা নাই পারুক কাজ করিতে সকলে চেষ্টা করিবে

ইহাই তিনি চাহিতেন। এই সময়ে তিনি ম্যাট্রিক ক্লাসের ছেলেদের জন্য একটি তর্জমার বই তৈয়ারি করিতে আরম্ভ করিলেন। নিজে নানা ইংরেজি মাসিক পত্র ও পুস্তক হইতে খানিকটা করিয়া জায়গা দাগ দিয়া দিতেন, আমাদের অনেকের উপর ভার ছিল সেগুলি সহজ বাংলায় রূপান্তরিত করা। আমার এই কাজটি বড়োই মনের মতো হইয়াছিল। তাঁহার দেওয়া কাজ করিতেছি ইহাই ছিল প্রধান আনন্দের কারণ ; তাহার উপর এইগুলি দেখানো সংশোধন করা প্রভৃতি নানা কাজে তিনি অনেকবার করিয়া দিনের মধ্যে ডাকিয়া পাঠাইতেন, ইহাও কম আনন্দের খোরাক জুটাইত না।

বুধবার শান্তিনিকেতনে ছুটি। সকালে মন্দিরে যাওয়ার পর যথা-ইচ্ছা ঘুরিয়া বেড়াইতাম, কাজকর্মে সেদিন ঢিলা পড়িয়া যাইত। এই সময়ে জ্বরের উৎপাতে আমাদের সঙ্গিনীরা অনেকেই বেড়াইতে যাইতে পারিতেন না। এক বুধবারে কমলা দেবীর জ্বর হইয়াছে শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। যখন ফিরিয়া আসিতেছি তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, বলিলেন, 'আজ আমার ছাদে শিশু-সাহিত্য-সভা হবে। থেকো কিন্তু।'

শিশুদের সাহিত্য-সভা তখনকার দিনেও বড়োদের সাহিত্য-সভার চেয়ে উপভোগ্য হইত বেশি। শিশু সাহিত্যিকদের সম্পাদক তখন ছিলেন শ্রীমান মৌলি শাস্ত্রী, খুব যোগ্য সম্পাদকই ছিলেন। কবি ও সংগীতকার ছিলেন শ্রীমান সমরেশ সিংহ। তাঁহার শিশুকণ্ঠের আশ্চর্য সুন্দর গান এখনো কানে বাজে। সেদিনকার গান গল্প ও কবিতা-পাঠ সবই খুব ভালো লাগিয়াছিল, শুধু 'কাবুলি বেড়াল' অভিনয়টা তেমন ভালো লাগে নাই।

বৃহস্পতিবারে তাঁহার ছাদে বসিয়া আমরা অনেকগুলি মেয়ে গল্প করিতেছি, রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করিলেন যে তিনি এই সন্ধ্যার সময়ই আমাদের কয়জনকে আলাদা করিয়া Shelley পড়াইবেন। আমরা তো হাতে স্বর্গ পাইলাম, অবশ্য সারাদিনের পরিশ্রমের পর আবার আমাদের পড়াইতে বসিলে তাঁহাকে বড়োই শ্রান্ত হইয়া পড়িতে হইবে বলিয়া মৌখিক একটু আপত্তিও করিলাম। তিনি সে-সব কথা কানেই তুলিলেন না। শ্রান্তি বলিয়া কোনো জিনিসকে তখনকার দিনে গণনার মধ্যেই আনিতেন না। সেদিন বোধ হয় পূর্ণিমা ছিল, উন্মুক্ত প্রান্তরের উপর দিয়া জ্যোৎস্নার জোয়ার বহিয়া চলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন, 'মানুষ কেবল বর্তমানের অতি তুচ্ছ জিনিসগুলো প্রকাণ্ড করে তুলে তাই নিয়ে দিনরাত্রি অস্থির হয়ে থাকে, কিন্তু সে-সবের দিকে ফিরেও তাকায় না যা কত যুগ-যুগান্তর ধরে নিজেদের অপরূপ সৌন্দর্য আর মহিমা নিয়ে বারে বারে ফিরে ফিরে আমাদের এই পৃথিবীতে নেমে আসছে, এই শরতের শ্যামল শ্রী, এই নিবিড় নীল আকাশ, এই পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে জ্যোৎস্নার প্লাবন পৃথিবীর জন্মের পর থেকে এরা তার বুকে কেবলই আসছে যাচ্ছে, কিন্তু এদের দিকে আমরা ফিরে চাই না, আমাদের মন পড়ে আছে কেবল সব ক্ষণিক তুচ্ছতা নিয়ে।'

হঠাৎ কি কারণে জানি না, পুনর্জন্মের কথা উঠিল। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'দেখো তোমরা সব ব্রাহ্ম সমাজের মেয়ে, কি ভাববে জানি না, আমি কিন্তু পুনর্জন্মে বিশ্বাস

করি। কেন করি তাও বলছি। পৃথিবীর সব জিনিসেই দেখি একটা cycle পরিভ্রমণ করছে, গাছ যে ছিল সে আবার গাছ হয়েই জন্ম নিচ্ছে, পরেও নেবে। শুধু আমরাই কোথার থেকে এলাম তার ঠিক নেই, আর কি হয়ে যাব তারো ঠিক নেই, এ হতেই পারে না। আমরা ক্রমাগতই মানুষ হয়ে জন্মে আমাদেরই একটা cycle শেষ করব, তার পর হয়তো অন্য কোনো cycle-এ উঠতে পারি।'

ব্রাহ্ম সমাজের মেয়ে হইলেও আমি নিজেও কোনোদিন ভাবিতে পারি নাই যে এই জীবনেই আমার ধরিত্রীর সহিত সকল বন্ধন একেবারে শেষ হইয়া যাইবে। তাঁহার মতো মানুষের মুখে এই কথা শুনিয়া বড়োই আশ্চর্য বোধ করিয়াছিলাম। এই বিষয়েই কথা চলিতে লাগিল। কবি আবার বলিলেন, 'জানো, আমার মনে হয়, শুধু আবার আমরা যে মানুষ হয়ে জন্মাই তাই নয়, আমাদের আগের জন্মের যে বন্ধন তা আবার ফিরে আসে, তা না হলে আমাদের এক-একজন মানুষের সঙ্গে হঠাৎ এমন এক-একটি সম্বন্ধ দাঁড়িয়ে যায় কেন?'

এই কথাগুলি স্মরণ করিয়া প্রাণে এখন আশ্চর্য এক সান্ত্বনার অনুভূতি আসে। সত্যই তো যাহা মানবাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার সম্পর্ক তাহা পাঞ্চভৌতিক একটা দেহের বিনাশের সঙ্গে বিনষ্ট কেমন করিয়া হইবে? তাহা তো রহিলই আত্মার মধ্যে চিরন্তন হইয়া। তবে কেন এত শোক, এত বিচ্ছেদ-দুঃখ? তিনি কি আর তাঁহার এত প্রিয় ধরণীতে আর ফিরিয়া আসিবেন না? আমরাও তো আবার ফিরিতে পারি। এ জীবনে তাঁহার স্নেহ পাইয়াছিলাম, সান্নিধ্য পাইয়াছিলাম যে সুকৃতির বলে, তাহাই হয়তো আর-একবার আমাদের তাঁহার নিকটে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে। অনেক রাত পর্যন্ত তাঁহার ছাদেই সকলে বসিয়াছিলাম। উঠিবার উপক্রম করিতেছি, তখন একবার আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'পৃথিবীটা মোটের উপর মন্দ জায়গা নয়, কী বল?'

পরদিন বিকালে আবার কমলা দেবীর খোঁজ লইতে চলিয়াছি, দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ তখন বারান্দায় টেবিল বাহির করিয়া চা খাইতে বসিয়াছেন। আমাকে দেখিয়াই ডাকিয়া বলিলেন, 'আজ পড়বে?' আমি তো তৎক্ষণাৎ রাজি, বই আনিতে ও সঙ্গিনীদের খবর দিতে চলিলাম। কবি অবশ্য আমাকে খানিকটা বেড়াইয়া আসিতে অনুমতি দিয়াছিলেন, কিন্তু তখন কি আর বেড়াইয়া সময় নষ্ট করা চলে? তাঁহার চা খাওয়া শেষ হইতেই কয়েকজন তাঁহার ছাদে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমরা দুই বোন এবং প্রতিমা দেবী এই ক্লাসের ছাত্রী ছিলাম। আরো দুই-একজন এক-একদিন আসিতেন, আবার সব দিন আসিতেনও না। প্রথমদিন 'Life Not the Painted Veil' এই sonnetটি পড়াইলেন। পড়ানো ও বুঝানোর পরেও অনেকক্ষণ বসিয়া গল্প করিলাম।

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ইহার পরেরদিনই বোধ হয় কলিকাতা হইতে আসিলেন। সেদিন আর আমাদের পড়াইবার সময় পাইবেন না মনে করিয়া আমরা কমলা দেবীর ছাদে বসিয়া গল্প আরম্ভ করিলাম। তবু একবার দেখিয়া আসি পড়াইতে পারিবেন কি না, এই মনে করিয়া খানিক বাদে দেহলীর ছাদে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখি বই হাতে

করিয়া ঠিক অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন। নিজেদের নির্বুদ্ধিতার জন্য তখন বড়োই অনুতাপ হইল। যাহা হউক, ছাত্রীরা আসিয়া জুটিলাম, যেটুকু সময় ছিল তাহাতেই আর-একটি sonnet পড়া হইল। তাঁহার অন্য কাজ থাকিতে পারে মনে করিয়া পড়ানো শেষ হইতেই তাড়াতাড়ি নামিয়া চলিয়া আসিলাম।

রবিবার দিন পড়া আরম্ভ করিতেই অন্ধকার হইয়া গেল। প্রতিমা দেবী নীচে গেলেন একটা আলো আনিবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ গর্ব করিতেন যে বয়সের তুলনায় তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ভালোই আছে, এখন তিনি ভালো দেখিতে পাইতেছেন না অথচ আমরা দেখিতে পাইতেছি বলাতে বলিলেন, 'শুধু পারছি বললেই হবে না তো, প্রমাণ করো যে পড়তে পারছ।' তাঁহার কাছে প্রমাণ উপস্থিত করা আর আমাদের সাধ্যে কুলাইল না। আলো আসিবার পর আবার পড়া আরম্ভ হইল। এই সময় সন্তোষবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাদের ক্লাস দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন রোজ হয় কি না এবং কখন হয়। রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, 'যখন আমার three Graces আসেন।'

ক্লাস সেদিন অগ্রসর হইল না। খানিকক্ষণ অন্যান্য বিষয়ে কথা বলিয়া নামিয়া গেলাম। আমাদের নূতন নামকরণ লইয়া প্রচুর হাসাহাসি হইল। ইহার পর দুই-চারদিন নানা বাধা পড়িয়া Shelley-র ক্লাস আর হইল না। তাহার পর আবার Adonais বইখানি আরম্ভ করিলেন, ছাত্র-ছাত্রী আরো কয়েকটি জুটিয়া গেল। তর্জমার কাজ অবশ্য সমানে চলিতেছিল। রোজ দুপুরে গিয়া তাঁহাকে লেখাগুলি দেখাইয়া আসিতাম, নূতন কাজ লইয়াও আসিতাম। তিনি নিজেও অনেক সময় বাড়িতে আসিয়া কাজ দিয়া যাইতেন। খাতা পাইবামাত্র সেইখানে বসিয়াই সংশোধন করিয়া দিতেন। এই অতি তুচ্ছ কাজটাও এমন সুন্দর করিয়া করিতেন যে তাহাই একটা দেখিবার জিনিস ছিল। নূতন কাজ চাহিলেই বলিতেন, 'আর সহ্য করতে পারবে? মনে দুঃখ হবে না তো?' কাজ করিতে না পাইলেই মনে দুঃখ হইবে, ইহাই তাঁহাকে বলিতে ইচ্ছা করিত। প্রথমে খুব ভয়ে ভয়ে এই লেখার কাজ আরম্ভ করিয়াছিলাম, কারণ ঐ কাজই আরো কয়েকজনকে দিয়া রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছিলেন। আমার লেখাও পাছে ভালো না হয়, তিনি বিরক্ত হন, এই ভয়টা ছিল। কিন্তু তিনি এতই প্রশংসা আরম্ভ করিলেন যে ভয় তো কাটিয়াই গেল, দুই-একবার সন্দেহ হইল যে আমাকে স্নেহ করেন বলিয়াই বাড়াইয়া বলিতেছেন কি না। একদিন বলিলেন, 'সীতাই একমাত্র আমাকে একটু দয়ামায়া করে।' আমাকে আর-একদিন বলিলেন, 'অন্যদের হাত থেকে আমাকে একটু বাঁচাও দেখি, আমি আর কাউকে দেব না।' অন্যরা যে আমার উপর বেশি খুশি হইবে না সে ভয়টা যে না হইয়াছিল তাহা নহে। তবে বয়সে সকলের চেয়েই অনেক ছোটো ছিলাম বলিয়াই কাহারো বিশেষ বিরাগভাজন হই নাই। একদিন লেখা দেখানো শেষ হইতে-হইতেই সূর্য ডুবিয়া গেল, তিনি যথানিয়মে ছাদে গিয়া তাঁহার ইজিচেয়ারটিতে বসিলেন। অন্য কয়জনও আসিয়া বসিলেন। কথায় কথায় তাঁহার "নিশীথে" গল্পটির প্রসঙ্গ উঠিল। "কঙ্কাল" গল্পটা কেমন করিয়া লিখিলেন তাহা বলিতে লাগিলেন 'ছেলেবেলা আমরা যে ঘরে শুতুম তাতে একটা

মেয়ের skeleton ঝুলানো ছিল। আমাদের কিন্তু কিছু ভয়টয় করত না। তার পর অনেকদিন কেটে গিয়েছে, আমার বিয়েটিয়ে হয়ে গিয়েছে, আমি তখন ভিতর-বাড়িতে শুই। একদিন কয়েকজন আত্মীয়া এসেছেন, তাঁরা আমার ঘরে শোবেন, আমার উপর হুকুম হয়েছে বাইরে শোবার। অনেকদিন পরে আমি আবার সেই ঘরে এসে শুয়েছি। শুয়ে চেয়ে দেখলুম, সেজের আলোটা ক্রমে কাঁপতে কাঁপতে নিবে গেল। আমার মাথায় বোধ হয় তখন রক্ত বোঁ বোঁ করে ঘুরছিল, আমার মনে হতে লাগল কে যেন মশারির চার দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বলছে, "আমার কঙ্কালটা কোথায় গেল, আমার কঙ্কালটা কোথায় গেল?" ক্রমে মনে হতে লাগল সে দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে বন বন করে ঘুরতে আরম্ভ করেছে। এই আমার মাথায় গল্প এসে গেল আর-কি।'

"জীবিত ও মৃত" লেখার কাহিনীও শুনিলাম। তিনি বলিলেন, 'ছোটোবউ তখনো বেঁচে। আমার তখনকার দিনে ভোররাত্রিতে উঠে অন্ধকার ছাদে ঘুরে বেড়ানো প্রভৃতি অনেক রকম কবিত্ব ছিল। একদিন রাত্রে ঘুম ভেঙে যেতেই উঠে পড়লুম, ভেবেছিলুম আমার সময় হয়েছে, আসলে কিন্তু তখন দুপুর রাত। অন্ধকার বারান্দার ভিতর দিয়ে, দালান পার হয়ে, আমি grope করতে করতে চলতে লাগলুম। সব ঘরে দরজা বন্ধ, এ ঘরে ন' বউঠান ঘুমচ্ছেন, সে ঘরে অন্য কোনো বউঠান ঘুমচ্ছেন, সব একেবারে নীরব, নিঝুম। খানিক দূরে আসতেই আপিস-ঘরে না কোথায় ঢং ঢং করে দুটো বেজে গেল। আমি থমকে দাঁড়ালুম, ভাবলুম, তাই তো, এই গভীর রাত্রে আমি সারা বাড়িময় এমন করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ মনে হল, আমি যেন প্রেতাত্মা, এ বাড়ি haunt করে বেড়াচ্ছি। আমি যেন মোটেই আমি নয়, আমি'র রূপ ধরে বেড়াচ্ছি মাত্র। একটা খেয়াল মাথায় এল যে, আচ্ছা, আমি যদি এখন পা টিপে টিপে ঘরে ফিরে গিয়ে, মশারিটা তুলে, খুব solemn ভাবে প্রশ্ন করি "তুমি জান আমি কে?" তা হলে কেমন হয়? অবশ্য আমি তা করি নি, করলে খুব একটা scene হত নিশ্চয়। হয়তো রাত্রে মাঝে মাঝে উঠে সে ভাবতেও পারত, "তাই তো, এ সত্যিই আর কিছু নয় তো?" কিন্তু ideaটা আমাকে পেয়ে বসল, যেন একজন জীবিত মানুষ সত্য সত্যই নিজেকে মৃত বলে মনে করছে।' এই বোধ হয় প্রথম তাঁহার মুখে তাঁহার পত্নীর উল্লেখ শুনিলাম।

২৭ সেপ্টেম্বর ১৯১৮ রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভা হইল এখানে। আগেরদিন দুপুরবেলা বসিয়া লিখিতেছি, বাবা পাশের ঘরে ঘুমাইতেছেন, এমন সময় মনে হইল বাহিরে কাহার পায়ের শব্দ শোনা যাইতেছে। আমি দরজার কাছে আসিয়া দেখিলাম রবীন্দ্রনাথই বটে, বাবাকে নিদ্রিত দেখিয়া ফিরিয়া যাইতেছেন। আমাকে দেখিয়া ইশারায় বাহিরে ডাকিয়া বলিলেন, 'আমি তোমার বাবাকে কালকের সভায় কিছু বলবার জন্যে অনুরোধ করতে এসেছিলুম, তা তুমিই একটু বলে রেখো। আমি বিকেলে আবার ভালো করে ধরব এখন। তোমরা কিছু বলবে?' আমি তো প্রস্তাব শুনিয়া আকাশ হইতে পড়িলাম। তাঁহার সামনে বক্তৃতা করা আমাদের কল্পনারও অতীত ছিল। তিনি সেটা বুঝিতেনও বোধ হয়, তবু বলিলেন, 'সংযুক্তা দেবী কিছু বোলো, কেমন?' সংযুক্তা বা বিযুক্তা কোনো

ভাবেই এ অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হইল না। একখানা বই বাহির করিয়া বলিলেন, 'আর এই নাও তোমার কাজ।' কোন কোন জায়গা অনুবাদ করিতে হইবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহা দেখাইয়া দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় মন্দিরেই স্মৃতিসভা হইল। ছেলেরা শিউলি ফুলের মালা দিয়া মন্দির খুব সুন্দর করিয়া সাজাইয়াছিল। বক্তৃতা করিলেন রবীন্দ্রনাথ ও বাবা। একটু রাত হইয়া যাওয়াতে কয়েকটি ছোটো ছেলে মন্দিরের ভিতরেই শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

পূজার ছুটি আসিয়া পড়িল। তবে ছুটির আগের উৎসবটা এবার তেমন জমিল না, আশ্রমে ইনফ্লুয়েঞ্জার উৎপাতে। 'শারদোৎসব' অভিনয় করার কথা ছিল কিন্তু দিনুবাবুর জ্বর হওয়ায় তাহা পণ্ড হইল, তাহার পরিবর্তে ছোটো একটি সংস্কৃত নাটিক এবং শারদোৎসবের ইংরেজি অনুবাদটি অভিনীত হইল। কলিকাতা হইতে অতিশয় অল্প কয়েকজন অতিথি আসিলেন।

আমরা পূজার ছুটিতে কলিকাতা চলিয়া আসিব কথা ছিল। রবীন্দ্রনাথ শুনিলাম মান্দ্রাজ অঞ্চলে ভ্রমণে যাইবেন। শান্তিনিকেতন হইতে চলিয়া আসিবার আগে একদিন তাঁহার কাছে গেলাম অনুবাদের খাতাগুলি দিয়া আসিবার জন্য। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, 'বোসো, এই চিঠিখানা সেরে নিই।' কে এক মুসলমান যুবক একটি মাসিক পত্র বাহির করিবে, তাই তাঁহাকে অনুরোধ-পত্র লিখিয়াছে লেখার জন্য, সেই চিঠিরই উত্তর দিতে বসিয়াছেন। বলিলেন, 'ভাবছি যে লিখে দিই যে আমি তো লিখতে পারব না, তবে আমার এখানে একটি বঙ্গমহিলা আছেন, তিনি বেশ লিখতে পারেন, তাঁকে ধরুন।' সত্যই এই উত্তর পাইলে লোকটি কিরকম খুশি হইত কল্পনা করিয়া হাসি পাইল।

সেইদিনই কি তার পরেরদিন আশ্রমের অনেকেই সুরুলে পিকনিক করিতে প্রস্থান করিলেন। রবীন্দ্রনাথ গেলেন না। আমরাও যাই নাই। বিকালে সেদিন দেখা হইবামাত্র বলিলেন, 'সীতা, আজ তো যে যার বেরিয়ে পড়েছে, আমরাই বা কেন চুপচাপ থাকি, আমরাও কেন কাব্যালোচনা করি না?' আপত্তি আমাদের কাহারো ছিল না, তবে তাঁহার চা খাওয়া হয় নাই বলিয়া আমরা খানিক ঘুরিয়া আসিতে গেলাম। ঘোরাঘুরি করিয়া ও দুই-চার জায়গায় আটকা পড়িয়া বেশ সন্ধ্যা হইয়া গেল। দেহলীর ছাদে যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন কবি একটু বিরক্তির সুরেই বলিলেন, 'এত দেরি করলে কেন?' যাহা হউক, Shelley পড়াইতে বসিলেন। সেদিন Skylark কবিতাটি পড়া হইল। Adonais মাঝে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ অবধি সেটি পড়ানো হইল না, খানিকটা পড়াইয়াই ছাড়িয়া দিলেন।

এই সময় তাঁহার 'পলাতকা' বইখানি বাহির হয়। দুপুরবেলা তাঁহার বাড়ির এক বালক ভৃত্য আসিয়া বই একখানি দিয়া গেল। খুলিয়া দেখিলাম তাহাতে নাম লিখিয়া দিয়াছেন 'শ্রীমতী সংযুক্তা দেবী কল্যাণীয়াসু।' মা এই সময় আসিয়া বলিলেন, 'রবিবাবুর চোখে কি হয়েছে, আমি সন্তোষদের বাড়ি শুনে এলাম।' বিকালে দেখিতে গেলাম। সত্যই একটা চোখ রক্তের মতো লাল হইয়া উঠিয়াছে, চোখের তলা ও চারি পাশ ফোলা।

ওষুধ-মাখা হাত হঠাৎ চোখে দিয়া ফেলাতেই এরকম হইয়াছে শুনিলাম। বসিয়া বসিয়া মেয়েস্কুল করার কথা, মাস্টারদের জন্য বাড়ি করার কথা প্রভৃতি অনেক গল্প করিলেন। ঐ সময় একটি ঔপন্যাসিক যশঃপ্রার্থিনী মহিলা শান্তিনিকেতনে গিয়া জুটিয়াছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় তিনি দিন-কতক বেশ আশ্রমপীড়া ঘটাইয়াছিলেন। তাঁহার কথা ওঠায় বলিলেন, 'ওকে নিয়ে সুবিধে হবে বলে বোধ হচ্ছে না,—টা বোকা, তার ঘাড়ে এসে চেপেছে।' আমি হাসিতেছি দেখিয়া বলিলেন, 'এইবার বলব সীতার সঙ্গে থাকবার ব্যবস্থা করো।' আমি বলিলাম, 'আপনি বললেও সে আসবে না, আমার সঙ্গে তার কিছু ভাব নেই।' তিনি বলিলেন, 'নেই নাকি? তাই বুঝি তোমায় নিজের লেখা দেখাতে চাইলে না, আমি বলেছিলুম তোমায় দেখাতে। ও লেখে বলে বুঝি ওর উপর তোমার হিংসে আছে? তবে তো ওর লেখা পড়ে দেখতে হচ্ছে কেমন লেখে।' আমি বলিলাম, 'তাই দেখবেন, তা হলে সে অন্তত ঐ কারণে আমাকে ধন্যবাদ দেবে।'

অনুবাদের বইখানি ছাপানোর কথায় বলিলেন, 'এতে তোমার লেখাই তো বেশির ভাগ থাকবে, আমার স্কুলকে তার copyright দান করছ তো?' দান যে করিব তাহা তো ধরাই ছিল। ছোটোদের জন্য বর্ণপরিচয়ের একটা গল্প লিখিবেন বলিলেন। গল্পটা খানিক বলিয়াও গেলেন মুখে মুখে। কেন যে তাহা শেষ পর্যন্ত লিখিলেন না জানি না। আমায় একবার বলিলেন, 'এই ideaটা নিয়ে লেখো।' কিন্তু তাঁহার idea লইয়া লেখার সাধ্য আমার ছিল না। বলিলেন, তোমায় যত সংক্ষেপে বলছি এমন করলে চলবে না, আরো ঢের কিছু জুড়তে হবে। বইয়ের জন্য আঁকা ছবিও দেখাইলেন কয়েকটা। আবার বলিলেন, 'মুশকিল হচ্ছে এই যে, আমি মোটেই চিন্তাশীল লোক নই, লিখতে আরম্ভ না করলে আমার মাথায় কিছুই আসে না।' নিজের এরূপ আশ্চর্য চিত্র দেওয়ায় আমি হাসিতেছি দেখিয়া বলিলেন, 'আমার যতই পরিচয় পাবে ততই দেখবে যে, আমাকে যা ভেবেছিলে সেরকম মোটেই নয়।'

সেইদিনই রাত্রে সংস্কৃত অভিনয় হইল। অভিনয় দেখিতে চলিয়াছি, দেখিলাম দেহলীর নীচের বারান্দায় রবীন্দ্রনাথ বসিয়া আছেন। কাছে বসিয়া প্রভাতবাবু। আমাকে দেখিয়াই রবীন্দ্রনাথ ডাকিয়া বলিলেন, 'সীতা, তোমার বন্ধুকে লিখে দিয়ো যে প্রভাতকে আমি বিশেষরকম যত্ন করছি।' চোখের খোঁজ লইয়া জানিলাম কিছু ভালো আছেন। কমলা দেবী জানিতেনই না যে তাঁহার চোখে কিছু হইয়াছে। কি হইয়াছে জানিতে চাওয়ায় তিনি কৃত্রিম ভর্ৎসনার সুরে বলিলেন, 'যাও যাও, তোমার আর খোঁজ নিতে হবে না, এতক্ষণে এলেন কী হয়েছে জানতে।'

অভিনয় মন্দ হয় নাই। সংস্কৃত অভিনয়টির পর শ্রীমান মুলু ও কয়েকটি ছেলে একটি মূক অভিনয় করিল। গল্পটিতে এক গুরুর অনন্ত দুর্গতি দেখানো হইল। শুনিতে পাইলাম রবীন্দ্রনাথ বাবাকে বলিতেছেন, 'মশায়, আপনারা ব্রাহ্মসমাজ থেকে এসে এ কী আরম্ভ করেছেন বলুন তো? গুরু মানেন না বলে কি এমনিই করতে হয়?

ভাই-বোনে মিলে কেবল গুরুর পিছনেই লেগে আছে। আমি কিন্তু protest করছি।
অভিনয়ান্তে আমাকে সামনে পাইয়া ঐ কথাই আর-একবার শুনাইয়া দিলেন।

পরদিন সকালে একখানি ইংরেজি বই আনিয়া আমাকে অনুবাদ করিবার জন্য দিয়া গেলেন। যে জায়গাগুলি দাগ দিয়াছিলেন তাহা দেখাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, 'ভেবো না যে এগুলো আমি তোমাকে দুঃখ দেবার জন্য আনি, তুমি এগুলো পেলে এত খুশি হও বলেই আমি কখনো খালি হাতে আসি না।' কাজটা কলিকাতা যাইবার আগে শেষ করিয়া দিয়া যাই ইহাই দেখিলাম তাঁহার ইচ্ছা। সুতরাং তিনি চলিয়া যাইবামাত্র লিখিতে বসিয়া গেলাম এবং একটানা ঘণ্টা-দুই লিখিয়া শেষ করিলাম। খাতা তাঁহাকে তখন-তখনি দেখাইয়াও আনিলাম।

রাত্রিকালে ইংরেজি শারদোৎসব অভিনয় হইল। অভিনয়ান্তে ছেলেরা 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গাহিয়া আশ্রম প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। চারি দিকে সকলেই তখন পরস্পরের কাছে বিদায় গ্রহণ করিতেছে। এই সময় মনটা বড়োই অবসন্ন বোধ হইত। চলিয়া তো যাইব, কিন্তু আর ফিরিয়া আসিবার সৌভাগ্য হইবে কি?

পরদিন সকালে রবীন্দ্রনাথের কাছে বিদায় গ্রহণ করিতে গেলাম। প্রণাম করিবামাত্র বলিলেন, 'এইবার বিদায়ের পালা। বেশ ছিলে, কেন যে যাও। ছুটির পরে আসবে তো? মুলু hostage রইল। আচ্ছা, তোমাদের এত খাটিয়ে নিলুম বলে কিছু মনে করো না।' নীরবেই চলিয়া আসিলাম।

কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার মান্দ্রাজ যাওয়ার খবর পাইলাম। সেখানে ভ্রমণের বিবরণ, ফিরিয়া আসার কথা, কিছু-বা লোকমুখে, কিছু-বা সংবাদপত্রের মারফত পাইতাম। অনুবাদের কাজ কিছু কলিকাতায় বসিয়াও করিয়াছিলাম। খাতাগুলি কবির কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম, তিনি মান্দ্রাজ হইতে ফিরিবার পরে। একটি ছাত্র কয়েকদিন পরে কলিকাতায় আসিয়া খবর দিল, 'গুরুদেব দুপুরে বসে বসে আপনাদের খাতা দেখেন।'

১৮ কি ১৯ অক্টোবর ১৯১৮ রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিলেন। দুপুরবেলা একবার আমাদের বাড়ি বেড়াইয়াও গেলেন। উদ্দেশ্য ছিল বাবাকে একবার বিলাত যাইতে রাজি করা। পারিবারিক কারণে বাবার তখন যাওয়া সম্ভব ছিল না। কবি রসিকতা করিয়া একবার আমার মতামত গ্রহণ করিলেন। সেদিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় বেশিক্ষণ তাঁহার কাছে বসিবার অবসর হইল না। দুই-একদিন পরেই শুনিলাম তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে একখানি চিঠিও পাইলাম। সেই অনুবাদের বই সম্পর্কেই এই সময় সাহস করিয়া তাঁহাকে কয়েকখানি চিঠি লিখিয়াছিলাম, তাঁহার নিকট হইতে উত্তরও পাইয়াছিলাম।

আবার তাঁহার বিলাতযাত্রার কথা উঠিল, নানা মুখেই খবর পাইতে লাগিলাম। মধ্যে মীরা দেবীর অসুখ হওয়ায় কবি কলিকাতায় আসিলেন, তবে ব্যস্ত ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় কয়েকদিনের মধ্যেও তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলাম না। নেপালবাবু আসিয়া একদিন খবর

দিলেন যে সম্ভবত শীঘ্রই রবীন্দ্রনাথ বিলাত যাইবেন। আবার দিন-দুই পরে অ্যান্ড্রুজ-সাহেব আসিয়া খবর দিলেন যে, কবি এখন যাইবেন না, এপ্রিল মাসে যাইবেন : ক্রমাগত মত পরিবর্তন করা রবীন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ ছিল। পিতামহ দ্বারকানাথ সম্বন্ধে 'the babu changes his mind so often' কথাটি তিনি নিজের সম্বন্ধেও প্রায়ই প্রয়োগ করিতেন। কোথাও যাওয়া-আসা সম্বন্ধে প্রায়ই ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাঁহার মত বদলাইয়া যাইত।

সাহেবের কাছে আরো শুনিলাম আমাদের শান্তিনিকেতনে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথ একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি আবার শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলাম। যাত্রাটা শুভলগ্নে হয় নাই, ট্রেনে যথেষ্টই দুর্গতি ভোগ করিতে হইল, বাড়ি পৌঁছিয়াও দেখিলাম দুর্যোগ তখনো বাকি আছে কিছু। সমস্তটা দিনই অসুস্থ শরীরে শয্যা-গ্রহণ করিয়া থাকিতে হইল।

পরদিন সকালে উঠিয়া কবির সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। দেহলীর সম্মুখের পথটিতে তিনি এক আত্মীয় যুবকের সহিত বেড়াইতেছিলেন। গিয়া প্রণাম করিতে কুশলপ্রশ্ন করিয়াই অনুযোগ করিলেন, 'তোমরা একবার গেলে আর আসতে চাও না কেন?'

দুপুরবেলা আমাদের বাড়ি বেড়াইতে আসিলেন। আমাকে দেখিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি সীতা, আর তর্জমা করবে?' আমি তো তৎক্ষণাৎ রাজি। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'বটে, এখনো শখ মেটে নি! আচ্ছা, রাখছি আবার জোগাড় করে।'

৭ই পৌষের উৎসবের আয়োজনে সকলে এই সময় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কবিকেও আর তত পাওয়া যাইত না, তবে মধ্যে মধ্যে আবার আগের মতো কাছে গিয়া বসিতে পাইতাম। দুই-একদিন কোনো কাজে বাবার কাছে আসিয়াছিলেন, যাওয়া-আসার পথেও মধ্যে মধ্যে দেখা হইত। অধ্যাপকদের কুটিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একদিন অনেকক্ষণ গল্প করিলেন। প্রভাতবাবুর বিবাহ তখনো হয় নাই। গান শুনিয়া বিবাহ করিলে কত রকম বিপদ ঘটিতে পারে সেই বিষয়ে নানারকম মন্তব্য প্রকাশ করিয়া কবি প্রস্থান করিলেন। আমাদের সান্ধ্য ক্লাসটি আবার করিবার প্রস্তাব তুলিলাম, তিনি রাজিও হইলেন, তবে ঘটনাচক্রে তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। আর-একদিন চায়ের টেবিলে বসিয়া অনেক গল্প করিলেন। গল্প করিতে বসিলে তিনি এতরকম রসিকতা করিতেন যে সারাক্ষণটাই হাসিতে হইত। আমাদের হাসিতে দেখিয়া বলিলেন, 'বয়স হয়েও প্রবীণোচিত গাম্ভীর্য এল না, কেবল যা-তা বকি, অল্পবয়সীদের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করি, লোকে আমাকে কী যে ভাবে তার ঠিক নেই।'

নূতন গান মাঝে মাঝে শুনিতে যাইতাম। উৎসব উপলক্ষে গান শিখানো হইতেছিল। এবারে আবার অতিথিরাও অনেক আগে হইতে আসিতে আরম্ভ করিলেন। সকলে তাঁহাদের লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মেয়েরা ৯ পৌষ একটা আনন্দবাজার করিবেন স্থির হইল। সকলে মহোৎসাহে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

এই সময়ে আশ্রমে একটি Danish ভদ্রমহিলা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, নাম শুনিলাম মিস্ ফেরিং। ইঁহাকে আশ্রমে কাজ করিবার জন্য অ্যান্ড্রুজ-সাহেব মান্দ্রাজ হইতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বিদেশিনী সম্বন্ধে সেকালে মনে একটা আতঙ্ক ছিল, কিন্তু পরে আলাপ করিয়া দেখিলাম মেয়েটির মধ্যে ভয় করিবার কিছু নাই। সেই রাত্রেই প্রতিমা দেবীর ঘরে বসিয়া আনন্দবাজারে কিসের কিসের দোকান হইবে তাহারই গল্প করিতেছি বেশ উচ্চকণ্ঠে, এমন সময় রবীন্দ্রনাথ আসিয়া প্রবেশ করিলেন। আমরা তৎক্ষণাৎ কথা বন্ধ করিলাম, যদিও কলরব খানিকটা তিনি শুনিতেই পাইলেন এবং সে সম্বন্ধে মন্তব্যও করিলেন। গানের ক্লাস তখন আরম্ভ হইয়াছে, সেইজন্যই তিনি নীচে নামিয়াছিলেন। আমরাও তাঁহার পিছন পিছন গিয়া গান শুনিতে বসিলাম। গান অনেক রাত পর্যন্ত হইল, তাহার পর বিদেশিনী মেয়েটিকে কোথায় কিভাবে রাখা যায় সে বিষয়েও একটু আলোচনা হইল।

৬ পৌষ সকালে কয়েকটি অভ্যাগতা মহিলার সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে অধ্যাপকদের কুটিরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সেই সময় এক দিক হইতে মিস্ ফেরিং কয়েকটি বালকবালিকার সঙ্গে এবং আর-এক দিক দিয়া স্বয়ং কবি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রবীন্দ্রনাথ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার ডেনিশ মেয়ের সঙ্গে আলাপ করেছ? শীগগির ভাবসাব করে নাও।' বলিয়াই চলিয়া গেলেন। আদেশ যখন করিয়াছেন তখন ভাব করিতেই হইবে, নিজেই নিজের পরিচয় দিয়া আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। অনেকক্ষণ গল্পস্বল্প করিয়া মেমসাহেবকে তাঁহার বাসস্থান পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলাম।

৭ই পৌষ ভোরে উঠিয়া বাহির হইয়া পড়া গেল। প্রতিমা দেবী সেদিন সমস্ত দিন-ব্যাপী নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, কাজেই সংসারের ভাবনা কিছু ছিল না। প্রচণ্ড শীত তখন, মন্দিরের পাথরের মেঝের উপর বসিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন জমিয়া গেলাম। উপাসনার আরম্ভে রবীন্দ্রনাথ একলা একটি গান গাহিলেন, পরে ছেলেরা সমবেতভাবে দুই-তিনটি গান করিল। আচার্যের কাজ কবিই করিলেন।

উপাসনা শেষ হইবার পর মেলা দেখিতে বাহির হইলাম। তখনো মেলা ভালো করিয়া বসে নাই, সব জিনিসপত্র আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। সুকেশী দেবী আমাদের আনন্দবাজার বসাইবার ভার লইয়াছিলেন, তাঁহার কাছে গিয়া দেখিলাম কলিকাতার এক দরজি একরাশ ব্লাউজ আর ফ্রক লইয়া আসিয়াছে। বসিয়া খানিকক্ষণ তাই বাছা গেল। বাড়ি ফিরিয়া আর-একবার মেলা দেখিতে গেলাম। সেখান হইতে ফিরিয়া স্নানাদি সারিয়া প্রতিমা দেবীর বাড়ি নিমন্ত্রণ খাইতে গেলাম। খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়াছি এমন সময় রবীন্দ্রনাথ নীচে নামিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন, 'মিস ফেরিং শুনতে চেয়েছিল যে আমি সকালে কি বলেছি, আমি তাকে তোমার কাছে refer করে দিয়েছি, অতএব প্রস্তুত থেকো।' এ-হেন কাজ আমার দ্বারা হইবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না, সুতরাং কথাটা শুনিয়াই ভয় পাইয়া গেলাম। সম্ভবত কথাটা আমাকে ভয় পাওয়াইবার জন্যই

তিনি বলিয়াছিলেন, কারণ সারাদিনের ভিতর মেমসাহেবের সঙ্গে আমার দেখাই হইল না। অবশ্য তাঁহাকে এড়াইয়া ফিরিবার চেষ্টা যে করি নাই, তাহাও বলিতে পারি না। দুপুরবেলা মেলায় এক যাত্রা হইতেছিল, সেইখানেই গিয়া বসিয়া রহিলাম। পালাটি 'কংসবধ'। পাড়াগাঁয়ের যাত্রা যেমন হয় তাহাই হইয়াছিল, অর্থাৎ কোনো অংশেই ভালো নয়। তবে হাসির খোরাক জুটিয়াছিল অনেক।

বিকালবেলা আশ্রমের মূর্তিই বদলাইয়া গেল। এ যেন আর-এক রাজ্য— চারি দিকে ভিড়, মশালের আলো, লোকজনের চিৎকার। একলা মন্দিরে যাইতেও সাহস হইল না, অনেকের সঙ্গে দল বাঁধিয়া গেলাম। গোলমালে উপাসনায় মন দেওয়াই দেখিলাম কঠিন। গান এ বেলা অতি সুন্দর হইয়াছিল। আচার্যদেবকে দেখাইতেছিল যেন একটি দীপ্ত অগ্নিশিখা।

উপাসনান্তে বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রের সহায়তায় বাজি পোড়ানো দেখিতে বাহির হইলাম। একবার দলচ্যুত হইয়া ভিড়ের মধ্যে হারাইয়াও গেলাম। যাহা হউক, অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার তাঁহাদের সঙ্গে জুটিলাম এবং বাজি পোড়ানো শেষ পর্যন্ত দেখিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। সারাদিনের ভিতর রবীন্দ্রনাথের নিকটে যাওয়ার সুবিধা একবারও হইল না, ভিড়ের ভিতর শুধু তাঁহাকে বার-দুই প্রণাম করিলাম। উৎসবের ভিতরেও হৃদয় কেমন যেন অপরিতৃপ্ত থাকিয়া গেল।

৮ পৌষ উপাসনা একটু বেলায় হইল। ভোরেই বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। দেহলীর সম্মুখে আসিয়াই কবির সাক্ষাৎ পাইলাম। প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ লাভ করিলাম। কাল মিস্ ফেরিংকে কিছুই বলি নাই শুনিয়া, সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের মেয়েদের তুলনায় আমরা কিরকম হীন হইয়া গেছি তাহাই সরস ভাষায় বুঝাইয়া দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

৮ই যে সভা হয় তাহাতে এইবার তিনিই সভাপতি হইলেন। আমাদের দেশের আদর্শ শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ে একটি ছোটো বক্তৃতা দিলেন। সেইদিনই সভাভঙ্গের পর, শিশুবিভাগের ঘরগুলির পিছনের মাঠে বিশ্বভারতীর ভিত্তি স্থাপিত হইল —৮ পৌষ ১৩২৫। অনেক বৈদিক আচারাদি অনুষ্ঠিত হইল। ভিত্তির জন্য যে গর্তটি কাটা হইয়াছিল, মন্ত্রপাঠাদির পরে কবি তাহার ভিতর আতপতণ্ডুল জল কুশ ফুল প্রভৃতি নিক্ষেপ করিলেন। বিভিন্ন দেশের পুরুষ ও মহিলা যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই বিশ্বমানবের প্রতিনিধি-স্বরূপ গর্তে মৃত্তিকা দিলেন।

দুপুরে স্পোর্টস ছিল, তবে আমরা সেখানে না গিয়া প্রতিমা দেবীর ঘরে বসিয়া পরের দিনের মেলার আয়োজনই করিতে লাগিলাম। বিকালে কিছু হইবে বলিয়া আগে শুনি নাই, এই সময় শুনিলাম যে সুকুমারবাবুরা কিছু আবৃত্তি ও হাসির গান প্রভৃতি করিবেন। আশ্রমের কয়েকজনও যোগ দিলেন ইহাতে। 'অদ্ভুত রামায়ণ' গান হইল। কতকগুলি কৌতুকাভিনয় প্রভৃতিও হইল। একবার মনে হইল যেন রবীন্দ্রনাথ দরজার সামনে দিয়া চলিয়া গেলেন, সন্ধ্যার অন্ধকারে ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। সব শেষ হওয়ার

পর কয়েকজন মহিলার সঙ্গে বাড়ি ফিরিয়া চলিলাম। অধ্যাপকদের বাড়ির কাছে আসিয়া প্রভাতবাবুর মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এগিয়ে দেব, না নিজেই যেতে পারবে?' আমি বলিলাম, 'এগিয়ে দেবার দরকার নেই, এমনিই বেশ যাব।' এমন সময় অন্ধকারের ভিতর রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম, বলিলেন, 'কে, সীতা? এইখানে এসো, আমি আলো দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।' অগত্যা অগ্রসর হইয়া গিয়া দেহলীর নীচে দাঁড়াইলাম। কবি সেইখানেই বসিয়াছিলেন, আমাকে দেখিয়া বলিলেন, 'আমি লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়ে সুধাকান্তর নাচ দেখে এলাম।' আলো-হাতে চাকর আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার সঙ্গে বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

৯ পৌষ সকালে আশ্রমের লোকান্তরিত অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীদের স্মরণ করিয়া উপাসনা হইল। এবারে ছাতিমতলায় না হইয়া সভা আমবাগানেই হইল। নেপালবাবু আচার্যের কাজ করিলেন ও জগদানন্দ রায় মহাশয় পরলোকগত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কিছু বলিলেন।

ইহার পর মেয়েদের 'আনন্দবাজার' খুলিল। হট্টগোল হইল প্রচুর, জনসমাগমও শান্তিনিকেতনের পক্ষে বেশ ভালো হইয়াছিল বলিতে হইবে। সন্ধ্যার সময়ই জমিল সব চেয়ে বেশি। আমরা দুই বোন এবং সুকেশী দেবী নিচুবাংলায় হেমলতা দেবীর ঘরের সামনে ব্লাউজ ফ্রক প্রভৃতির একটি দোকান খুলিয়াছিলাম। আশ্রমবাসী কয়েকজন যুবক আমাদের ক্রেতা জুটাইতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, জিনিস বিক্রি হইল মন্দ নয়। সারাদিন ঐখানেই কাটিল, মাঝে শুধু একবার বাড়ি গিয়া নাইয়া-খাইয়া আসিলাম। আমাদের পাশে মিস্ ফেরিংও একটি দোকান খুলিয়া বসিয়াছিলেন। বিকালে নিচুবাংলায় ঘেরা উঠানে শামিয়ানা টাঙাইয়া খাবারের দোকান খোলা হইল। সুকেশী দেবীর বালক-ভৃত্য লক্ষ্মণের গলায় ঝুলানো মস্ত এক প্ল্যাকার্ডে 'শীঘ্র আসুন, শীঘ্র আসুন, বউঠাকুরানীর হাটে' লিখিয়া, ছেলেটাকে আশ্রম ঘুরিতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। ছেলের দল এইবারে সদলে আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত সরবে এবং সানন্দে মেলা চলিতে লাগিল। তাহার পর যে যাহার দোকানপাট তুলিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলাম।

১০ পৌষ মন্দিরে খৃস্টোৎসব হইল। মন্দির হইতে ফিরিবার পথে শুনিলাম প্রতিমা দেবীর জ্বর হইয়াছে। তখন ইনফ্লুয়েঞ্জা শুনিলেই মনে একটা আতঙ্ক আসিত। প্রতিমা দেবীকে দেখিতে গেলাম, তিনি সংক্রামক কিছু হইয়াছে আশঙ্কা করিয়া আমাদের তাঁহার বেশি কাছে যাইতে বারণ করিলেন। বাড়ি ফিরিয়া আসিবার অল্প পরেই সুকেশী দেবী আসিলেন 'আনন্দবাজারে'র হিসাব মিলাইতে। হিসাব মিলানোও হইল, গল্পও হইল, তাহার পর তিনি চলিয়া গেলেন। সেই তাঁহাকে শেষ দেখিলাম।

হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্যস্ত হইয়া দেখিতে গেলাম কিসের টেলিগ্রাম। দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম যে উহা আমাদের নয়, রবীন্দ্রনাথকে কে একজন রুশদেশীয় ভদ্রলোক তার করিয়াছেন, পিওন ভুল করিয়া সেটা আমাদের বাড়ি পৌঁছাইয়া

দিয়া গিয়াছে। টেলিগ্রামটা আমিই দেহলীতে লইয়া গেলাম। তিনি তখন নিজের পাথরের-চৌকি পাতা কোণটিতে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। পদশব্দে মুখ তুলিয়া তাকাইলেন। টেলিগ্রাম দেখিয়া বলিলেন, 'টেলিগ্রাম যখন তোমার কাছে গিয়েছে তখন অতিথিকেও আমি সেইখানেই পাঠাব। তুমি তাকে নিয়ে যা পার' কোরো।'

বিকেলের দিকে দেখিলাম আমারো শরীরটা ভালো ঠেকিতেছে না। ভীত হইয়া গোটা-দুই influenza tabloid খাইয়া ফেলিলাম, কিন্তু জ্বর তাহাতে আটকাইল না। রাত্রেই জ্বর আসিল। সকালে থার্মোমিটারের খোঁজে বাহির হইয়া দিদি খবর লইয়া আসিলেন যে সুকেশী দেবীর জ্বর হইয়াছে ও প্রতিমা দেবীর জ্বর বাড়িয়াছে। তাহার পর দু-একদিনের ভিতরেই বড়োমা এবং মিস্ ফেরিংও জ্বরে আক্রান্ত হইলেন।

সকলেরই অসুখ বাড়িয়া চলিল। শুইয়া শুইয়াই সকলের খবর পাইতে লাগিলাম। মা কলিকাতা হইতে আসিয়া পৌঁছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আসিয়া আমাকে একবার দেখিয়া গেলেন, ঔষধও দিয়া গেলেন। তাহার পর কয়েকদিন আর আসিতে পারিলেন না। তাঁহার পরিবারস্থ রোগিণীদের অবস্থা সংকটাপন্ন হইয়া দাঁড়াইল। মেম-সাহেবটি দিন-তিন-চার জ্বর ভোগ করিয়া অল্পের উপর দিয়া উতরাইয়া গেল। আমি অবশ্য আর-কয়জনের অপেক্ষা আগেই সারিলাম, তবে বেশ কয়েকদিন রোগ ভোগ করিয়া। হেমলতা দেবী, প্রতিমা দেবী ও সুকেশী দেবীর অসুখ বাড়িয়াই চলিল, কলিকাতা হইতে নার্স ও ডাক্তার আনানো হইল। সুকেশী দেবীর পিতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই সময় আর-একদিন আমাকে দেখিতে আসিলেন। বলিলেন শীঘ্রই একবার মহীশূর-ভ্রমণে যাইবেন। তাঁহাকে সেদিন কেমন যেন বিষণ্ণ ও উদবিগ্ন দেখিলাম। শুনিলাম তাঁহার এক আত্মীয়ার কাছে বলিয়াছেন, 'মনে হচ্ছে আশ্রমে যেন মৃত্যু ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

মৃত্যুর দূত সত্যই আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। অমাবস্যার দ্বিপ্রহরে সুকেশী দেবী প্রাণত্যাগ করিলেন। আমাদের বারান্দায় বসিলে তাঁহাদের বাড়ি দেখা যাইত। সেইখান হইতেই দেখিলাম, রবীন্দ্রনাথ ও আশ্রমের অনেকে সেখানে আসিয়া সমবেত হইয়াছেন। সুকেশী দেবীর বৃদ্ধ পিতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র তৎক্ষণাৎ স্টেশনে চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যার সময় সুকেশী দেবীর শ্মশানযাত্রাও ঐখানে বসিয়াই দেখিলাম। মৃত্যুর সহিত সামনাসামনি পরিচয় তখনো হয় নাই। কয় দিন আগে পর্যন্তও যিনি আমাদের একজন ছিলেন, যাঁহার সঙ্গে হাস্য-কৌতুকে কত দিন কাটিয়াছে, অকস্মাৎ এইভাবে তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া মনে নিদারুণ একটা আঘাত পাইলাম। তাঁহার বাড়িতে সেই সময় যে কান্নার স্বর শুনিয়াছিলাম, সেই সুর যেন প্রান্তরের বায়ুতে নিরন্তর ভাসিয়া বেড়াইতেছে মনে হইত। এই সময় অজিতকুমার চক্রবর্তীর মৃত্যু-সংবাদও শুনিলাম।

রবীন্দ্রনাথ মহীশূর যাত্রা করিলেন। কয়েকদিন পরেই হেমলতা দেবী ও প্রতিমা দেবী তখন আরোগ্যের পথে চলিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য আশঙ্কা তত ছিল না। রোগে ভুগিয়া অনেকটাই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম, তবু কবির যাত্রার দিন তাঁহার দোতলার ঘরটিতে

উঠিলাম একবার দেখা করিয়া আসিতে। তিনি তখন জিনিস গুছাইতে ব্যস্ত, তবু কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলিলেন। নিজে চলিয়াছেন দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে, কিন্তু আমি কেন ঘন ঘন কলিকাতা যাই বলিয়া আমাকে একটু বকিয়া লইলেন। বলিলেন, 'আর জ্বরটর কোরো না বাপু।' কয়েকটি ছবি আঁকা কার্ড উপহারস্বরূপ দিলেন। অনেকে দেখা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন দেখিয়া আমরা তাড়াতাড়ি প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। ঘণ্টা-দুই পরে বাড়ি বসিয়াই দেখিতে পাইলাম তিনি স্টেশনে চলিয়াছেন।

সুকেশী দেবীর শ্রাদ্ধের দিন আশ্রমের একটি ছেলে আত্মহত্যা করিল। ম্যাট্রিক টেস্টে পাস করে নাই মনে করিয়াই সে এই কাণ্ড করিল। ভয়ে যেন আমার মনটা অভিভূত হইয়া গেল। মনে হইল আশ্রমের উপর কিসের যেন একটা ছায়া নামিয়া আসিতেছে। একজন সাঁওতাল চাকরও দুই-একদিনের মধ্যে রেল লাইনে পড়িয়া মরিল। উহা ইচ্ছাকৃত বলিয়াই সকলে মনে করিলেন। সকলেই যেন আতঙ্কে স্তব্ধ। কয়েকজন চাকরবাকর কাজ ছাড়িয়া ভয়ে পলাইয়া গেল। আমরা এই সময় কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম।

সংবাদপত্রেই কবির খবর মধ্যে মধ্যে পাইতাম। New India বলিয়া একটি কাগজেই তাঁহার খবর বেশি থাকিত। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের মধ্যে একবার তিনি কিছু পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন এই খবর পাইয়া বড়োই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলাম। আবার আরোগ্যের সংবাদও ঐভাবেই পাইলাম। ১৯১৯-এর মার্চ মাসের ৩ কি ৪ আমরা আবার শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গেলাম।

আসিয়া দেখিলাম দেহলী ও পিয়ার্সন সাহেবের বাংলার অধিবাসী বদল হইয়াছে, অবশ্য ঠিক সেই সময় দুইটি বাড়িই খালি। শুনিলাম কমলা দেবী এখন হইতে দেহলীতে থাকিবেন, ঘর-সংসার সেখানে পাতিয়া রাখিয়াই তিনি কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন কয়েকদিনের জন্য। রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণান্তে আসিয়া পিয়ার্সন সাহেবের বাড়ির দোতলায় থাকিবেন। আশ্রমে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন না, দিনুবাবুও ছিলেন না, সুতরাং গানটান আর শুনিতাম না। তবু দিন মন্দ কাটিত না। বসন্তের আগমনে আশ্রমে রূপ ও রঙের জোয়ার আসিয়া গিয়াছিল, পাখির ডাকে সারাদিন কর্ণ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকিত। দোলের দিন ছেলের দল রবীন্দ্রনাথের ঘরের বারান্দায় বসিয়া মহোৎসাহে গান গাহিয়া গেল—

যা ছিল কালো-ধলো তোমার রঙে রঙে রাঙা হল।
যেমন রাঙাবরণ তোমার চরণ তার সনে আর ভেদ না র'ল।

রাত্রিকালে মাঠে বা খোয়াইয়ে পূর্ণিমা-সম্মিলন হইবার কথা ছিল, কিন্তু অকস্মাৎ একটু মেঘলা করিয়া আসাতে তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। আশ্রমের গণ্ডির ভিতরই হেঁয়ালি-নাট্য, গান প্রভৃতি কিছু কিছু হইল।

কমলা দেবী ফিরিয়া আসিয়া দেহলীতে সংসার গুছাইয়া বসিলেন। রবীন্দ্রনাথের বাসভবন তখনো বন্ধ। New India-তে মস্ত মস্ত তালিকা পাইলাম— কবে তিনি কোথায় গিয়াছেন, কোথায় বক্তৃতা করিয়াছেন, কোথায় তাঁহাকে কিভাবে সংবর্ধনা করা

হইয়াছে। পড়িয়া মনটা খুশি হইত বটে, কিন্তু সবচেয়ে যে খবরটি জানিতে চাহিতাম যে কবে তিনি ফিরিয়া আসিবেন, সেই খবরটিই দেখিতাম না। শূন্য বাড়িটার দিকে চাহিয়া মন দমিয়া যাইত, বৃদ্ধ এক বাবুর্চি বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে ইহাই শুধু দেখিতে পাইতাম।

হঠাৎ একদিন কমলা দেবীর মুখে শুনিলাম যে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরিয়াছেন, ডাক্তার তাঁহাকে কিছুদিন বিশ্রাম লইতে বলিয়াছেন। কিন্তু শান্তিনিকেতনে তিনি তখনি ফিরিলেন না। কলিকাতায় নানা কাজে আটকা পড়িলেন কয়দিনের জন্য। বিচিত্রা-ভবনে ভ্রমণকাহিনী পাঠ, এম্পায়ার থিয়েটারে বক্তৃতা দেওয়া ইত্যাদি চলিতে লাগিল, আমরা দূরে বসিয়া শুনিতে লাগিলাম। কলিকাতার ভক্তবৃন্দকে ঈর্ষা যে করি নাই তাহা বলিতে পারি না।

একদিন সকালে দেখি সামনের বাড়ি ঝাড়াপোঁছার বেজায় ধুম লাগিয়া গিয়াছে। সেদিন শনিবার বোধ হয়। উপরতলায় খাট বিছানা চেয়ার টেবিল অনেককিছু তোলা হইতেছে। সন্ধ্যার সময় কবির ভৃত্য সাধুকেও দেখিতে পাইলাম, সঙ্গে তাহার গোরুর গাড়ি বোঝাই জিনিসপত্র। আশ্রমবাসিনী একজনের মুখেই শুনিলাম যে রবীন্দ্রনাথ রাত্রির ট্রেনে আসিয়া পৌঁছিবেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে এও শুনিলাম যে তিন-চারদিনের ভিতরেই তিনি আবার কলিকাতায় চলিয়া যাইবেন, সেখান হইতে কাশী যাইবেন। মনটা খুশি হইয়া উঠিতে-না-উঠিতেই আবার মুষড়াইয়া গেল।

ভোরবেলা ছেলেদের বৈতালিক গানে ঘুম ভাঙিল। গানের ভিতর উৎসাহ ও আনন্দের সুখ সুস্পষ্ট, বাহিরে আসিয়া দেখিলাম কবির শয়নকক্ষ খোলা, শয্যাও দেখা যাইতেছে, তবে তাঁহাকে ঠিক তখনি দেখিতে পাইলাম না। দিদি ও আমি বেড়াইতে বাহির হইলাম। বড়ো রাস্তায় পৌঁছিতেই তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম। তখন উপাসনায় বসিয়াছিলেন, দেখা করিতে যাইতে পারিলাম না। সকালবেলাটা লোকের ভিড়ে যাইবার পথ পাওয়া গেল না। বেলা দশটার পর আর লোকজন কেহ উপরে উঠিতেছে না দেখিয়া আমরা দেখা করিতে গেলাম। এ বাড়িটি কেমন যেন তাঁহার বাড়ি বলিয়া মনে হইতেছিল না। এ জীবনে তাঁহাকে অনেকরকম অনেক বাড়িতে থাকিতে দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহার বাড়ি বলিতে মনের মধ্যে আমার কেবল দেহলীর ছবিই ভাসিয়া উঠে। এইখানে তাঁহাকে যেমন মানাইত, এমন যেন আর কোথাও মানায় নাই।

দেখা তখনো পাওয়া গেল না। তিনি তখন কোথায় বাহির হইয়াছেন, এই খবরটা সাধুর কাছে সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

এ বাড়িটি আমাদের বাড়ির অত্যন্তই কাছে ছিল, মধ্যে একটা বড়োগোছের উঠান মাত্র। স্নানান্তে বারান্দায় বসিয়া কাগজ পড়িতেছি, দেখিলাম তিনি ছাতা হাতে করিয়া উপর হইতে নামিয়া আসিতেছেন। আমাদের বাড়িই আসিতেছেন বুঝিতে পারিলাম। উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, 'সীতা, আমি এইবার তোমাদের প্রতিবেশী হয়েছি। আমি কিন্তু ভেবেছিলুম তোমরা এখন

কলকাতায় আছ, আমার বক্তৃতাতে তোমাদের পাব। তোমার বাবা এইখানেই আছেন?'

বাবা ঘরেই ছিলেন, সেইখানে গিয়া কবি বসিলেন। দুইজনে নানাপ্রকার আলোচনা চলিতে লাগিল। আমাকে তখন গৃহকর্মে অন্যত্র যাইতে হইল।

খবর পাইলাম দুপুরবেলা তিনি আশ্রমের সকলকে কিছু বলিবেন। তাঁহার উপরের ঘরেই সভা হইল। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিলেন। তাহার পর অনেকক্ষণ অধ্যাপকদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা হইল। অনেকগুলি বই আনিয়াছিলেন, সেগুলি সকলের মধ্যে বিতরণ করিলেন। বিকাল হইয়া আসার মুখে সভা ভঙ্গ হইল।

বৈকালিক জলযোগ সারিয়া যখন বেড়াইতে বাহির হইলাম তখন দেখিলাম, দেহলীর পাশের ছোটো বাগানটিতে বসিয়া তিনি দিনুবাবু ও কমলা দেবীর সঙ্গে গল্প করিতেছেন। আমরাও সেইখানে গিয়া বসিলাম। মান্দ্রাজে যে-সব বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন তাহারই একটি সন্ধ্যার পর পড়িয়া শুনানোর কথা হইল, কিন্তু শিশুবিভাগ এই সময় আবদার ধরিয়া বসিল যে সে-সময় গুরুদেবকে তাহারা সার্কাস দেখাইবে। ছেলেদের আবদার তাঁহার কাছে কখনো উপেক্ষিত হইত না, সুতরাং সার্কাস দেখিতেই তিনি চলিলেন। সার্কাসটা আগে একবার দেখিয়াছিলাম বলিয়া আর দেখিতে গেলাম না।

তাঁহার নূতন বাড়িটা আমাদের বাড়ির খুবই কাছে ছিল, সারাক্ষণই তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইত। তবে মাত্র চারদিনের জন্য আসিয়াছেন, কাজের তাগিদ বেশি ছিল, সুতরাং তাঁহার কাছে বসিয়া গল্প করিবার অবকাশ বেশি পাওয়া যাইত না। পরদিন সন্ধ্যার সময় কমলা দেবীর সঙ্গে বেড়াইয়া ফিরিতেছি, গল্প বেশ উচ্চকণ্ঠেই হইতেছে, হঠাৎ কমলাদেবী চুপ করিয়া যাওয়াতে উপরের ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম কবি আগেরই মতো ছোটো ছাদটিতে ইজিচেয়ারে বসিয়া গুন গুন করিয়া গান গাহিতেছেন। তিনিও দেহলীর মায়া কাটাইতে পারেন নাই। সকলে উপরে গিয়া বসিলাম। কিসের টানে যে এই ছাদে আসিয়া ভাঙা চৌকিতে বসিয়া আছেন তাহাই তিনি কমলা দেবীকে বুঝাইতে লাগিলেন। তাহার পর আর-এক প্রসঙ্গ উঠিল, তাঁহার গানে ঘুরিয়া ফিরিয়া 'কমল' কথাটাই এতবার আসে কেন? দিনুবাবু নাকি আপত্তি করেন, ছেলেরা নাকি গানে ও-কথাটা থাকিলেই হাসে। কবি বলিলেন, দোষটা মেয়েদেরই তাহারাই এ কথাটা ছড়াইয়াছে।

রাত্রে তাঁহার 'শিক্ষা'-সম্বন্ধীয় একটি ইংরেজি প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইলেন। তাঁহার নূতন শয়নকক্ষেই বসিবার স্থান হইল। প্রবন্ধটি বেশ বড়ো ছিল, পাঠের পর কিছুক্ষণ আলোচনাও হইল। সুতরাং বাড়ি যখন ফিরিলাম তখন বেশ রাত, আশ্রমের ছেলেরা শুইতে চলিয়া গিয়াছে।

মঙ্গলবার দুপুরে দেখিলাম তাঁহার ঘরে অনেক লোক। কিসের সভা খোঁজ লইয়া জানিলাম যে অধ্যাপকরা তাঁহার সঙ্গে কাজের কথা বলিতেছেন। এই সভা শেষ হইতেই তিনি আসিয়া আমাদের বাড়ি উপস্থিত হইলেন। বাবার সঙ্গে নানাপ্রকার

সামাজিক ও রাজনৈতিক আলোচনা চলিতে লাগিল। আর কেহ সেখানে না যাওয়ায় আমিও সংকোচবশত গেলাম না, পাশের ঘরেই বসিয়া শুনিতে লাগিলাম। বিকালে আবার দেখিলাম তিনি দেহলীর ছাদে গিয়া বসিয়াছেন। এইখানে তাঁহাকে দেখিলেই বুঝিতাম এখন অবাধে যাওয়া যায়। আমরা গিয়া বসিবার কিছু পরেই Folk Religion in India নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া শুনাইলেন। শ্রোতা অনেকেই জুটিলেন, তবে সকলে যে প্রবন্ধটি বুঝিতে পারিতেছেন না তাহা দেখিতেই পাইলাম।

তাহার পর দিন বুধবার। মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ উপাসনা করিলেন। উপাসনান্তে তাঁহার চারি দিকে ভিড় দেখিয়া বুঝিলাম এখন কাছে যাইবার সুবিধা হইবে না, বাড়ি চলিয়া আসিলাম।

খাওয়া-দাওয়ার পর একটি ছোটো মেয়ে আসিয়া খবর দিল যে এখনি কবির ঘরে প্রবন্ধ-পাঠ হইবে। আমরা যথারীতি গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম মেয়েরা বিশেষ কেহ আসেন নাই; রবীন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধটি পড়িয়া শুনাইলেন সেটির নাম Message of the Forest. পাঠান্তে কিছু আলোচনাও হইল। সান্ধ্যভ্রমণের পর সেদিনও তাঁহাকে কিছুক্ষণের জন্য সেই ছোটো ছাদটিতে পাওয়া গেল। আমাদের ডাকিয়া বলিলেন, 'এসো এসো, তোমাদের সঙ্গে একটু গল্প করা যাক।' নিজে মাটিতে বসিয়াছিলেন, শতরঞ্চির উপর ভাঙা ইজিচেয়ারটা দেখাইয়া আমাকে বলিলেন, 'তুমিই না-হয় চেয়ারে বোসো।' আমরা হাসিয়া সকলেই শতরঞ্চিটির আশেপাশে বসিলাম। সংখ্যায় তিনজন ছিলাম। কবির হাতে কয়েকটি শিরীষ ফুল দেখিলাম, সেগুলি আমাদের দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, 'এই দেখো ঠিক তিনটি আছে, তোমরাও ঠিক তিনজন আছ, ইচ্ছে করো তো প্রত্যেকে এক-একটি নিয়ে মাথায় গুঁজতে পারো।' ফুল তখনি গ্রহণ করিলাম, তবে মাথায় গোঁজা তখনি হইয়া উঠিল না। আজ আবার বড়ো ছেলেরা তাঁহাকে সার্কাস দেখাইবে স্থির করিয়াছিল, সুতরাং খুব বেশিক্ষণ গল্প করা গেল না। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই সার্কাস দেখিতে গেলাম। সার্কাস ভালোই হইল ছেলেদের পক্ষে।

বৃহস্পতিবারে তাঁহার আবার যাত্রা করিবার কথা। কলিকাতায় একদিন থাকিয়া, বক্তৃতা দিয়া, তিনি কাশী যাইবেন শুনিলাম। সকাল হইতে তাঁহার ঘরে লোকের ভিড়, একবার যে গিয়া বিদায় লইয়া আসিব, প্রণাম করিয়া আসিব, তাহার সুযোগই পাইতেছিলাম না। অবশেষে গেলাম যখন তখন বেলা দুইটা প্রায়। দেখিলাম শয়নকক্ষের পাশের বারান্দায় বসিয়া আছেন। কাছে গিয়া দেখিলাম, শুধু শুধু বসিয়া নাই, নিজের কাগজপত্র গুছাইতেছেন। চারি দিকে ছেঁড়া চিঠিপত্র, কাগজ, কত কি ছড়ানো। তাহার ভিতর তাঁহার হস্তাক্ষর অনেকগুলির গায়ে। ইহা তো চাকর কিছুক্ষণ পরে ঝাঁট দিয়া ফেলিয়া দিবে মনে করিয়া বড়োই কষ্ট বোধ করিলাম। তিনি সেইখানেই বসিয়া আছেন, সংকোচবশত সেগুলি আর কুড়াইয়া লইতে পারিলাম না।

রবীন্দ্রনাথ কাশী গিয়া কি কি করিবেন তাহার কিছু আভাস দিলেন। বলিলেন, অমনি আগ্রা-দিল্লিও ঘুরিয়া আসিতে পারেন। শুনিলাম আগ্রায় তাঁহার ডাক পড়িয়াছে এক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে, তাঁহার নাম শিবপ্রসাদ বোধ হয়। তিনি এক মহা ধনী শিষ্যের নিকট হইতে যমুনাতটবর্তী বিশাল বাড়ি, হিমালয়ের বিশ্রামভূমি প্রভৃতি লাভ করিয়াছেন। 'শান্তিনিবাস' কিংবা 'শান্তিভবন' নাম দিয়া একটা আশ্রমও সেখানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তবে নিজের শক্তির উপর তাঁহার আস্থা নাই, তাই কবিকে ডাক দিয়াছেন জিনিসটির ভিত্তি যাহাতে সুদৃঢ় হয় তাহারই ব্যবস্থা করিবার জন্য। রবীন্দ্রনাথের যাইবার ইচ্ছা কিছু আছে জানাইয়া দিলেন ; বলিলেন, 'যদি যাই তা হলে দখল করতে পারি, এ আমি বলে রাখছি।' সে বিষয়ে তো কাহারো সন্দেহ ছিল না। আবার বলিলেন, 'বাড়িঘরগুলোর বর্ণনা শুনে তো লোভ হচ্ছে, গিয়ে দেখলে হয়। সুবিধে হয় তো সবসুদ্ধ সেখানে উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু তোমরা অতদূর যেতে রাজি হবে কি না বলো।' আমি বলিলাম, 'আমরা গিয়েই বা কি করব?' কবি বলিলেন, 'তবু চার পাশ ঘিরে থাকলে ভালো। কেবল হিন্দুস্থানী দেখে দেখে প্রাণ যে হু-হু করবে।'

আবার বীরভূমের ভাষার সুর, নিরক্ষর চাষাভুষাদের মধ্যে তাঁহার গানের প্রচলন প্রভৃতি লইয়া খানিকক্ষণ কথা বলিলেন। এই সময় সন্তোষবাবু আসাতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে নিজের ঘরবাড়ি ও জিনিসপত্রের চার্জ বুঝাইতে বসিলেন। বাড়িটিতে উই আর ইঁদুরের বিষম উৎপাত। কবি বলিলেন, 'কেউ এগুলো রোজ দেখলে ভালো হয়। কোনো ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা যদি এখান থেকে সব ভার নেন তা হলেই ভালো।' সন্তোষবাবু আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'আপনারাই ভার নিন-না?' রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'দেখো সীতা, থাকবে কি না। আমার জিনিসপত্র হারালে কিন্তু আমি তোমাকে দায়ী করব, আমি সন্দিগ্ধ প্রকৃতির লোক।' আবার তখনি সুর বদলাইয়া বলিলেন, 'থাকো-না বেশ বাড়িটা জুড়ে।'

আমার লোভ যে কিছু হয় নাই তাহা নহে, তবে প্রাণে ভরসা আসিল না। তিনি জিনিস হারাইলে দায়ী করুন বা নাই করুন, দায়িত্বটা গুরুভার তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় ছিল না। আমি হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলাম দেখিয়া কবি বলিলেন, 'ওদের থাকবার মতলব নেই, দেখছ না কিরকম হাসছে? তুমি অন্য চেষ্টা দেখো।' অন্য চেষ্টাই বোধ হয় শেষ অবধি দেখা হইয়াছিল, কারণ কবি চলিয়া যাইবার পর রোজ রাত্রে দেখিতাম কে একজন লন্ঠন জ্বালাইয়া উপরের বারান্দায় বসিয়া থাকে।

ইহার মধ্যে একবার মা ও বাবা আসিয়া দেখা করিয়া বিদায় লইয়া গেলেন। তাঁহারা চলিয়া যাইবার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি ১ বৈশাখের আগে আসবেন তো?' কবি বলিলেন, 'নিশ্চয়, ওটাই হচ্ছে সীমা, ওর আগে সেরে ফেলতে হবে। বিধাতা যখন প্রথম আমাকে পথে বেরোবার ডাক দেন তখন তো বলেন না যে অনেকদূরে যেতে হবে, বলেন, "এই কাছেই", ভাবেন তা না হলে ভয় পাবে। কিন্তু একবার বেরোলে আর থামতে পারি না, ঘুরতেই থাকি, শেষে একবার একটা ভাঙাচোরা অবস্থায় এসে ঠেকতে হয়।'

দেখা করিবার জন্য উপরে নীচে আরো অনেক লোক অপেক্ষা করিতেছেন দেখিয়া, আর বেশিক্ষণ না বসিয়া, প্রণাম করিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম। বিকালবেলা তিনি যখন স্টেশনে যাইবার জন্য বাহির হইলেন তখন আর ভিড়ের মধ্যে গিয়া ভিড় না বাড়াইয়া নিজেদের বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাঁহার যাত্রা দেখা গেল। সঙ্গে গেলেন দিনুবাবু এবং অ্যান্ড্রুজ সাহেব।

১৯১৯-এর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। আসিবার কয়েকদিন আগে হইতেই বাড়ি ঝাড়াপোঁছা চলিতেছে দেখিলাম, পরে টেলিগ্রামও আসিল। বিকালের ট্রেনেই আসিলেন, বাড়ি আসিয়াই তাঁহার আগমন দেখিতে পাইলাম। কিছুক্ষণ পরেই দেখি তিনি দিনুবাবুর গানের ক্লাসে আসিয়া বসিয়া আছেন। দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তি তাঁহাকে একেবারেই কাবু করে নাই। অথচ শরীর তাঁহার তখন অসুস্থই। পরদিন বুধবার, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে আচার্যের কাজ করিলেন না, শুনিলাম কিছু অসুস্থ আছেন। সকালে যখন চা খাইতে বসিলেন তখন উপরের বারান্দার দিকে চাহিয়া দেখিলাম ভিড় বিশেষ নাই, শুধু অ্যান্ড্রুজ সাহেব ও আরো একজন। দেখা করিতে গেলাম। প্রণাম করিয়াই চলিয়া আসিলাম, কারণ দেখিলাম তাঁহারা নানারকম কাজের কথায় ব্যস্ত।

ঘণ্টাখানিক পর আমাদের বাড়ি আসিলেন। কাশী ও অন্যান্য জায়গা ভ্রমণের অনেক গল্প হইল। কাশীতে বড়ো ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল, বলিলেন, 'ঘুরতে ঘুরতে হয়রান হয়ে গিয়েছি। রোজ নিমন্ত্রণ, কেউ তো আর সকলের সঙ্গে একসঙ্গে ডাকবে না, প্রত্যেকেই বলে, "আজ কেবল আমার বাড়ি আসবেন, এইখানে খাবেন গাইবেন" ইত্যাদি। তার উপর রানু আছেন, তাঁর বাড়ি যেতে হবে। সবাই বলে, "না যদি আসেন তা হলে আমাদের ভয়ানক দুঃখ হবে।" ভাবতুম, ঐ তো তোমাদের অস্ত্র! দুঃখ, কাজেই যেতে হত, দুঃখ তো দিতে পারি না।'

খানিক পরেই তাঁহার চাকর সাধু সকালের ডাক আনিয়া উপস্থিত করিল, তিনি তখন উঠিয়া গেলেন। বারান্দায় দাঁড়াইয়াই বাবাকে গান্ধীজির লেখা একখানি চিঠি পড়িয়া শুনাইলেন। তাঁহার নিজের সম্বন্ধে চিঠিতে যেখানে কোনো কথা ছিল, সেই জায়গাগুলি তাড়াতাড়ি এমনভাবে পড়িতেছিলেন যে, আমি হাস্য সংবরণ করিতে না পারিয়া ঘরে ঢুকিয়া গেলাম। চিঠি পড়া শেষ হইতেই চলিয়া গেলেন।

এবারেও সারাক্ষণ এত লোকের ভিড় যে দুদণ্ড তাঁহার কাছে গিয়া বসিবার অবকাশ পাওয়া যাইত না। পাশের বাড়ি, যাইলেই যাইতে পারি, কিন্তু ভয় হইত পাছে তাঁহার কাজের ব্যাঘাত জন্মাই। ভিড় যাঁহারা করিতেন সকলেই যে কিছু কাজে আসিতেন তাহা নয়, তবে কাজের ভান একটা থাকিত। দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার কন্যা একদিন বলিলেন, 'এক বাড়িতে থাকি বটে, কিন্তু সারাদিনের মধ্যে বাবার সঙ্গে আমার দেখা হয় না, সারাক্ষণ লোক ঘিরে বসে থাকে।' সত্যই এবার লোকের ভিড়টা একটু অসাধারণ দেখিতাম।

বৃহস্পতিবারে কোথা হইতে এক পালোয়ান আসিয়া জুটিল। সে কানে বাঁধিয়া দু-মণ ভার তোলা, প্রভৃতি অনেক আশ্চর্য জিনিস দেখাইয়া গেল। সন্ধ্যাবেলাটা তাহার

খেলা দেখিতেই কাটিয়া গেল। অ্যান্ড্রুজ সাহেব একবার কবিকে ডাকিয়া আনিলেন, তবে তিনি পালোয়ানের পালোয়ানির দিকে বেশি মনোযোগ দিলেন না। দেহলীর সামনের সেই বাঁধানো চাতালটির কাছে দাঁড়াইয়া সমবেত কয়জনের সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলেন। আমরা রোদ পড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। বাড়ি ফেরার পথে দিদি বলিলেন যে বাবা একখানা চিঠি দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথকে দিবার জন্য। শুনিলাম কবি তখন উপরে আছেন। দুই বোনে উপরে উঠিলাম। তখন তিনি খাইতে বসিয়াছেন, কাছে বসিয়া অ্যান্ড্রুজ সাহেব এবং মীরা দেবী। চিঠি দিয়া চলিয়া আসিতেছিলাম, রবীন্দ্রনাথ চিঠি হইতে মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিলেন, 'বোসো।' বসিবার চেয়ার একখানা কম পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ চেয়ার না আনার জন্য সাধু প্রচণ্ড এক ধমক খাইল। ইহাতে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া পড়িতে হইল, যদিও দোষটা আমাদের ছিল না। এই জিনিসটি তিনি একেবারে সহ্য করিতে পারেন না, তাহা আগে এবং পরে অনেকবার দেখিয়াছি। অসুস্থতার জন্য মনটাও সেদিন বোধ হয় ভালো ছিল না, অন্য দিনের মতো সরস কথাবার্তা কিছু হইল না। নীরবে খাওয়া শেষ করিতে লাগিলেন। সাহেব ক্রমাগতই কথা বলিয়া চলিয়াছেন, তিনি মধ্যে মধ্যে সংক্ষেপে উত্তর দিতেছেন। একবার আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'সীতা, নূতন গান-টান কিছু শিখলে?' আমি বলিলাম, 'শিখেছি কয়েকটা।' বলিলেন, 'তোমার গান শিখে কোনো লাভ আছে? কখনো গাও? যার গান তাকেই কখনো শোনালে না, এমনি তুমি অকৃতজ্ঞ।' তাঁহার খাওয়া শেষ হইতেই চলিয়া আসিলাম।

দিন-দুই পরে গান্ধীজির চিঠির কি উত্তর দিয়াছেন তাহাই বাবাকে শুনাইবার জন্য কবি আমাদের বাড়ি আসিলেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, 'সীতা, তোমাকে দিয়ে খানিক copying করিয়ে নেব কি না ভাবছি। পারবে?' বলিলাম, 'তা পারব নিশ্চয়।' লেখাটা আমায় দিয়া, বসিয়া বাবার সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলেন, তবে যাইবার সময় আবার সেটা সংশোধন করিবার জন্য চাহিয়া লইয়া গেলেন। বিকালে সেটার সন্ধানে তাঁহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি তখনো বসিয়া লিখিতেছেন, আমাকে দেখিয়া বলিলেন, 'লেখাটা আমি ভুল করে নিয়েই চলে এসেছিলাম। যাক, সাহেব আজ রাত্রে কলকাতা যাচ্ছে, সে-ই সব যেখানে যা দেবার দিয়ে দেবে। তোমায় আর পরিশ্রম করতে হল না।' পরিশ্রম না করিতে হওয়ায় বিন্দুমাত্রও খুশি হইলাম না। অ্যান্ড্রুজ সাহেবের উপর রীতিমতো রাগ হইল, তিনি কি আর কলিকাতা যাইবার দিন খুঁজিয়া পাইলেন না?

এই সময় দুই-তিনজন উপরি উপরি তিনি কেমন আছেন জানিতে চাওয়ায় কৃত্রিম ক্রোধ দেখাইয়া বলিলেন, 'যাও, আমি বলব না।' আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'তোমার উচিত অন্যদের বলে দেওয়া, আগে তো তোমরা শুনেছ।' আরো কয়েকজন আসিয়া বসিলেন, এবং ঘণ্টাখানিক নানা বিষয়ে কথাবার্তা শুনিয়া চলিয়া আসিলাম। রবীন্দ্রনাথের শরীর এ সময়টা বেশ অসুস্থই দেখিতাম। অমন যে অসাধারণ কাজ করিবার শক্তি তাহাও যেন কিছু নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। সকলে বলিত, দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের

সময় যে ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়াছিল তাহার পরে একেবারে বিশ্রাম না করিয়া তিনি ক্রমাগত ঘুরিয়াছেন, তাই শরীর অতটা ভাঙিয়াছে। তবু এখনো চুপ করিয়া থাকিতে চাহিতেন না। এক-একদিন বাধ্য হইয়া শুইয়া পড়িতেন, পরদিন হয়তো উঠিয়াই ক্লাস পড়াইতে চলিয়া গেলেন, নয়তো কাগজপত্র টানিয়া লিখিতে বসিয়া গেলেন।

১৩২৫ শেষ হইল রবিবার দিন। মন্দিরে বর্ষশেষের উপাসনা কে করিবে তাহারই আলোচনা চলিতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথ করিতে পারিবেন না ইহা সকলে ধরিয়াই লইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তিনি জানাইলেন যে আচার্যের কাজ তিনিই করিবেন, অন্য কোনো ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন নাই।

কলিকাতা হইতে কয়েকজন অতিথি আসিয়াছেন শুনিলাম। বাড়ি ফিরিবার পথে কালিদাসবাবু এবং প্রশান্তচন্দ্রকে দেখিতে পাইলাম। মন্দিরে যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইতে গেলাম। আগাগোড়া সাদা গরদের পোশাক পরিয়া কবি আসিয়া আচার্যের আসন গ্রহণ করিলেন ; অসুস্থতা তাঁহার চেহারায় ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিলাম, কিন্তু কোনো কাজ তিনি সংক্ষেপে সারিলেন না। সবই যথারীতি হইল। আসন ত্যাগ করিয়া উঠিবার সময় মনে হইল যেন তাঁহার কষ্ট হইতেছে। ছেলেরা প্রণাম করিবার জন্য চারি দিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল, সেখানেই তাঁহাকে প্রায় আধ ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। মন্দির হইতে ফিরিবার পথে তাঁহাকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া প্রণাম করিলাম। কথা বলিবার জন্য দাঁড়াইলেন না, পৃষ্ঠে মৃদু করাঘাত করিয়া চলিয়া গেলেন।

আমরা নীচে মীরা দেবীর কাছে বসিয়া খানিকক্ষণ গল্প করিলাম। সিঁড়ি বাহিয়া ক্রমাগত তখন প্রণামার্থীর দল উঠিতেছেন ও নামিতেছেন।

নববর্ষের দিন ভোর হইবার আগেই বৈতালিক গানে ঘুম ভাঙিয়া গেল। বাহিরে তখনো ঝাপসা অন্ধকার, সূর্য উঠিতে অনেক দেরি। কিন্তু অনতিবিলম্বেই মন্দিরের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি গিয়া উপস্থিত হইলাম। মনে হইল, বাহিরের লোক যেন অনেক আসিয়াছেন, কিন্তু বিশেষ কাহাকেও চিনিলাম না।

উপাসনান্তে রবীন্দ্রনাথকে আজো ফিরিবার পথেই প্রণাম করিয়া তাঁহার আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া ফিরিলাম।

সন্ধ্যার সময় তাঁহার উপরের বারান্দায় একটি সভা বসিল। রবীন্দ্রনাথ ছোটো একটি বক্তৃতা দিলেন। আশ্রমবাসীদের জীবনে আশ্রমের আদর্শ রক্ষা করার বিষয়েই বলিলেন। তাঁহার বক্তৃতার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোচনা চলিল।

মঙ্গলবার, অর্থাৎ ২ বৈশাখের দিন, ছেলেরা এক ফাঁকির প্রত্নতত্ত্বাগার তৈয়ারি করিল। আশ্রমের সকলেই দেখিতে গেলাম। সেই বিচিত্র সঞ্চয়ের মধ্যে, নিজের পৌরাণিক নামের খাতিরে, আমিও স্থান পাইয়াছি দেখিলাম। একটা কাগজে খানিকটা ধুলা, তাহাতে লেখা, 'সীতা দেবীর চরণরেণু'। মেলা দেখিয়া যখন ফিরিতেছি তখন দেখি রবীন্দ্রনাথ সেখান হইতে ফিরিয়া চলিয়াছেন। আমার দিকে চাহিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সীতা, ওখানে তোমার চরণরেণু দেখে এলাম, সত্যি দিয়েছিলে, না ফাঁকি?'

বুধবারে নিয়মমতো মন্দিরে উপাসনা হইল। শারীরিক অসুস্থতাকে উপেক্ষা করিয়া কবিই আচার্যের কাজ করিলেন।

ইহার চার-পাঁচদিন পরেই আমরা কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। যত দূর বুঝিলাম শান্তিনিকেতনে বাসের পর্ব শেষই হইল। মায়ের শরীর দারুণ অসুস্থ, তাঁহাকে আর কলিকাতায় একলা রাখা চলে না। জিনিসপত্র সবই গুছাইয়া লইয়া, সংসার একরকম তুলিয়া ফেলিয়াই আমরা যাত্রা করিলাম। বাড়িটা তখনকার মতো থাকিল, যদি আবার ফিরিয়া আসা হয়।

রবিবার দিনটা জিনিস গুছাইতে আর সকলের নিকটে বিদায় লইতেই কাটিয়া গেল। শান্তিনিকেতন ছাড়িয়া আসিতে মনে যে নিদারুণ বেদনা অনুভব করিয়াছিলাম তাহা এখনো ভুলি নাই। নারীজন্মে বিধাতা অনেক ঘরে ঘুরাইয়া ফিরেন, অনেক পরকে আপন ও আপনারকে পর করান। কিন্তু কখনো কোনো ঘর ছাড়িতে এত ব্যথা পাই নাই। মনে হইতে লাগিল যে শিকড়-সুদ্ধ কে আমাকে জন্মভূমি হইতে টানিয়া ছিঁড়িয়া লইতেছে, যন্ত্রণায় মন বিকল হইয়া গেল।

মীরা দেবী অসুস্থ ছিলেন, তাঁহাকে একবার গিয়া দেখিয়া আসিলাম। তাহার পর উপরে গেলাম রবীন্দ্রনাথের কাছে বিদায় লইবার জন্য। কাছে গিয়া প্রণাম করিয়া বলিলাম, 'কালকে কলকাতা যাচ্ছি। চোখের জলটা অনেক কষ্টে সংবরণ করিয়া রাখিলাম। তিনি মুখ তুলিয়া তাকাইলেন, বলিলেন, 'কলকাতা যাচ্ছ? বাড়িঘর সবসুদ্ধ উঠিয়ে নিয়ে যাও-না, কেন আর এ যন্ত্রণা।' নিজের পাশের কতকগুলো কি জিনিস ঠেলিয়া সরাইয়া জায়গা করিয়া বলিলেন, 'বোসো, বোসো।'

অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলিলেন। নিজেও গরমের মধ্যে একবার হয়তো কলিকাতা যাইবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন, সেখানে শ্রীযুক্তা অবলা বসু তাঁহাকে নারীশিক্ষা-সমিতির সভাপতি করিয়াছেন। আমাকে বলিলেন, 'ছুটির সময় এখানে যদি থাকতে, তা হলে তোমাকে দিয়ে খানিক খাটিয়ে নিতাম। ভাবছি তর্জমাটা fifth sixth class-এও চালাবো।' বলিলাম, 'কলকাতায় আমায় আপনি কাজ পাঠিয়ে দেবেন, আমি করে দেব।' কবি বলিলেন, 'আচ্ছা দেখি।'

নিজের লেখার কি একটা প্রসঙ্গ ওঠাতে বলিলেন, 'আমার লেখা আমি সব ভুলে গিয়েছি, আমাকে "নৌকাডুবি" সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেই তা বুঝতে পারবে।'

ঘুরিয়া ফিরিয়া কলিকাতা যাওয়ার কথাটাই কেবল উঠিতে লাগিল। একবার বলিলেন, 'চললে তো সব, একটা মানুষ যে এখানে পড়ে রইল তা একটুও কি দয়ামায়া নেই?' কি আর করি, বলিলাম, 'আমার থাকবার উপায় থাকলে কি আর থাকতাম না?' সত্যই যদি থাকিয়া যাইবার উপায় তখন কিছু পাইতাম তো থাকিয়াই যাইতাম। বলিলাম, 'আমাকে এখানে কিছু কাজ দিন-না?' তিনি বেশ উৎসাহিত হইয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'নেবে কাজ? বেশ তো। আমি তো প্রায়ই ভাবি যে কেন তোমরা কিছু কাজ নিচ্ছ না।' আমি বলিলাম, 'অবশ্য আমি যা করতে পারি এমন কাজ।' রবীন্দ্রনাথ বলিলেন,

'পারবে না কেন? আগে তুমি দেখোই-না কিরকম করে পড়াতে হয়। ছোটো ছোটো ছেলেগুলোর সাইকলজি বেশ মজার জিনিস।'

আর কয়েকজন আসিয়া জুটিলেন বিদায় লইবার জন্য, ছুটিতে অনেকেই অনেক জায়গায় যাইতেছেন, তাঁহারাও কথা বলিতে উৎসুক। সারাক্ষণ স্বার্থপরের মতো জায়গা জুড়িয়া বসিয়া থাকা চলে না, সুতরাং উঠিয়া পড়িলাম। প্রণাম করিতেই, মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, 'কাল সকালে যাচ্ছ তো? আবার দেখা হবে।'

পরদিন যাত্রার হুড়াহুড়িতেই কাটিয়া গেল। ঠানদি খাইতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কাজেই রান্নাবান্নার হাঙ্গামাটা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ কথা রক্ষা করিলেন, নিজেই আসিয়া একবার দেখা দিয়া গেলেন। অল্পক্ষণ থাকিয়া দুই-একটি কথা বলিয়াই তিনিও চলিয়া গেলেন। দুই বৎসর তাঁহার কাছে ছিলাম। এমনভাবে হঠাৎ চলিয়া আসাটা তাঁহারো মনে বোধ হয় আঘাত দিয়াছিল। অন্যদিনের মতো প্রসন্ন মুখ দেখিলাম না। যখন গাড়িতে উঠিলাম দেখিলাম উপরের বারান্দায় বসিয়া আছেন, নীচে নামিলেন না। আমিও আর উপরে গেলাম না, সেইখান হইতেই মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম জানাইয়া বিদায় হইয়া আসিলাম।

কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার খবর সব সময়ই পাইতাম। বাবাকে চিঠিপত্র লিখিতেন, শান্তিনিকেতন হইতেও কেহ-না-কেহ প্রায়ই কলিকাতায় আসিতেন। একদিন প্রভাতবাবুর মুখে শুনিলাম মীরা দেবীর অসুখ খুব বাড়িয়াছে, তাঁহাকে কলিকাতায় আনা হইতেছে। হয়তো রবীন্দ্রনাথও আসিতে পারেন দুই-চারিদিনের মধ্যে।

ইহারই মধ্যে তাঁহার হাতে লেখা একখানি চিঠি আসিয়া পৌঁছিল দুই বোনের নামে। উপরে লেখা শ্রীমতী সংযুক্তা দেবী। খুলিয়া দেখিলাম, বেশ বড়ো একটি কবিতা, কাগজখানি ভাঁজ করিয়া তাহার উপরে লিখিয়াছেন 'প্রবাসীর জন্য প্রান্তরবাসীর উপহার।' কবিতাটির প্রথম ছত্র, 'এই বুঝি মোর ভোরের তারা এলো সাঁঝের তারার বেশে।'

বাবার কাছেও একখানা পোস্টকার্ড আসিয়াছে দেখিলাম। নানা কথার মধ্যে তাঁহার নিজের জন্মদিন কেমন হইল সে খবর আছে, সর্বশেষে লিখিয়াছেন, 'সংযুক্তাকে আমার সংযুক্ত আশীর্বাদ জানাবেন।'

ইহার কয়দিন পরেই মীরা দেবীর অসুখ বাড়াতে কবি কলিকাতায় আসিলেন। প্রভাতবাবুর বিবাহও হইল এই সময়। একবার মনে আশা হইল যে, হয়তো বিবাহ-সভায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হইবেন, কিন্তু কন্যার পীড়ার জন্যই বোধ হয় তিনি আসিতে পারিলেন না। বাবা এই সময় কিছু অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। বৃহস্পতিবার সকালে মন্দিরপ্রাঙ্গণে নূতন বর-কনের ছবি তোলা হইতেছে, দাঁড়াইয়া দেখিতেছি, এমন সময় রাস্তায় গাড়ি থামার শব্দে সেদিকে চাহিয়া দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ ও অ্যান্ড্রুজ সাহেব গাড়ি হইতে নামিতেছেন। তাড়াতাড়ি তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতে ছুটিলাম। তাঁহারা দোতলায় বাবার ঘরেই আসিয়া বসিলেন। মীরা দেবী কিছু ভালো আছেন শুনিলাম। তিনি স্বয়ং কেমন আছেন জিজ্ঞাসা

করাতে বলিলেন, 'যেরকম চারি দিক উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, ভিতরে ভিতরে পুড়ে পুড়ে কি করে আর ভালো থাকব?' আমাদের কি একখানা শিশুপাঠ্য বই তখন বাহির হইয়াছে, তাঁহার কাছে একখানা গিয়াছিল। সেটার উল্লেখ করিয়া বললেন, 'সে আমার চেয়েও যোগ্যতর সমালোচকের হাতে পড়েছে। নীতু পড়ে বলিলেন, "এর ভিতর কিন্তু অনেক মজা আছে, সীতামাসি বেশ মজা করে লিখেছে"।' অল্পক্ষণ পরেই তিনি চলিয়া গেলেন।

এই সময়ে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ Knighthood ত্যাগ করিয়া বড়োলাটকে পত্র লিখিলেন। কাগজে কাগজে তাহা লইয়া প্রচুর লেখালেখি চলিল। এই চিঠিখানি সম্বন্ধে বাবার সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য তিনি ২ জুন একবার এবং ৪ জুন আর-একবার আমাদের বাড়ি আসিলেন। সারাক্ষণই রাজনৈতিক আলোচনা চলিত, তাহার ভিতর তখন কিছু রস পাইতাম না। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিতাম, পাশের ঘরে বসিয়াই তাঁহাদের কথাবার্তা কিছু কিছু কানে যাইত। দেশী এক সংবাদপত্র তাঁহাকে ঐ পত্র লেখার ফল হইতে বাঁচাইবার জন্য কি একটা বোকামিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিল, তাহা পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া আসিয়াছিলেন। শুনিলাম বাবাকে বলিতেছেন, 'আমাকে এমন অপমান কেউ কখনো করে নি।'

মীরা দেবীকে দেখিতে একদিন জোড়াসাঁকো গেলাম। ইহার আগে যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু মা তখন এত অসুস্থ ছিলেন যে তাঁহাকে ফেলিয়া কোথাও যাওয়া একটু শক্ত ছিল। বাড়ির সিঁড়িতে পা দিয়াই সাধুচরণের দর্শন পাইলাম। সে আমাদের দোতলার বসিবার ঘরে লইয়া গেল। সেখানে কবি বসিয়া আছেন দেখিলাম, তবে ঘরে আরো অনেক লোক দেখিয়া তখন সেখানে না বসিয়া মীরা দেবীর সন্ধানেই গেলাম। তাঁহার শয়ন কক্ষে বসিয়াই কিছুক্ষণ গল্প করা গেল, জলযোগও একপালা হইল। প্রতিমা দেবী বাহিরে গিয়াছিলেন, এই সময় ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর নীচে নামিলাম। বসিবার ঘরে তখনো মানুষের ভিড়, তবু ঢুকিয়া রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করিয়া আসিলাম। তিনি সেইখানেই বসিতে বলিলেন, কিন্তু অত লোকের ভিতর বসিতে ইচ্ছা করিল না, দুই-চার মিনিট দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই কথা বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

১১ জুন বিচিত্রা সম্মিলনীর অধিবেশন উপলক্ষে আবার জোড়াসাঁকো গেলাম। লোক তখনো বেশি আসে নাই, মহিলা তো তিনজন মাত্র। রবীন্দ্রনাথ সেইখানেই বসিয়া জনকয়েক ভদ্রলোকের সহিত কথাবার্তা বলিতেছেন। আমরা কাছে গিয়া বসিতে খবর দিলেন যে সামনের সোমবার তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া যাইতেছেন।

প্রথমে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একটি কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন। সেটি কবির উপাধিত্যাগ উপলক্ষে রচিত। তাহার পর রবীন্দ্রনাথ নিজে কতকগুলি গদ্য-কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন। এই ধরনের লেখা তখন সবে আরম্ভ করিয়াছেন; শ্রোতাদের কেমন লাগিল তাহা বোধ হয় জানিতে কিছু উৎসুক ছিলেন। অনেকেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলেন। আমাকে সুদ্ধ একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি সীতা, কেমন লাগল?'

তাহার পর ছন্দ সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনা চলিল, সর্বশেষে গান। এক-একটা গানই দুই-তিনবার করিয়া তাঁহাকে গাহিতে হইল, কারণ কয়েকজন যুবক সেগুলি শিখিতে বড়োই ব্যগ্র হইয়াছিলেন। অবশেষে কবি ক্লান্ত হইয়া হাল ছাড়িয়া দেওয়াতে সভা ভঙ্গ হইল। মীরা দেবীদের সঙ্গে দেখা করিয়া কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিলাম।

শান্তিনিকেতনে আর ফিরিয়া যাইতে পারিব না তাহা বুঝিতেই পারিয়াছিলাম। ইহার জন্য যে বেদনা তাহা মন হইতে কিছুতেই ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিতেছিলাম না। দিন কাটানোর একটা অবলম্বন হইবে আশা করিয়া এই সময় ব্রাহ্ম বালিকা-শিক্ষালয়ে একটি কাজ নিলাম। এইখানে তিন বৎসর কাজ করিয়াছিলাম। গ্রীষ্মের ছুটির পর কাজে ঢুকিয়াছিলাম।

অগাস্ট মাসের মাঝামাঝি মনীষা দেবীর এক কন্যার বিবাহ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিলেন। বিবাহে যাইতে পারিলাম না, পরে দুই-এক জায়গায় তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইবে আশা করিলাম, কিন্তু তিনি কলিকাতায় আসিয়াই জ্বরে পড়িলেন এবং কিছুদিন বাড়ি ছাড়িয়া বাহির হইতেই পারিলেন না।

এই সময় তাঁহার 'জাপান-যাত্রী' বাহির হয়। বই একখানি উপহার পাইলাম, ভিতরে লেখা 'শ্রীমতী সংযুক্তা দেবী কল্যাণীয়াসু।' চারুবাবু ও বাবা কবিকে দেখিতে যাইতেন, তাঁহাদেরই কাছে তিনি কেমন আছেন তাহার অল্পস্বল্প খবর পাইতে লাগিলাম। দেখিতে যাইবার জন্য অনেকদিন চেষ্টা করিয়া শেষে একদিন সফল হইলাম। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে পৌঁছিতে দরোয়ান খবর দিল যে, তিনি এখানেই আছেন বটে, তবে তাঁহার অসুখ। যাহা হউক, এই বাধা না মানিয়াই উপরে উঠিয়া গেলাম, নিজেকে বুঝাইলাম খুব বেশি বাহিরের লোকের ভিড় নিবারণ করিবার জন্যই বোধ হয় দরোয়ানকে ঐ কথা বলিতে বলা হইয়াছে।

তাঁহার তিনতলার শয়নকক্ষে উঠিয়া গিয়া দেখিলাম, মেঝেতে পাতা বিছানায় তিনি শুইয়া আছেন, পাশে গৈরিকধারিণী এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন। শুনিলাম তিনি কবির চতুর্থ ভ্রাতা বীরেন্দ্রনাথের পত্নী প্রফুল্লময়ী দেবী। রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত হইয়া শুইয়া থাকিতে ইতিপূর্বে কখনো দেখি নাই, অসুখকে তিনি আমলই দিতেন না। চেহারা বড়োই ক্লিষ্ট দেখাইতেছিল। নানা কথার ভিতর একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সংযুক্তা দেবী একখানা জাপানযাত্রী পেয়েছ তো?'

অসুস্থ ছিলেন বলিয়াই বাড়ির অনেকে ক্রমাগত ঘরের ভিতর যাওয়া-আসা করিতেছিলেন। কবির ভ্রাতৃজায়া তাঁহাকে রোগশয্যায়ও রোগীর মতো না থাকার জন্য স্নেহের ভর্ৎসনা করিতেছেন শুনিয়া একটু কৌতুক অনুভব করিয়াছিলাম। তাঁহাকে বকিতে পারেন এমন লোকও তাহা হইলে আছেন!

খানিক পরে চলিয়া আসিলাম। দিন-দুই পরে শুনিলাম তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গিয়াছেন এবং কাহারো কথা না শুনিয়া আবার যথারীতি ক্লাস পড়াইতেছেন ও লিখিতেছেন।

এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে মুলু কয়দিনের আকস্মিক পীড়ায় আমাদের চিরদিনের মতো ছাড়িয়া গেল। মৃত্যুর সঙ্গে সেই প্রথম নিকট-পরিচয়, আঘাতে যেন একেবারে মুহ্যমান হইয়া গেলাম। কয়েকদিন পর্যন্ত এই চিরবিদায়কে বিশ্বাসই করিতে পারি নাই। মুলুকে রবীন্দ্রনাথ বড়ো স্নেহ করিতেন। আমাদের এই দুঃখের দিনে তিনি কাছে ছিলেন না, কিন্তু বাবাকে ও আমাদের উপরি উপরি কয়েকখানি চিঠি লিখিয়া সান্ত্বনা দিয়াছিলেন।

বাবা মা পূজার ছুটিটা পুরীতে গিয়া কাটাইয়া আসিবেন স্থির করিলেন। সকলেই চলিলাম। কলিকাতা হইতে বাহির হইবার দিন-কয়েক আগে শুনিলাম রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়াছেন। আমাদের বাড়ি দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। অল্পক্ষণ থাকিয়াই চলিয়া গেলেন। দিন-দুই পরে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। সেদিন আর কোনো অভ্যাগত উপস্থিত না থাকায় বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ তাঁহার সঙ্গে কথা বলিলাম। পুরী যাইতেছি শুনিয়া বলিলেন, 'যাও, বেশ ভালো লাগবে।' বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য অতঃপর উঠিয়া গেলাম। বাড়ি যাইবার জন্য নামিতেছি তখন দূর হইতে দেখিতে পাইয়া নিজেই উঠিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সীতা, যাচ্ছ?' তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

মাসখানিক কাটানো গেল পুরীতে। প্রথম সমুদ্রদর্শন মনকে বড়োই মোহিত করিল।

৭ই পৌষের উৎসবান্তে রবীন্দ্রনাথ বাবাকে একখানি চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন— '৭ই পৌষের উৎসব হয়ে গেল। আপনাদের স্মরণ করেছি... শান্তা-সীতাকে আমার আশীর্বাদ জানাবেন।'

১৯২০ খৃস্টাব্দের মে মাসে শুনিতে পাইলাম তিনি আবার বিলাতযাত্রা করিতেছেন। মাসের প্রথম দিকে যাত্রার আয়োজন করিতে কবি কলিকাতায় আসিলেন। ৩ মে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। বসিয়া লিখিতেছিলেন, আমাদের দেখিয়া উঠিয়া আসিলেন। প্রণাম করিতেই বলিলেন, 'কি গো, অনেকদিন পরে দেখা যে, এসো এসো।' সত্যই মাঝে আট-ন' মাস দেখাই হয় নাই। অনেকক্ষণ বসিয়া গল্প হইল। আমাকে আশ্বাস দিলেন, ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আবার আমাকে শান্তিনিকেতনে লইয়া যাইবেন। কখন ফিরিবেন জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, 'ভয় পেয়ো না, খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসব।' প্রতিমা দেবী অসুস্থ ছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া আসিলাম। বাড়ি ফিরিবার সময় যখন রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করিতে গেলাম, তিনি বলিলেন, 'বেশ ভালো থেকো, এসে যেন সব ভালোই দেখি।' তাঁহার আশীর্বাদের স্পর্শ মাথায় বহন করিয়া আনিলাম।

১৩২৭ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় যাপন করিলেন। তবে পারিবারিক কোনো অসুবিধার জন্য বিশেষ কোনো উৎসব সেদিন হইল না, কয়েকজন ভদ্রলোক শুধু নিমন্ত্রিত হইলেন। আমরা দুই বোন চারুচন্দ্রকে ধরিয়া দুই ডালি ফুল তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিলাম। একটিতে ছিল শ্বেতপদ্ম, অন্যটিতে রক্তপদ্ম। চারুবাবু ফিরিয়া

আসিয়া খবর দিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 'কি হে, এমন দুপুর-রোদে কেন?' চারুচন্দ্র বলিলেন, 'আমি বাহন হয়ে এসেছি।' ফুলের তোড়া-দুটির কোনটি কে পাঠাইয়াছি তাহা কবি জানিতে চাওয়ায় চারুবাবু বলিলেন, 'আমি তো জানি না, আমি কেবল বহন করে এনেছি মাত্র। আপনিই অনুমান করে নিন।' রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'লালটাই সীতার বোধ হচ্ছে, তার মধ্যে একটু রাগ আছে কি না।' এ-হেন মন্তব্য শুনিয়া সকলে খুব হাসিয়াছিলাম।

মে মাসের মাঝামাঝি কবি ইউরোপ যাত্রা করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা মঞ্জুশ্রী তাঁহার সঙ্গে গেলেন, আর গেলেন প্রতিমা দেবী ও রথীন্দ্রনাথ।

এক বৎসরের বেশি তিনি ইউরোপের নানা দেশে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। বাবার কাছে চিঠিপত্র মধ্যে মধ্যে আসিত। সাময়িক মাসিক ও দৈনিক পত্রগুলিতেও তাঁহার খবর কিছু কিছু পাইতাম। দিগ্বিজয়ী সম্রাট অপেক্ষাও সম্মান ও আদর তিনি নানা দেশে পাইতেছেন শুনিয়া মন আনন্দে ভরিয়া উঠিত, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হইত যে রবীন্দ্রনাথের যে একটি ধারণা আছে সেটি এবার আরো দৃঢ়তর হইবে। দেশের লোকে যে তাঁহাকে যথার্থ ভালোবাসে এ কথা তিনি যেন বিশ্বাসই করিতে পারিতেন না, এইবার ভাবিবেন বিদেশের লোকই তাঁহার সত্যমর্যাদা রক্ষা করিয়াছে। হতভাগ্য বাংলাদেশ এমন করিয়া তো নিজের ভালোবাসা কোনোদিনই জানাইতে পারে নাই।

এই সময় (১৯২০) কবিকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্য করার প্রস্তাবে প্রবীণ ও নবীন দলের ভিতর মহা ঝগড়া বাধিয়া গেল। এই ঝগড়া বেশ কিছুদিন চলিয়াছিল। প্রশান্তচন্দ্র তখন ঠিক আমাদের পাশের বাড়িটিতে বাস করিতেন এবং তাঁহার ঘরটিই ছিল যুবকদের সকল তর্ক-আলোচনার আড্ডা। কাজেই অন্তরালে থাকিয়াও ঝগড়টা আমরা পূর্ণমাত্রায়ই উপভোগ করিলাম। মাঘোৎসবের সময় কার্যনির্বাহক সমিতির যে বার্ষিক অধিবেশন হয়, তাহা এই ঝগড়ার কল্যাণে গড়াইতে গড়াইতে মার্চ মাস পর্যন্ত চলিল। তাহার পর রবীন্দ্রনাথ সম্মানিত সভ্য মনোনীত হইলেন, অধিকাংশ সভ্যের ভোটে। প্রবীণরা অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন। বিশ্বের বরণীয় মহাপুরুষকে একটা সাধারণ সম্মান দেখাইতে ইঁহাদের কেন যে অত আপত্তি ছিল, তাহা তখনো বুঝিতে পারি নাই, এখনো পারি না। ইহা লইয়া সমাজে ও অনেকের পারিবারিক জীবনেও কত যে ঝগড়াঝাঁটি হইয়া গেল তাহার ঠিকানা নাই।

অবশেষে ১৯২১-এর জুলাই মাসের মাঝামাঝি রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি বোম্বাই হইতে কলিকাতা আসিবেন, না বর্ধমান হইয়া সোজা শান্তিনিকেতন চলিয়া যাইবেন, সেই হইল এক সমস্যা। অনেকে অনেক রকম বলিলেন। শেষে জানা গেল, সম্প্রতি তিনি শান্তিনিকেতনেই যাইতেছেন। প্রশান্তচন্দ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বর্ধমানে গেলেন রাত্রে। সোমবার সকালে ফিরিয়া আসিয়া খবর দিলেন যে, কবি ভালোই আছেন, কয়েকদিন পরে হয়তো কলিকাতায় আসিতে পারেন, ইত্যাদি। আমাদেরও একবার শনি-রবিবারে শান্তিনিকেতন যাওয়ার প্রস্তাব উঠিল। তবে

যাইব বলিলেই তখনি যাওয়া যায় না, স্কুলের ভাবনা ছিল, সংসারের ভাবনাও এখন ভাবিতে হইত। যাহা হউক, ২০ জুলাই রবীন্দ্রনাথই কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যদিও কলিকাতার গোলমাল, বিবাদ-বিসংবাদ তাঁহার ভালো লাগিত না, তবু কলিকাতাবাসী ভক্তবৃন্দের জন্য তাঁহার আন্তরিক ভালোবাসা এতখানি ছিল যে খুব বেশিদিন তাহাদের নিকট হইতে দূরেও তিনি থাকিতে পারিতেন না।

দিদি তখন শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাছে চিত্রাঙ্কন শিখিতে যাইতেন। আমিও তাঁহার সঙ্গ ধরিলাম, কারণ জোড়াসাঁকোয় তখনি যাইতে অত্যন্ত উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলাম। গাড়ি গিয়া অবনীন্দ্রনাথদের বাড়ির সামনেই দাঁড়াইল, কিন্তু দেখা গেল তিনি তখন রবীন্দ্রনাথের বসিবার ঘরের বারান্দার সামনে বসিয়া আছেন। আমরাও সেখানে গিয়া উঠিলাম। রবীন্দ্রনাথ বসিবার ঘরেই ছিলেন, আমাদের সাদরে আহ্বান করিয়া কাছে বসাইলেন। বহুদিন পরে তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিয়া, নিজেকে যেন কৃতার্থ বোধ হইতে লাগিল।

চেহারার অনেক উন্নতি হইয়াছে দেখিলাম। অত ঘোরাঘুরি সত্ত্বেও ইউরোপে গিয়া তিনি বেশ ভালোই ছিলেন বোধ হইল।

রামমোহন রায় সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী সেই সময় কিছু একটা মন্তব্য কোনো প্রবন্ধে করিয়া থাকিবেন। কি যে তাহা এখন মনে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। ইউরোপ-ভ্রমণের বর্ণনা অনেক করিলেন। তিনি যে সমাদর লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে খুশি না হওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব ছিল, খুশিই হইয়াছেন দেখিলাম। উহা অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে শুধু তাঁহারই সম্মান বলিয়া তিনি গ্রহণ করেন নাই, প্রাচ্যের প্রতিনিধি-স্বরূপেই তিনি এই রাজোচিত সম্মান গ্রহণ করিয়াছিলেন। বলিলেন, 'আমার বিশ্বাস, পশ্চিম যখনি আঘাত পেয়েছে, প্রাচ্যের দিকে তাকিয়েছে অনেক আশা করে, এবং প্রায়ই নিরাশ হয়েছে। আমিই কেবল এটা অনুভব করলুম, আর কেউ দেশের এটা বুঝলে না— ভারি দুঃখের বিষয়। ওখানে অনেকে আমাকে অনুরোধ করেছেন যে, আমি যে কাজ শুরু করে এলুম সেটাকে continue করতে পারে এমন যেন কাউকে আমি পাঠিয়ে দিই। আমার মনে হয় ব্রজেন্দ্র শীল মশায় বা অরবিন্দ ঘোষ গেলে চলতে পারে, কিন্তু একজনও যেতে রাজি হবেন কি না সন্দেহ।'

বলিলেন, ইংল্যান্ড অপেক্ষা কন্টিনেন্টেই ভারতীয় ছাত্রেরা যথেষ্ট বেশি সমাদর পায়। জার্মানির ভূতপূর্ব সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়মের পুত্র ও কন্যার সহিত আলাপ হইয়াছে বলিলেন। যুবরাজ তাঁহাকে একটি ফুলদানি উপহার দিয়াছিলেন, সেইটি দেখাইলেন। ইটালি আর স্পেনে এ যাত্রা যাইতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখ করিলেন।

গুরু অবনীন্দ্রনাথকে দেখাইবার জন্য দিদি নিজের আঁকা কয়েকখানি ছবি লইয়া গিয়াছিলেন, হঠাৎ সবাই মিলিয়া সেইগুলি দেখার ধুম পড়িয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ ছবিগুলিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া বলিলেন, 'এ যে বড়োই সীতা সীতা লাগছে, ওকে বুঝি দাঁড় করিয়ে এঁকেছ?' একটি ক্ষুদ্র বালিকা দোলনায় দুলিতেছে, সেই ছবিখানা

দেখিয়া বলিলেন, 'দোলনায় যে দুলছে এটি সীতা নয়, অন্য অনেক জায়গায়ই তুমি সীতাকেই এঁকেছ।' ছবিগুলির কোনখানে যে আমার সঙ্গে সাদৃশ্য ছিল তাহা কিন্তু আমি কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম না। দিদির আঁকার প্রশংসা হইল।

রথীবাবু এই সময় ইউরোপে তোলা রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি ছবি আনিয়া উপস্থিত করিলেন। বসিয়া বসিয়া সেইগুলি দেখিতে লাগিলাম। আমরা শান্তিনিকেতনে যাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলাম শুনিয়া বলিলেন, 'তবে তো আমি বড়ো অসময়ে এলুম। কিন্তু যাওয়াটা পাওনা রইল, না গেলে চলবে না।'

স্কুলের বেলা হইয়া যাইতেছিল, সুতরাং প্রণাম করিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

২৩ জুলাই আর-একবার জোড়াসাঁকোয় গেলাম। আমাদের বন্ধুমহলের কয়েকটি তরুণী তখন কবির দর্শন লাভের জন্য অতি ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলাম। পৌঁছিয়া দেখিলাম তাঁহার বসিবার ঘর পাগড়িবাঁধা মূর্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। সেখানে এখন সুবিধা হইবে না বুঝিয়া পাশের ঘরে গিয়া বসিলাম। রথীবাবু তাঁহাদের ইউরোপ-ভ্রমণের অনেক গল্প বলিলেন। রোম্যাঁ রোলাঁর সহিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাতের গল্প শুনিলাম। রোলাঁ ইংরেজি জানেন না, আর একজনকে মাঝে বসিয়া দুইজনের কথা দুইজনকে বুঝাইয়া দিতে হইয়াছিল।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘর হইতে উঠিয়া আসিলেন। সকলে উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। বলিলেন, 'ও, তোমরা এসেছ ? আচ্ছা, একটু বোসো, পাঁচ মিনিটের জন্যে। আমি এখুনি আসছি, কিছু মনে কোরো না।'

সত্যই পাঁচ মিনিট পরেই ফিরিয়া আসিলেন ও প্রায় ঘণ্টাখানিক আমাদের কাছে বসিয়া গল্প করিলেন। তাঁহার কয়েকজন নাতবউ এই সময় বেড়াইতে আসিলেন। নাতবউদের পড়ানো যে কি ভয়ানক শক্ত ব্যাপার রবীন্দ্রনাথ তাহাই বর্ণনা করিতে বসিলেন। ক্ষণে ক্ষণে নাকি ভুল হইয়া যায়। বলিলেন, 'ভেবো না ভুল শুধু আমারই হত। মনে করতে পার, বুড়োমানুষ, না-জানি এর কি হয়েছিল ; ওদেরও ঠিক সেই দশা! শেষে অবস্থা দেখে ওদের সরিয়েই নিল নাতিরা, পড়তে আর দিল না।'

অঙ্ক জিনিসটা সম্বন্ধে মতামত দেখিলাম তাঁহার বদলায় নাই। তিন-নয়ে সব ক্ষেত্রেই সাতাশ কেন হইবে, মাঝে মাঝে সাতাশের বদলে পঁয়তাল্লিশ কেন যে হইবে না, তাহা নাকি তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারেন না। শান্তিনিকেতনে মেয়েদের স্কুল করার কথাও আর-একবার উঠিল।

দেশ-বিদেশের অনেক কথাই হইল। শ্রীমান অশোককে লন্ডনে না কোথায় দেখিয়া আসিয়াছেন, বলিলেন সে ভালোই আছে। বার্লিন, ভিয়েনা প্রভৃতি স্থানে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরের অনেক রেকর্ড লওয়া হইয়াছে শুনিলাম। দিদির ছবি আঁকার কথায় বলিলেন, 'বেশ পারবে।' আমার লেখার প্রসঙ্গও উঠিল, বলিলেন, 'তোমার সঙ্গে কথা বলতেই এখন ভয় হয়, কখন দেখব গল্পের ভিতর চালিয়ে দিয়েছ। ওখানে এন্ডারসন সাহেব তোমাদের কথা বলছিলেন, তোমাদের লেখা তাঁর বেশ ভালো লেগেছিল। অনেক

লিখে ফেলেছ দেখছি।'

অনেক নূতন ফোটোগ্রাফ দেখিয়া মনটা লুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, নিজেদের জন্য এক-একখানা দাবি করিলাম। তিনি পুত্রের উপর সব ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। বলিলেন, 'ছবির উপর আমার কোনো অধিকার নেই।' নন-কোঅপারেশনের কথা উঠিল, দেখিলাম প্রসঙ্গটা তাঁহার কিছুই ভালো লাগিতেছে না। কথা ঘুরাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার নূতন ইংরেজি বইগুলি পাইয়াছি কি না। 'নৌকাডুবি'র অনুবাদটা শুনিলাম তাঁহার একেবারেই পছন্দ হয় নাই।

গান শুনিতে চাহিলাম; বলিলেন, 'সে-সব সুবিধে হবে না, শান্তিনিকেতনে না গেলে।' যাইব বলিয়া কথা দিলাম। বলিলেন, 'সীতা, দেখো, প্রতিশ্রুত হলে তো?'

দাদার আসন্ন বিবাহের কথা শুনিয়া বলিলেন, 'শুনেছিলুম, কিন্তু ভরসা হচ্ছিল না বলতে, কি জানি ঠিক কি না। যাক, খুব ভালো হল, আঁকশি কিছুতেই আর দুরধিগম্য হবে না।'

ইতিমধ্যে খবর আসিয়া পৌঁছিল যে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি অনেকে আসিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ উঠিয়া গেলেন। প্রতিমা দেবী এই সময় কবির অনেকগুলি ইউরোপে তোলা ফোটোগ্রাফ লইয়া আসিলেন। তাহার ভিতর হইতে একখানি চাহিয়া লইলাম। রঙিন ছবিও কয়েকটি দেখিলাম। ফোটোগ্রাফটিতে কবির স্বাক্ষরলাভের উপায় কি করা যায় ভাবিতে বসিলাম। অবশেষে প্রতিমা দেবীর অনুরোধে সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর গিয়া ছোটোভাইকে ডাকিয়া আনিতে রাজি হইলেন। এই ভদ্রলোককে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে প্রায়ই দেখিতাম। লোকজন আসিলে তখনি আসিয়া বসিতেন এবং অমায়িকভাবে কথাবার্তা বলিতেন। তিনি যে রবীন্দ্রনাথের দাদা সে কথাটা খুব গর্বের সহিত উল্লেখ করিতেন।

রবীন্দ্রনাথ খানিক পরে আবার এই ঘরে উঠিয়া আসিলেন। কলম একটা আর কিছুতেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত জুটিল। কবি প্রথমে বলিলেন, 'রেখে যাও, লিখে পাঠিয়ে দেব।' হাতছাড়া করিতে কেহই উৎসাহ দেখাইলাম না। তিনি বলিলেন, 'অত অবিশ্বাস কোরো না।' আমি বলিলাম, 'আপনাকে তো অবিশ্বাস করছি না।' জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অদৃষ্টকে?' তাহাই স্বীকার করিয়া লওয়া গেল। নাম লিখিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রথীর কাছে নিলে?' আমি বলিলাম, 'না, আমাদের স্বজাতীয়া যিনি, তিনি আমাদের উপর বেশি দয়া করবেন ভেবে, তাঁর কাছেই চাইলাম।' কবি বলিলেন, 'আমি তো জানতুম তোমাদের স্বজাতীয়ারাই তোমাদের দাবি কম রাখেন, আমরাই বরং বেশি রাখি।' আমি বলিলাম, 'আপনার কাছেই তো প্রথম দাবি করেছিলাম, আপনি তো রাখলেন না।' হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। ইউরোপে ইংরেজিতে নাম লিখিয়া লিখিয়া এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে অন্যমনস্কভাবেই যেন ইংরেজিতে নাম লিখিয়া দিলেন। আবার পাশের ঘরে তাঁহাকে এই সময় চলিয়া যাইতে হইল, অন্য অতিথিদের সঙ্গে কথা বলিবার জন্য। আমরাও ইহার পর বিদায় গ্রহণ করিলাম।

দিন-দুই পরে আবার দেখা করিতে গেলাম। সেদিন বাহিরের অন্য অনেক লোক উপস্থিত থাকায় আমাদের সঙ্গে বেশি কথা বলিবার সুবিধা হইল না। একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শান্তার একখানা ছবি দরকার নেই?' আমি বলিলাম, 'লোভ যথেষ্টই আছে।' রবীন্দ্রনাথ কি কারণে জানি না ধরিয়া লইলেন যে, লোভটা দিদি সংবরণ করিয়াছেন। বলিলেন, 'ঐ গুণের জন্যেই তো শান্তাকে আমি admire করি।' এই admiration-টা অবশ্য দিদির প্রাপ্য ছিল না।

অসহযোগের বন্যা তখন (জুলাই ১৯২১) দেশকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথকে জিনিসটা বেশ কিছু বিচলিত করিয়াছে বোধ হইল। দেশে ফিরিয়াই তিনি এমন-সব চিঠি পাইতেছিলেন এবং এমন-সব কথা শুনিতেছিলেন যে, তাঁহার মন খানিকটা ভাঙিয়া গিয়াছিল। এমন-কি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্পও যেন আর তাঁহার মনে স্থির থাকিতেছিল না। তাঁহার অত্যন্ত অনুরক্ত দুই-একজনের ব্যবহার তাঁহাকে এই কঠিন আঘাত দিয়াছিল। অবনীন্দ্রনাথরা তিন ভাই এই সময় আসিলেন। ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে আলোচনা হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে দর্শনপ্রার্থী একদল যুবক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরে বসিবার আর জায়গা হইবে না দেখিয়া আমরা অতঃপর উঠিয়া পড়িলাম। ইহার দিনকয়েক পরে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে চলিয়া গেলেন।

অগাস্ট মাসের মাঝামাঝি তিনি আবার কলিকাতায় ফিরিলেন। ১৫ অগাস্ট National Council of Education-এর উদ্যোগে ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে একটি সভায় তিনি বক্তৃতা করিলেন। শুনিয়াছিলাম ইহা একটি অভিনন্দন-সভা, গিয়া কিন্তু অভিনন্দনের কিছু দেখিলাম না। লোকের ভিড় কমাইবার জন্য বোধ হয় টিকিট করা হইয়াছিল, অনেক কষ্টে তো টিকিট জোটানো গেল। গিয়া দেখিলাম মেয়েদের দিকে বিশেষ কেহই আসেন নাই, ছেলেদের দিকে প্রচুর ভিড়। ইন্‌স্টিটিউট হলের নিয়ম-মতো ঠেলাঠেলি, মারামারি, জানলার শার্সি ভাঙা, কিছুরই ত্রুটি হইল না। তবুও ঝড়বৃষ্টির দিন বলিয়া লোক যত জুটিতে পারিত, পুরাপুরি ততটা জোটে নাই।

রবীন্দ্রনাথ যতক্ষণ না আসিয়া পৌঁছিলেন ততক্ষণ সমানে গোলমাল চলিল, তিনি আসিবার পর অভ্যর্থনা-সূচক দুই-তিনটি চিৎকারের পর হল ঠাণ্ডা হইল। রবীন্দ্রনাথের এক পাশে বসিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, আর-এক পাশে স্যার আশুতোষ চৌধুরী। আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় অভিনন্দন-সূচক কয়েকটি কথা বলার পর রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। সভাস্থ সকলেই বোধ হয় আমাদের মতো কিঞ্চিৎ হতবুদ্ধি হইয়া বাড়ি ফিরিল, কারণ অভিনন্দন দেখিবার আশা লইয়া গিয়াছিল প্রায় সকলেই। যে বক্তৃতাটি কবি এখানে পাঠ করিলেন তাহা পরে 'শিক্ষার মিলন' নাম দিয়া প্রকাশিত হইল। ১৮ অগাস্ট আলফ্রেড থিয়েটারে তিনি আবার বক্তৃতা করিলেন। সেদিনও কলিকাতায় ঘোরতর বর্ষা। স্কুল হইতে ফিরিয়া তার পর গেলাম, কাজেই খুব ভালো জায়গা পাওয়া গেল না। তবু চেষ্টা করিয়া এমন একটা জায়গায় বসিলাম, যেখান হইতে বক্তৃতা-মঞ্চটা বেশ ভালো করিয়া দেখা যায়। হলটি বড়োই নোংরা লাগিল। এইদিন

সভাতে মেয়েদের ভিড় প্রচুর হইয়াছিল। সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তিনি বক্তা আসিয়া পৌঁছিবারও বেশ খানিক পরে আসিলেন। আসিয়াই রবীন্দ্রনাথকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন।

প্রথমে গান হইল, 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী'। গানটি খুব জমে নাই। তাহার পর রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। এবার লিখিত প্রবন্ধ পাঠ নয়, মুখেই বলিলেন। বলিতে বলিতে শেষের দিকে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, মুখ দিয়া যেন অগ্নিস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। শেষেও গান হইল, 'জনগণমন-অধিনায়ক।' বক্তৃতান্তে বাহিরে আসিয়া অনেকের সঙ্গে দেখা হইল। 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটি ছোটো পুস্তিকাকারে এখানে বিক্রয় করা হইতেছে দেখিলাম।

এইবার আসিয়া তিনি একটানা কিছুদিন কলিকাতায় ছিলেন। ঐ বক্তৃতা যেদিন হইল তাহার পরের শনিবারে বোধ হয় দুই-তিনজন সঙ্গিনীকে সঙ্গে লইয়া জোড়াসাঁকোর বাড়িতে গেলাম কবিসন্দর্শনে। গিয়া শুনিলাম রবীন্দ্রনাথ কিছু পরিশ্রান্ত হইয়া শুইয়া আছেন এবং প্রতিমা দেবীর জ্বর হইয়াছে। তাঁহারই ঘরে বসিয়া কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলিয়া তাহার পর কবিকে দেখিতে গেলাম। তিনি ভিতর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, 'এসো গো।' সেইখানেই ঢুকিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ গল্প করা গেল। আরো দু-একজন অভ্যাগত সেখানে বসিয়াছিলেন। শুনিলাম সকালে মহাত্মা গান্ধী এবং মৌলানা মহম্মদ আলি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। কবি নাকি মহাত্মাজিকে বলিয়াছেন, 'আপনি আসিবেন জানিলে একটা খদ্দরের পোশাক জোগাড় করিয়া পরিয়া থাকিতাম।' মহাত্মা গান্ধী শুনিয়া খুব খুশি হইয়াছেন। স্ত্রীলোকদের ভোট দেওয়ার অধিকার লইয়া রবীন্দ্রনাথ খানিক রসিকতা করিলেন। দিদিকে বলিলেন, 'মহিলা মজলিশের সুবিধে নিয়ে খুব কড়া কড়া কথা লিখে নিচ্ছ।' কলিকাতায় একটা অভিনয় করার কথা চলিতেছিল; রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা যে 'শারদোৎসব' হয়, অন্য দুই-একজন পরামর্শ দিলেন 'বিসর্জন' করিলে ভালো হয়। 'অপর্ণা' কাহাকে সাজাইলে ভালো হয় তাহা লইয়া আলোচনা শুরু হইল। হঠাৎ আমাকে অপর্ণা সাজাইবার কথা তাঁহার কেন মনে হইল জানি না। এই প্রস্তাবে আমি কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া বলিলাম, 'অপর্ণার চেয়ে আমার বয়স ঢের বেশি।' রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'তাতে কি? আমি কি করে কবিশেখর সেজেছিলুম?' সেখানে উপস্থিত এক যুবক পরম গম্ভীরভাবে বলিলেন, Sarah Bernhardt তো ষাট বছর বয়সে জুলিয়েট সেজেছিলেন।' বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ বা Sarah Bernhardt-এর সমকক্ষ নিজেকে মনে করিবার আমার কোনো কারণ ছিল না, সুতরাং আমার ভয়টা কাটিল না। সত্যই ভয় পাইতেছি দেখিয়া কবিও আর পীড়াপীড়ি করিলেন না।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কয়েকদিন আগে রবীন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। শুনিলাম তিনি নাকি কবিকে বলিয়াছেন যে, হিন্দুসমাজ তাঁহার উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। কবি বলিয়াছেন, 'তা হলে আপনিও আমার দলে আসছেন।' 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসখানির সমালোচনা করিয়া শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, 'বিমলা

যে স্বামীর টাকা চুরি করে অনুতাপ করতে বসল এ আপনি ঠিক লেখেন নি। এ কি আপনি মেমের মেয়ে পেয়েছেন যে অনুতাপ করবে? হিন্দুর মেয়ে বলবে, আমার স্বামীর টাকা চুরি করেছি, বেশ করেছি।' পূর্বোক্ত যুবক মহোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, 'ঠিকই তো। আমাদের অভিজ্ঞতায়ও এই দেখেছি তাঁরা অনুতাপ একেবারেই করেন না।' কবি নাকি শরৎচন্দ্রকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, নিখিলেশকে বিমলা তখন ঠিক স্বামীভাবে দেখিতে পারিতেছিল না।

ইহার পর অন্যরা উঠিয়া গেলেন, আমরা তিন-চারজনই বসিয়া রহিলাম। রবীন্দ্রনাথ প্রমাণ করিতে বসিলেন যে তিনি নিতান্তই দায়ে না পড়িলে কখনো লেখেন না। এই সূত্রে 'চিরকুমার-সভা' কেমন করিয়া লেখা হইল তাহার ইতিহাস বলিয়া গেলেন। 'ভারতী'র সম্পাদিকা নাকি হঠাৎ ছাপাইয়া দিলেন যে 'আগামী মাসে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি সামাজিক প্রহসন লিখিবেন।' পড়িয়া তো কবির চক্ষুস্থির। তিনি ভাগিনেয়ীকে বকিতে আরম্ভ করিলেন, 'কেন তুই আমাকে না জানিয়ে বিজ্ঞাপন দিলি ? আমি লিখব না।' কিন্তু শেষ অবধি লিখিতেই হইল, ভাগিনেয়ীকে বিপন্ন করিতে পারিলেন না। বলিলেন, 'কি লিখব কিছু ঠিক ছিল না। অক্ষয় বলে একজন মানুষকে খাড়া করে লিখতে শুরু করলুম, যদিও আজও জানি না সেটা সামাজিক প্রহসন হয়েছে কি না।' আমি বলিলাম, 'ভাগ্যে তিনি আপনাকে না জানিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। আমিও বাবাকে বলব 'প্রবাসী'তে ঐরকম একটা বিজ্ঞাপন দিতে।' রবীন্দ্রনাথ মহা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'না না, তোমার বাবাকে বোলো না।'

'গোড়ায় গলদ' লইয়াও একটু গল্প হইল। স্বীকার করিলেন অন্তত একটা কবিতার ছন্দ জীবনে তিনি ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই— কাদম্বিনীর নামে লেখা নিমাইয়ের সেই প্রসিদ্ধ কবিতাটি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ দুটোর ইংরেজি হয় না ?' রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'না, ও জিনিস ওরা পাবে কোথায় ? Sister-in-law ওদের নেই।'

ইতিমধ্যে চাকর আসিয়া খবর দিল যে তাঁহার খাবার দেওয়া হইয়াছে। আমরা উঠিয়া পড়িলাম। আর একটুক্ষণ প্রতিমা দেবীর ঘরে গিয়া গল্প করিলাম। বাড়ি ফিরিবার আগে কবির নিকট বিদায় লইতে গেলাম, তিনি তখন অ্যান্ড্রুজ সাহেবকে লইয়া খাইতে বসিয়াছেন। সেইখানেই গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বাড়ি ফিরিলাম।

মাঝে একদিন সংগীত-সংঘের রাখী-সম্মিলন উপলক্ষে ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে আর-একটি সভা হইল। ইহা ২০ অগাস্ট ১৯২১-এর কথা। এখানেও টিকিট কিনিয়া যাইতে হইল। কবির নামেই এমন নিদারুণ ভিড় হইত যে, কর্মকর্তারা আর কোনো উপায় খুঁজিয়া পাইতেন না ভিড় কমাইবার, টিকিট করা ছাড়া। অবশ্য ইহাতেও কোনো কাজ হইত না। আমাদের নানা কারণে গিয়া পৌঁছিতে একটু দেরি হইল। গিয়া তাহার পর আর বসিবার জায়গা খুঁজিয়া পাই না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর স্বেচ্ছাসেবকরা আমাদের স্থানগুলি আবিষ্কার করিল, গিয়া তো বসিলাম।

প্রোগ্রামের গোড়ায় ছিল ছেলেমেয়েদের গান-বাজনা, মাঝে রবীন্দ্রনাথকে

অভিনন্দন দেওয়া ও তাঁহার বক্তৃতা, শেষে ওস্তাদদের গান-বাজনা। মেয়েদের গানের মধ্যে শ্রীমতী মালতী বসু ও শ্রীমতী লীলা গুহের গান খুব ভালো হইল।

অতঃপর যবনিকা উঠিল ও রবীন্দ্রনাথকে দেখা গেল। ছোটো একটি মেয়ে আসিয়া তাঁহাকে মালা পরাইয়া দিল ও হাতে রাখী বাঁধিয়া দিল। প্রতিভা দেবী একটি অভিনন্দনলিপি পাঠ করিলেন। তাহার পর রবীন্দ্রনাথ নিজের বক্তব্য বলিতে উঠিলেন। আরম্ভ করিলেন এই বলিয়া যে, ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকার তাঁহার বিশেষ কিছু নাই— সেই বিষয়েই যদিও অতঃপর অনেকক্ষণ বলিয়া গেলেন। সংঘের ছাত্রী ও প্রতিষ্ঠাত্রীদের অন্তঃকরণে লক্ষ্মী ও সরস্বতী যুগল পদ্ম প্রস্ফুটিত হোক, এই আশীর্বাদ করিয়া তিনি তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেন। ওস্তাদদের গান-বাজনা শুনিতে শ্রোতার দল বেশি আগ্রহ দেখাইলেন না। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শেষ হইতেই অধিকাংশ লোক বাহির হইয়া গেল। আমরা অবশ্য বসিয়াই রহিলাম— খানিকটা ভদ্রতার খাতিরে, খানিকটা ভিড়ের ঠেলা এড়াইবার জন্য। ওস্তাদদের ভিতর অনেকেই খুব ভালো বাজাইলেন। আফতাবউদ্দীন নামক একজন ওস্তাদ বাঁশি বাজাইয়া প্রচুর সাধুবাদ পাইলেন।

এতকাল শান্তিনিকেতনেই 'বর্ষামঙ্গল' হইত, এবার স্থির হইল কলিকাতায় হইবে। মহোৎসাহে রিহার্সাল আরম্ভ হইল। একদিন গেলাম রিহার্সাল দেখিতে। গিয়া দেখি এক ঘরে নলিনী দেবী এবং অরুন্ধতী সরকারের নেতৃত্বে মেয়েরা গান শিখিতেছেন, আর এক ঘরে রবীন্দ্রনাথ ছেলেদেব গান শিখাইতেছেন। মেয়েদের ঘরে বসিলাম। খানিক পরে ছেলের দলকে সঙ্গে করিয়া কবি এই ঘরেই আসিয়া বসিলেন। তখন গানটা জমিল ভালো, একটু প্রতিযোগিতাও হইল। আমরা শেষ পর্যন্ত বসিলাম না, খানিক পরে চলিয়া আসিলাম।

কয়েকদিন পরে আবার গেলাম। সেদিন দেখি বিপুল মজলিশ। শান্তিনিকেতনের গানের দল আসিয়া পৌঁছিয়াছে, নাটোরের মহারাজা সপরিবারে উপস্থিত, দর্শকও অনেক। তাহার ভিতর কয়েকজন সাহেব এবং জাপানিকেও দেখিলাম। রবীন্দ্রনাথের বসিবার ঘরেই প্রথমে গান আরম্ভ হইল, তাহার পর জায়গার টান পড়াতে বিচিত্রার হলে উঠিয়া যাওয়া হইল। গানের সঙ্গে পিয়ানো, সারেঙ্গী, এস্রাজ প্রভৃতি অনেক বাদ্যযন্ত্র বাজিল। মাঝে আচার্য জগদীশচন্দ্র আসিয়া একবার মিনিট-খানিকের মতো ঘুরিয়া গেলেন। গান সেদিন সত্যই জমিল খুব। আসল দিনেও এতটা ভালো হয় নাই।

ইহার পরদিনই আবার রবীন্দ্রনাথ ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে 'সত্যের আহ্বান' নামক তাঁহার বিখ্যাত প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন। ভাদ্র মাস, এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। অনেক কষ্টে টিকিট সংগ্রহ করিয়া তো গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম শান্তিনিকেতনের বালিকা গায়িকার দল সদলে আসিয়া বসিয়া আছে। তাহাদের টিকিট ছিল কিছু পিছনের লাইনের, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ তাহাদের পিছনে বসিতে দিলেন না, বলিলেন, 'না না, ওদের এখানেই কোথাও দাও, ছেলেমানুষ ওরা কোথায় যাবে পিছনে ?' তাহারা সামনেই বসিল।

বক্তৃতার আরম্ভে বা শেষে গান টান কিছু ছিল না। রবীন্দ্রনাথ সময় হইবামাত্র মঞ্চে

উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রবন্ধটি তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে পড়িয়া গেলেন। অসহযোগ-আন্দোলনের কিছু কড়া সমালোচনা ছিল ইহার মধ্যে, শ্রোতাদের ভিতর হইতে দুই-তিনবার রব উঠিল, 'গান্ধী মহারাজকি জয়!' কিন্তু একটু ক্ষীণভাবেই, বিশেষ জোর যেন আপত্তিকারীরা প্রকাশ করিতে পারিলেন না। রবীন্দ্রনাথ সে-সব গ্রাহ্যই করিলেন না।

বর্ষামঙ্গলের প্রথম অধিবেশন হইল ইহার পরের দিনই। ১৩২৮ ভাদ্রের একেবারে শেষের দিকে এই অনুষ্ঠান হয়। সেদিনও সকাল হইতে সহস্র ধারায় বর্ষণ আরম্ভ হইল। বিকালের দিকে একটু ধরিল, তাই রক্ষা। অনেক চেষ্টাচরিত্র করিয়াও একটু আগে যাইতে পারিলাম না, একেবারে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময় গিয়া পৌঁছিলাম। বিচিত্রা-ভবনের পিছন দিকে যে ভূমিখণ্ড আছে সেইখানেই মণ্ডপ বাঁধিয়া আসর প্রস্তুত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ গায়ক-গায়িকাদের মধ্যেই বসিয়াছিলেন। আমাদের দিকে চাহিয়া একবার হাসিলেন। আমাদের সামনে এক সার মারোয়াড়ী ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন, তাঁহারা যে কোন দুঃখে গান শুনিতে আসিয়াছিলেন জানি না। সারাক্ষণ তাহাদের ভ্যান্‌ভ্যানানির জ্বালায় আমরাই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম।

প্রথমদিন গান তেমন ভালো হইল না, দুই-একটি বাদে। মৃদঙ্গের তাল-সহযোগে কবির কবিতা-পাঠ আমরা খুব উপভোগ করিলাম। তাঁহার গলা সেদিন একটু ভাঙিয়া গিয়াছিল। গান-বাজনা শেষ হইবার পরেও অনেকক্ষণ মণ্ডপের ভিতরেই বসিয়া রহিলাম। এত লোকের ভিড় হইয়াছিল যে বাহির হইবার পথ পাইতেই ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল।

পরের দিন আবার যাইব তাহা প্রথমে স্থির ছিল না। কিন্তু দুই-একটি নূতন গান ও আবৃত্তি হইবে শুনিয়া লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া আবার গেলাম। এদিন গান এবং আবৃত্তি প্রথমদিন অপেক্ষা অনেক ভালো হইল, কিন্তু অনেক পিছনে বসিয়াছিলাম বলিয়া দেখাশুনার একটু ব্যাঘাত হইল। নূতন গানও একটি হইল, যাহা আগের দিন হয় নাই। 'বাদল-মেঘে মাদল বাজে' গানটি সকলের একেবারে মনোহরণ করিয়া লইল। এদিনও বাড়ি ফিরিতে অনেক রাত হইল।

আরো একবার হইবে শুনিলাম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ মত পরিবর্তন করিয়া সদলবলে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া চলিয়া গেলেন।

সেপ্টেম্বরে শোনা গেল তিনি আবার কলিকাতায় আসিবেন। এখানে 'শারদোৎসব' অভিনয় হইবে, ছাত্রসমাজ হইতে কবিকে অভিনন্দন দেওয়া হইবে, রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভায় তিনি সভাপতি হইবেন, আরো কত কি। কিন্তু কার্যত কিছুই হইল না, তিনি কলিকাতায় আসিলেনই না। শান্তিনিকেতনেই 'শারদোৎসব' অভিনয় হইল। আমরাই চলিলাম সেখানে।

৫ কি ৬ অক্টোবর রওনা হওয়া গেল। দল খুব বড়ো ছিল না— প্রশান্তচন্দ্রের বাড়ির তিন চারজন, আমরা দুই বোন এবং শ্রীমতী হেমবালা সেন, এই কয়জনের নাম মনে আছে। যাইবার সময় কিভাবে স্টেশনে পৌঁছানো যাইবে তাহা লইয়া কিঞ্চিৎ গোলযোগ হইল। যাহা হউক, সময়মতো গিয়া পৌঁছিলাম কোনোমতে। ট্রেনে মেয়েদের কামরাটা

খালিই পাওয়া গেল, খুব আনন্দে গল্প করিতে করিতে চলিলাম। দেড় বৎসরের কাছাকাছি হইল, আশ্রম ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম, আবার সেই চিরপরিচিত চির-আনন্দের নিকেতন দেখিতে পাইব মনে করিয়া মন অধীর আগ্রহে ভরিয়া উঠিয়াছিল।

বোলপুরে পৌঁছিয়া দেখিলাম যে অভ্যর্থনা করিতে অনেকেই আসিয়াছেন। গোরুর গাড়িতে জিনিসপত্র চাপাইয়া হাঁটিয়াই বাহির হইয়া পড়িলাম। একদল মান্দ্রাজি ছেলে সুরুলে যাইবে বলিয়া আসিয়াছিল, তাহারাও চলিল আমাদের সঙ্গে।

আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলাম। কিন্তু ঠিক যে সুরটি হৃদয়বীণায় বাজিবে আশা করিয়া আসিয়াছিলাম তাহা যেন বাজিল না। বহুবার এখানে অতিথিরূপে আসিয়াছি, বহুদিন এখানে ঘরের মানুষের মতো ছিলাম। এবার নিজেকে কোন পর্যায়ে ফেলিব তাহাই যেন ভাবিয়া পাইলাম না। বাহিরের আয়োজন আগের মতোই ছিল, সেখানে ত্রুটি ছিল না, বুঝিলাম আমারই দৃষ্টি বদলাইয়া গিয়াছে। যে বাড়িটায় এতদিন কাটাইয়া গিয়াছিলাম, সেটার দিকে আর-একবার চাহিয়া দেখিলাম। ইহারই ভিতর অন্য মানুষ সেখানে বাসা বাঁধিয়াছে দেখিয়া মনটা কেমন যেন বিষাদাচ্ছন্ন হইয়া গেল। মুলুর হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি মানসপটে ভাসিয়া উঠিয়া দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

অতিথি হইয়া আসিয়াছি, অতিথিশালার বাড়িতেই গিয়া উঠিলাম। কেবলই মনে হইতেছিল আমারই কোনো বিস্মৃত পূর্বজন্মের মধ্যে যেন জাগিয়া উঠিয়াছি। সবই চেনা, সবই জানা, কিন্তু সবই যেন একটু দূরে সরিয়া গিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ আবার দেহলীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন দেখিলাম। পিয়ার্সন সাহেবের বাড়িটি এখন 'কলাভবনে' পরিণত হইয়াছে। সেই ছোটো ছাদটিতে আবার গিয়া উঠিলাম। কবি সেখানেই বসিয়াছিলেন, কাছে গিয়া প্রণাম করাতে হাসিয়া বলিলেন, 'কি গো সব রবাহূতের দল ?' সেইখানেই বসিলাম। এতগুলি মেয়ে, আমরা ঝগড়া না করিয়া একসঙ্গে থাকিতে পারিব কি না, কবি সেই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ইহা হইল ঠিক বিশ্বভারতীর আদিপর্ব। আশ্রমের ব্যবস্থাদির ইহারই ভিতর খানিক খানিক পরিবর্তন হইয়াছে দেখিলাম। কবির আর অবসর বলিতে কিছুই নাই। যাঁহারা সংকোচ ত্যাগ করিয়া গায়ের জোরে তাঁহার কাছে গিয়া বসিতে পারিতেন তাঁহারাই তাঁহার সান্নিধ্য উপভোগ করিতেন, অন্যরা বঞ্চিতই হইতেন। আগেকার সেই বৈকালিক গান-গল্পের আসর আর তেমন জমিত না। যে দুই-তিনদিন ছিলাম তাহার ভিতর প্রথম দিন মাত্র মিনিট-কয়েকের জন্য আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। পরদিন সকালে আমরা গেলাম দেহলীতে দেখা করিবার জন্য। কতকগুলি কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন, পরে এগুলি 'শিশু ভোলানাথ' বইটিতে স্থান পাইয়াছিল।

'শারদোৎসব' অভিনয় ভালোই লাগিল, তবে অনেকে বলিলেন আগের মতো ভালো অভিনয় হয় নাই। 'সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে', গানটি খুব জমিয়াছিল। পূর্ব পরিচিত ও পরিচিতা যাঁহারা ছিলেন, সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিলাম। দুই-চারটি নূতন শিশুর আবির্ভাব হইয়াছে দেখিলাম। যতদূর মনে পড়ে কবি

একদিন বিকালে এইভাবেই তাঁহার নবরচিত নাটক 'মুক্তধারা' পড়িয়া শুনাইলেন। 'ভৈরবপন্থীদের গান' তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া যেন বুকের ভিতর বাজিতে লাগিল। নাটক-পাঠ শেষ হওয়ার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোচনা চলিল, উহা কলিকাতায় অভিনয় করা যায় কি না। রাত্রের গাড়িতে কলিকাতা ফিরিলাম। পূজার ছুটিটা এলাহাবাদে কাটাইয়া নভেম্বরের গোড়ায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। এই সময় সমাজ-পাড়ায় ছেলেমেয়েদের একটি ক্লাব স্থাপিত হইল, তাহার নাম হইল The Social Fraternity। সকলে মিলিয়া আমাকে তাহার সম্পাদিকা নির্বাচন করিলেন। কাজ যাহা থাকিত তাহা অবশ্য সহকারী সম্পাদক সুশোভনচন্দ্র সরকারই করিতেন, নামটাই শুধু আমার থাকিত। প্রশান্তচন্দ্র দেবীপ্রসন্ন চৌধুরীর বড়ো বাড়িটি ভাড়া লইয়াছিলেন, তাহারই ছাদে ক্লাবের অধিবেশন হইত। ঝড় বৃষ্টি হইলে নামিয়া তাঁহার বসিবার ঘরে বসা হইত।

১৯২১-এর ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ একবার কলিকাতায় আসিলেন। তখন তাঁহার কাজের যা তালিকা পাওয়া গেল তাহাতে আশা করিতে পারি নাই যে, তিনি আবার আমাদের দেখা দিবেন। কিন্তু অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ছিল, ২৮ ডিসেম্বর একবার আমাদের বাড়ি আসিলেন। তখন যে বড়োদিনের ছুটি তাহা খেয়াল না করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্কুল ফাঁকি দিয়েছ কেন?'

বিশ্বভারতীর গল্প অনেক করিলেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার আবার শরীর খারাপ হইয়াছে দেখিলাম। ইউরোপ হইতে ফিরিবার পর তাঁহার যে দীপ্তিময় মূর্তি দেখিয়াছিলাম তাহা আবার ম্লান হইয়া গিয়াছে। বলিলেন, 'আমি তোমাদের বিশ্বভারতীর ছাত্রীরূপে চাই। যে-কোনো কণ্ডিশনে আসতে চাও, আমি রাজি।' প্রোফেসর সিলভ্যাঁ লেভি ও একজন অস্ট্রিয়ান মহিলা চিত্রকর তখন আশ্রমে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের পাইয়া দেখিলাম কবি অত্যন্ত খুশি হইয়াছেন। প্রোফেসর লেভির অত ভালো ভালো বক্তৃতাগুলি অনেকাংশে অপব্যয়িত হইতেছে বলাতে আমি বলিলাম, 'মাঝে মাঝে কলকাতায় এসে যদি তিনি বলেন তো বেশ হয়।' রবীন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে গিয়ে শুনলে বেশ হয়।'

তখন দেশময় অসহযোগের জোয়ার আসিয়াছে। আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা জেলে যাও নি যে?'

শুনিলাম তিনি কলিকাতা হইতে কালিগ্রাম যাইতেছেন, দিন-সাত পরে ফিরিবার পথে আবার কলিকাতায় আসিতেও পারেন। যাইবার সময় বলিলেন, 'যাই হোক, পড়তে যাওয়া যদি স্থির কর তো একখানা আবেদন করে দিয়ো।' কিন্তু মায়ের অবস্থা তখন এমন যে তাঁহাকে ফেলিয়া যাওয়ার কথা কল্পনাও করা চলে না।

১৯২২ খৃস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে আমরা কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বাড়ি ছাড়িয়া ৮নং রামমোহন রায় রোডে উঠিয়া গেলাম। বন্ধুবান্ধব, ক্লাব, সব হইতে অনেকদূরে গিয়া পড়িলাম। এই বাড়িতে আসিয়া দাদার বিবাহ হইল।

ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিলেন। 'মুক্তধারা' পড়িয়া শুনানো হইবে শুনিলাম। বিচিত্রার উপরের ঘরে তখন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাস করিতেছিলেন, তাই পড়িবার স্থান স্থির হইল গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ি। সেইখানেই গেলাম। বসিবার ঘরে আমাদের বসাইয়া গগনবাবু বলিলেন, 'বসুন আপনারা, আরম্ভ হলেই খবর দেব।' অনেক পরে পড়া আরম্ভ হইল। পাঠান্তে নাটকটি অভিনয় করার কথা উঠিল। রবীন্দ্রনাথের নিয়ম ছিল, আমাকে সামনে পাইলেই অভিনয়ের ভিতর একটা-কিছু সাজিতে বলা। এবারেও বলিলেন, 'সীতা, অম্বা সাজবে?' আমি নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলাম। বলিলেন, 'তোমাকে দিয়ে কোনো কাজ হল না।' পরদিন আমাদের Social Fraternity-র অধিবেশনে তাঁহাকে একবার পদধূলি দিতে অনুরোধ করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। বলিলেন আসিতে চেষ্টা করিবেন। আমরা তো মহাখুশি। সমস্ত ছাদ আলপনা দিয়া, বাতি দিয়া সাজানো হইল, খাওয়ানোর আয়োজন হইল, লোকজনও আসিল প্রচুর, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আর আসেনই না। দুই-চারজন যখন চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন তখন রবীন্দ্রনাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া নিজেই খবর দিলেন যে, তিনি এখানে আসা সম্বন্ধে মত পরিবর্তন করিয়া স্টেশনে চলিয়া গিয়াছিলেন, প্রশান্ত তাঁহাকে সেখান হইতে টানিয়া আনিয়াছে। যদিও তাঁহার সঙ্গে খুব বেশি কথা বলিতাম না, তবু এমন ব্যাপারে তাঁহাকেও দুই-চারিটা কথা শুনাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। উপরে সবাই গিয়া বসা গেল। কবি আবার তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট আসনে বসিতে চান না, রসিকতা করিয়া আমাকে সেখানে বসিতে বলিলেন। তাহার পর মুক্তধারা নাটকটি আর-একবার পড়িয়া শুনাইলেন। পাঠান্তে জলযোগের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে সেদিন খাওয়ানোও গেল না। যে পাত্রে তাঁহার জন্য খাবার আনিয়াছিলাম তাহা হইতে একটা-কিছু লইতে বলায় বলিলেন, 'বেশ তো সাজানো রয়েছে, একটা-কিছু তুললেই দেখতে খারাপ হয়ে যাবে।'

একটুক্ষণ গল্প করিয়া এবং বেশ কিছুক্ষণ শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলির সহিত রাজনৈতিক আলোচনা করিয়া তিনি রাত্রি ন'টা আন্দাজ যাইবার জন্য উঠিয়া পড়িলেন। যতদূর মনে পড়ে পরদিনই শান্তিনিকেতনে চলিয়া গেলেন।

মার্চ মাসে রবীন্দ্রনাথ আবার কলিকাতায় আসিলেন। ১৬ মার্চ বাবার কাছে শুনিলাম, কবি বিকালে আসিবেন বলিয়া খবর পাঠাইয়াছেন। বিকালে অবশ্য আসিলেন না, আসিতে রাত হইয়া গেল। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত আসিলেন। সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে আমাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, 'খুব জমিয়ে ঘরকন্না করছ তা দেখেই বুঝতে পারছি।' তিনতলায় বসিবার ঘরে আসিয়া বসিলেন। খবর দিলেন যে, শীঘ্রই তিনি নেপাল যাইতেছেন; সেখানে অনেক অমূল্য বৌদ্ধ পুঁথি আছে, সেইগুলির নকল লইবার অনুমতি পাইতে পারেন, এই আশায়। যাওয়া অবশ্য তাঁহার শেষ পর্যন্ত হয় নাই।

আমার নববিবাহিতা ভ্রাতৃজায়াকে তিনি তাঁহার কাব্যগ্রন্থাবলী উপহার দিয়াছিলেন। তাহাতে কিছু লেখা ছিল না। বধূঠাকুরানী এই সুযোগে বইগুলি উপস্থিত করিলেন,

লিপিবদ্ধ আশীর্বাদ পাইবার আশায়। তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে হইল না। লোকে যেমন অবলীলায় নাম সহি করে, তেমনি অবলীলায় তিনি কয়েক লাইন কবিতা লিখিয়া দিলেন।

তাহার পর আরম্ভ করিলেন অ্যান্ড্রুজ সাহেবের গল্প। ভদ্রলোকের নাকি আত্মপর জ্ঞানটা একেবারেই নাই। এলাহাবাদে নাকি একবার গভর্নমেন্ট হাউজ হইতে বাহির হইয়া তাঁহাকে তাড়াতাড়ি অন্যত্র কী একটা কাজে যাইতে হয়। চারি দিকে তাকাইয়া সাহেব যানবাহন কিছুই দেখিতে পাইলেন না, শুধু দেখিলেন একখানা সাইকল দেওয়ালের গায়ে ঠেসানো আছে। তৎক্ষণাৎ তাহা লইয়া প্রস্থান করিলেন। পরে জানা গেল যে সেখানা একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর এবং তিনি বিন্দুমাত্রও খুশি হন নাই। সাহেবের জিনিস অন্য কেহ লইলেও তিনি আপত্তি করেন না, তবে জিনিস নাই বিশেষ কিছু এই যা দুঃখ। দেওয়ালে আমার একখানা ছবি ঝুলিতেছিল, দিদিই সেখানা আঁকিয়াছিলেন। বলিলেন, 'বেশ চেনা যাচ্ছে, শান্তার কীর্তি তো?' 'মুক্তধারা' নাটকটি বাবাকে দিয়া গেলেন 'প্রবাসী'তে ছাপিবার জন্য। একটি নূতন 'কথিকা' লিখিয়াছিলেন, সেটা আমার হাতে দিয়া গেলেন। ইহা পরে 'লিপিকা'য় স্থান পাইয়াছিল। সুকুমারবাবু তখন অত্যন্ত পীড়িত, খানিক পরে কবি তাঁহাকে দেখিতে চলিয়া গেলেন।

পরদিন আমরা জোড়াসাঁকোয় গেলাম তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে। দোতলায় উঠিয়া দেখিলাম, আমারই এক আত্মীয় যুবক সেখানে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'রবিবাবু কোথায়?' তিনি বলিলেন, 'পাশের ঘরে, এক সাহেবের সঙ্গে গল্প করছেন।' পাশের ঘরে উঁকি মারিয়া দেখিলাম কবি আছেন বটে, তবে কোনো সাহেব তো চোখে পড়িল না। আমাদের দেখিয়া বসিবার ঘরে বসিতে বলিলেন, এবং নিজেও সেখানে আসিয়া ঢুকিলেন মিনিট-পাঁচ পরে।

আমায় বলিলেন, 'তোমার চাকরি করা কি আর থামবে না?'

আমি বলিলাম, 'থামতে তো পারে, কিন্তু তার পর করব কি?'

রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'আর কি কোথাও চাকরি নেই? আমার ওখানে যাওয়া যায় না?'

এই বিষয়েই খানিক কথা চলিল। যাইবার যে উপায় নাই তাহা তাঁহাকে বুঝাইতে ইচ্ছা করিল, কিন্তু সব কথা বলিবারও উপায় ছিল না। যাহা বলিলাম তাহার অর্থ খুব পরিষ্কার হইল না। আমাদের যাওয়াটা তিনি সত্যই চান কি না, সেই বিষয়েই যেন সংশয় প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'সত্যিই বলছি, আমি অন্তরের সঙ্গে চাই যে তোমরা একজন এসো।'

বলিলেন, 'সীতা খুব শক্ত মানুষ, গেলে কাজ করতে পারবে।' বাল্যকাল হইতে আমাকে দেখিয়াও এমন ধারণা তাঁহার কেন হইয়াছিল জানি না।

এই সময় অ্যান্ড্রুজ সাহেব আসিয়া প্রবেশ করিলেন। আমাদের বধূঠাকুরানীকে তিনি বিলক্ষণই চিনিতেন, তবে সবে নাম-পরিবর্তন হইয়াছে তাই রবীন্দ্রনাথ মহা ঘটা করিয়া আবার তাঁহাকে সাহেবের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিলেন—'Allow me to introduce

Mr. Andrews, Mrs. Chatterjee, Miss. Chattterjee'। অ্যান্ড্রুজ সাহেব রসিকতাটা উপভোগ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কবি বলিলেন, নেপালে যাইবার ইচ্ছা তাঁহার একেবারে নাই, কিন্তু লেভি-দম্পতি তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য জেদ করিতেছেন। অ্যান্ড্রুজ সাহেবকে তিনি অনুরোধ করিলেন যেন রেলওয়ে স্ট্রাইকটা তিনি আরো একটু ভালোভাবে বাধাইয়া দেন, তাহা হইলে কাহাকেও আর যাইতে হয় না। দুইজন দেশপূজ্য মহামান্য ভদ্রলোক আধঘণ্টা ধরিয়া এমনভাবে হাস্যপরিহাস করিয়া গেলেন যে সে এক দেখিবার জিনিস। দিদি এই সময় তাঁহার একখানি ফোটোগ্রাফ চাহিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'সীতার ছবি যেমন এঁকে নিয়েছ, তেমনি আমারো এঁকে নিয়ো, আমি বরং বসতে রাজি আছি। তোমাদের বউকে ধরে এক নিমন্ত্রণ আদায় করা গেল, সেইদিন বসব।' নিমন্ত্রণ আদায়টা অবশ্য তিনি বিশেষ করেন নাই। আমার ভ্রাতৃজায়াকে একবার বলিলেন, 'নূতন সংসারে গেলুম, অথচ মিষ্টিমুখ করালে না, এমন দুঃখ হল আমার।' আমরা তিনজনে মিলিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলাম। পরের বার যখন আসিবেন তখন নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবেন বলিলেন। বধূঠাকুরানী তাঁহার লেখার একটি পাণ্ডুলিপির জন্য আবেদন করিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'আচ্ছা, তুমি যদি ভালোরকম behave কর তো তোমায় দেওয়া যাবে একটা-কিছু।'

মিস্ ফেরিং সেই ১৯১৮ খৃস্টাব্দের ৮ পৌষের মেলায় কবির হাতের লেখা একটি কবিতা ক্রয় করিয়াছিলেন। প্রতিমা দেবীই বোধ হয় কবিতাটির চারি ধারে রঙিন ডিজাইন করিয়া দেন, বিক্রয়লব্ধ অর্থ কি-একটা কাজে দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে গল্প শুনিলাম, মিস্ ফেরিং সম্প্রতি সেইটি বিক্রয় করিয়া তাঁহার বাগ্‌দত্ত পতির পড়াশুনার খরচ চালাইবার সাহায্য করিতেছেন। বিক্রয় করিবার পূর্বে ভদ্রমহিলা কবির কাছে অনুমতি চাহিয়া পাঠান। ডেনমার্কের যে সাহিত্য-পরিষদ সেটি ক্রয় করেন, তাঁহারাও নাকি রবীন্দ্রনাথকে একটা সার্টিফিকেটের জন্য লেখেন, জিনিসটা খাঁটি না মেকি তাহা জানিয়া লওয়াই ছিল তাঁহাদের উদ্দেশ্য। কবি বলিলেন, 'কি আর করি অনুমতি না দিয়ে? কবির লেখা যদি মিলনসাধন করে, তা হলে তো আপত্তি করবার কিছু নেই।' এই সুযোগে আমাকেও খানিক ঠাট্টা করিয়া লইলেন। বলিলেন, 'সীতা, তোমার কাছে যে-সব manuscript আছে, তা যদি দরকার পড়ে বিক্রি কর তো আমার কোনো আপত্তি নেই। সব জমা করে রাখো, ওগুলোর দাম ক্রমেই বাড়বে। তবে বিক্রি করলে আমাকে কমিশন দিতে হবে তা বলে রাখছি।' আমার ভ্রাতৃজায়াকে অনেকবার করিয়া বলিলেন, 'তোমার আর manuscript-এর কোনো দরকার নেই, সীতার বরং আছে।'

খানিক পরে ফিরিয়া আসিলাম। ইহার পর তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল এপ্রিল মাসের প্রথমদিকে। সেদিনও আমাদের ক্লাবের অধিবেশন হইতেছিল। প্রশান্তচন্দ্র জোড়াসাঁকোয় গিয়াছিলেন কবিকে সেইখানে লইয়া আসিবার চেষ্টায়, তবে তিনি কতটা কৃতকার্য হইবেন সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ ছিল। ছাদের এধারে-ওধারে ছড়াইয়া সকলে আমরা নানারকম আলোচনায় ব্যস্ত, এমন সময় আমার খুড়তুতো ভাই হেমন্ত বলিলেন, 'এই-

যে রবীন্দ্রনাথ আসছেন।' সকলে ব্যস্ত হইয়া নীচের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, সত্যই তিনি আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাড়াতাড়ি নীচে ছুটিলাম তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য। উপরে আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি এখানকার সভাপত্নী না?'

প্রথমে এমনিই কথাবার্তা চলিতে লাগিল। টমসন সাহেব কবির রচনাবলীর একটা বিচিত্র সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহারই সমালোচনা আরম্ভ হইল। বাংলা ও ইংরেজি ভাষার ট্র্যাডিশনের প্রভেদ সম্বন্ধে কবি কিছু বলিলেন। অতঃপর গান শুনিবার জন্য আবেদন করা গেল। তাঁহার গলা সেদিন ভালো ছিল না, তবু আপত্তি করিলেন না। বলিলেন, 'গান আজকাল আর মনে থাকে না, সেই তো মুশকিল।' কয়েকটি গানই গাহিয়াছিলেন, তাহার ভিতর একটির কথা মনে পড়ে, 'এসো এসো ফিরে এসো, বঁধু হে ফিরে এসো।'

মাঝে একবার উঠিবার চেষ্টা করিলেন; বলিলেন, বাড়ি গিয়া অ্যান্ড্রুজ সাহেবকে খাওয়াইতে হইবে। কিন্তু আমরা তখনি তাঁহাকে ছাড়িতে একেবারেই রাজি ছিলাম না। গানের পর গুটিকতক কবিতা পড়া হইল, তাহার পর তিনি একরকম জোর করিয়াই উঠিয়া পড়িলেন। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া আমাকে বলিলেন, 'এরকম দস্যুবৃত্তি করা অন্যায় সীতা। আমি নিতান্ত ভালোমানুষ, তাই সব সহ্য করে যাই।'

মার্চ মাসে তিনি যখন আসেন তখনি তাঁহাকে একদিন আমাদের বাড়ি আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। বৃহস্পতিবারে বোধ হয় Fraternity-র মিটিং গেল, আমরা শনিবারে তাঁহার কাছে চলিলাম কবে তিনি আসিতে পারিবেন তাহা জানিবার জন্য। মঙ্গলবারে তাঁহাকে আনিতে পারিলে আমি নিজে খুব খুশি হইতাম, কারণ সেই দিনটা ছিল আমার জন্মদিন। কিন্তু শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে সেই দিনটায়ই তিনি চলিয়া যাইতেছেন।

শনিবারে গিয়াই দেখিলাম, ঘরভর্তি লোক। সেইখানেই বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, যদি একটু কথা বলিবার ফাঁক পাওয়া যায়। খানিক পরে কয়েকজন ভদ্রলোক উঠিয়া গেলেন, তখন তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। আমাকে আবার শান্তিনিকেতনে যাইতে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'চলো-না, বেশ সীতার বনবাস হয়ে যাবে।' ইহার আগে একদিন নিজেই ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, আমি বেশ শক্ত মানুষ। আজ দেখিলাম সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। আমি বলিলাম, 'আমি মোটেই শক্ত মানুষ নই।' কবি বললেন, 'ঠিক তো? না নিজের গুণ প্রচার করার জন্যে বলছ?

নিমন্ত্রণের কথাটা পাড়া গেল। প্রত্যেক দিনই তাঁর সভা-সমিতি, নানা কাজ। অবশেষে নিজেই সময় স্থির করিয়া লইলেন; বলিলেন, 'রবিবার সাড়ে-পাঁচটায় যাব। সেদিন বিশ্বভারতী-সংঘের সূচনা আছে, তা তারা না হয় আধঘণ্টা খানিক বসে থাকবে।' নিজে যে খোঁটা দিয়া আমাদের কাছে নিমন্ত্রণ আদায় করিয়াছেন, সে কথাটা

একটু শুনাইয়া দিলেন। রবিবার সকাল হইতেই দুই বোনে তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজনে লাগিলাম। আমাদের বাড়ি আসা তাঁহার নূতন কিছু নয়, কিন্তু এবার নিজেরা নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেছি বলিয়া একটু সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিলাম। যদিই এমন মহামান্য অতিথির উপযুক্ত সম্মান না করিতে পারি।

৮ এপ্রিল তিনি আসিলেন। সাড়ে-পাঁচটায় আসিবেন বলিয়াছিলেন, তবে পাঁচটার মধ্যেই আসিয়া পৌঁছিলেন। সঙ্গে দেখিলাম অ্যান্ড্রুজ সাহেব। আমি নীচে নামিতে-না-নামিতেই তাঁহারা উঠিয়া আসিলেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, 'সীতা, আমি সুদ-সুদ্ধ এসেছি, এতে আশা করি রাগ করবে না।'

আমাদের ছোটো বসিবার ঘরটিতে আসিয়া বসিলেন। বলিলেন, 'ওদের সব বসিয়ে রেখে এলুন, সবাই মহাব্যস্ত জানতে কতক্ষণে ফিরব, বললুম, ভদ্রমহিলার নিমন্ত্রণ কি আর সাড়ে-ছ'টার আগে সেরে আসতে পারব ?'

অ্যান্ড্রুজ সাহেব উঠিয়া ঘরের বইয়ের আলমারিগুলি দেখিতে লাগিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিলেন, 'Sita, I warn you never to lend any book to Mr. Andrews !' দুই-তিনবার এই ওয়ার্নিং দেওয়াতে সাহেব বলিলেন, This is too bad Gurudev,' বলিয়া তিনি আবার ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিলেন।

বাবা ও দিদি আসিয়া বসিলেন, আমি কি একটা কাজে ঘরের বাহিরে গেলাম। কয়েক মিনিটের জন্য ফিরিয়া আসিতেই রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'সীতা, তোমার ভারি অন্যায়, কেন তুমি লুকিয়ে রাখলে যে তোমার জন্মদিন ? রাজারাজড়ার জন্মদিনই ইচ্ছামতো এগোনো-পিছনো যায়, তুমিও তাদের দলে গেলে ?' আমি বলিলাম, 'কই, কিছু তো এগোয় নি, পিছোয়ও নি।' কবি বলিলেন, 'এই তো এগিয়েছে, কেন তুমি আমায় ফাঁকি দিলে বলো তো ? আমি জানলে পরে—' সাহেব ব্যাপারটা কি কিছুই বুঝিতেছেন না দেখিয়া তাঁহার কাছে ব্যাখ্যা করিতে বসিলেন—'Day after tomorrow is her birthday, she kept it a secret from me.'

খাইতে বসিয়া বিশেষ কিছু খাইলেন না; বলিলেন, 'সাহেবকে ভালো করে খাওয়াও, ও খেতে ভারি ভালোবাসে।' তাহার পর বাবা, কবি ও সাহেব মিলিয়া রাজনৈতিক আলোচনা আরম্ভ হইল।

আমাকে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া যাইতে আর-একবার অনুরোধ করিলেন। এদিকে আকাশ কালবৈশাখীর ভ্রুকুটিতে কালো হইয়া উঠিল। বাড়িতে বিশ্বভারতী-সংঘ অপেক্ষা করিয়া আছে, কাজেই খুব বেশিক্ষণ বসিতে পারিলেন না, গাড়ি আনিতে পাঠানো হইল। সেদিন গড়পারে যেন গাড়ির দুর্ভিক্ষ লাগিয়াছিল, অনেক চেষ্টার পর তবে একখানা গাড়ি পাওয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ যাইবার জন্য উঠিলেন। তাঁহাকে প্রণাম করিতেই আর-একবার বলিলেন, 'জন্মদিনটা কেন লুকিয়ে রাখলে বলো তো ?'

তিনি চলিয়া যাইতেই ভাবিলাম, বিশ্বভারতী-সংঘে যাইবার অধিকার তো আমাদেরও আছে, আমরাই বা বাড়ি বসিয়া থাকি কেন, জোড়াসাঁকোতে গেলেই তো

হয়। আর-একখানা গাড়ি আনিতে পাঠানো গেল, এটা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়েই আসিল, এবং আমরাও তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া পড়িলাম। পৌঁছিয়া দেখি সভার কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তখন বলিতেছেন, লোক এক এক করিয়া আসিতেছে, শেষে ঘরে রীতিমতো ভিড় জমিয়া গেল। তাঁহার বক্তৃতার পর, বিশ্বভারতী-সংঘের কার্যনির্বাহক কমিটি নির্বাচন, তাহার নিয়মাবলী প্রণয়ন, প্রভৃতি কাজ আরম্ভ হইল। ভয়ানক জোরে বৃষ্টি আসিতেছে বুঝিয়া আমরা এই সময় উঠিয়া পড়িলাম। বাড়ি ফিরিবার পথে বেশ একচোট ভেজা গেল।

মঙ্গলবারে কবি শান্তিনিকেতনে চলিয়া গেলেন। জুলাই মাসে আবার কলিকাতায় আসিলেন শেলির শতবার্ষিকী সভায় সভাপতিত্ব করিতে। তখন অত্যন্ত অসুখে ভুগিতেছিলাম, তাই সভায় যাইতে পারিলাম না, জোড়াসাঁকোয় গিয়া দেখাও করিতে পারিলাম না। কিন্তু অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ছিল, তিনি নিজেই আমাকে একদিন দেখিতে আসিলেন। মাসখানিক খালি ৯৯ জ্বর উঠিতেছে, বাড়েও না ছাড়েও না; শুনিয়া বলিলেন, 'এ আবার কি ? একটা decent রকম অসুখও করতে পার না ? এইরকম জ্বরে শুয়ে থাকতে তো লজ্জা হওয়া উচিত।' সেপ্টেম্বর মাসে যখন কলিকাতায় 'শারদোৎসব' অভিনীত হইল তখন আবার তাঁহার দেখা পাইলাম। যতদূর মনে পড়ে অ্যালফ্রেড থিয়েটারেই এই অভিনয় হইয়াছিল। শারদোৎসব কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়াছে দেখিলাম, নূতন গানও কয়েকটি দেওয়া হইয়াছে। কবিশেখরকে আবার রঙ্গমঞ্চে দেখা গেল।

এই বৎসর পূজার ছুটির পূর্বে আমার বিবাহ স্থির হয়। রবীন্দ্রনাথ সংবাদ শুনিয়া আনন্দিত হন, এবং ঠিক ইহার পরই আমাদের এক অপরিচিত ভদ্রলোকের বাড়ির উৎসবে আমাকে উপস্থিত না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'সীতা কি শকুন্তলার মতো অনন্যমনা হয়ে ধ্যান করছে ?' ইহার কিছুকাল পরে বিশ্বভারতীর উদ্যোগে রামমোহন লাইব্রেরি হলে একটি সভা হয়। রবীন্দ্রনাথ এইখানে ব্রাউনিং-এর Luris পড়িয়া শোনান। পাঠান্তে রবীন্দ্রনাথ প্ল্যাটফর্ম হইতে নামিয়া সমাগত ভদ্রলোকদের সঙ্গে কথা বলিতে দাঁড়াইলেন। কাছে গিয়া প্রণাম করিব কি না ভাবিতেছিলাম, দূর হইতে দেখিতে পাইয়া তিনি নিজেই তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া আসিলেন। মুখ কৌতুকোজ্জ্বল, অত লোক না থাকিলে কিছু-একটা রসিকতা করিতেন। আমি প্রণাম করাতে বলিলেন, 'এবার আর ৭ই পৌষে নিশ্চয়ই তুমি যাচ্ছ না ?' যাইতেছি না তাহা স্বীকার করিলাম, এবং পরদিন সকালে জোড়াসাঁকোয় তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইব বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

তাহার পরদিন গিয়া উপস্থিত হইলাম। অতিশয় সাদর অভ্যর্থনা পাইলাম। তাঁহার বসিবার ঘরেই বসিলাম। রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, 'কি খবর কিচ্ছু জিগগেস করব না, আমি বেশ জানি সব সুখবর।' রবীন্দ্রনাথ আমার সহিত সিরিয়সভাবে কথাবার্তা প্রায় বলিতেনই না, রসিকতা হাসিঠাট্টা আমি অতিশয় উপভোগ করি সেটা বুঝিতেন বলিয়াই বোধ হয়। এখন হইতে তো রসিকতা করা ছাড়া অন্য কোনোভাবে আলাপই ছাড়িয়া দিলেন। আবার বলিলেন, 'তোমায় বললুম আমার স্কুলে মাস্টারি করতে, তো

তোমার পছন্দ হল না, মন সব অন্য দিকে। তা বেশ করেছ— আমার এখন কি উপায় হবে ? একজন কাউকে ঠিক করে দাও, বিধবা কিংবা বুড়ি দেখে দিয়ো। তোমাদের আমি একটুও বিশ্বাস করি না, কবে মাঝপথে বসিয়ে সরে পড়বে।' যতক্ষণ ছিলাম, আমার দিকে তাকাইয়া প্রায় সারাক্ষণই হাসিয়াছিলেন। নূতন অবস্থার দোহাই দিয়া লেখা ছাড়িয়া দিতেছি বলিয়া একটু স্নেহের তিরস্কার করিলেন। আরো খবর দিলেন যে, তিনি স্বয়ং ভয়ানক বোকা হইয়া গিয়াছেন, আর লিখিতে পারেন না। ৭ই পৌষের উৎসবের কথায় বলিলেন, 'তোমায় অবশ্য এবার আমি যেতে বলছি না, তবু যদি যাও, আমার বাড়িতেই ঠাঁই করে দিতে পারি।' অন্য কয়েকজন অতিথি আসিয়া পড়ায়, বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া আসিলাম। ইহার পরদিন তিনি শান্তিনিকেতনে চলিয়া গেলেন— যতদূর মনে পড়ে। জানুয়ারি মাসে আবার কলিকাতায় ফিরিলেন। এই সময় বোধ হয় আচার্য সিলভ্যাঁ লেভি শান্তিনিকেতন ত্যাগ করিলেন। রামমোহন লাইব্রেরিতে তাঁহার বিদায় উপলক্ষে একটি সভা হয়। রবীন্দ্রনাথ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। লেভি-দম্পতি ভারতীয় বেশে সভায় উপস্থিত হন। প্রোফেসর লেভি একটি ছোটো মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করিলেন। মাদাম লেভি উপস্থিত মহিলাদের প্রত্যেকের কাছে গিয়া বিদায় সম্ভাষণ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ শেষে ইংরেজিতে একটি ছোটো বক্তৃতা করিলেন।

৭ জানুয়ারি রামমোহন লাইব্রেরিতে আর-একটি সভা হইল, এখানে এল্‌ম্‌হার্স্ট সাহেব ভিলেজ অর্গ্যানাইজেশন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন, রবীন্দ্রনাথ হইলেন সভাপতি। বক্তার মতে আমাদের দেশের গ্রামগুলির তিনটি ব্যাধি— malaria, monkeys and mutual mistrust। এইগুলির প্রতিকারের উপায় আলোচনা করিলেন। ভালো সার দিয়া চাষ করিলে ফল কিরকম ভালো হয় তাহা দেখাইবার জন্য সাহেব কতকগুলি বেশ বড়ো বড়ো পাতিলেবু লইয়া আসিয়াছিলেন, সেগুলি সভাপতির সামনে একটি ছোটো টেবিলের উপর ছিল। বক্তার কথা শেষ হইবার পর রবীন্দ্রনাথ উঠিয়া শ্রীনিকেতনে কিভাবে কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে, সেই বিষয়ে কিছু বলিলেন। সভা ভঙ্গ হইবার পর তাঁহার সঙ্গে দেখা হইল। দেখিলাম দুইটা লেবু তাঁহার হাতে রহিয়াছে। আমি প্রণাম করিবামাত্র সে দুটি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, 'এগুলো বিতরণ করব বলে এনেছিলুম, তোমাকেই দেওয়া সবচেয়ে উচিত। এই নাও, সফলতা লাভ করো।' এক-হাট লোকের মাঝে এইরূপ আশীর্বাদ পাইয়া কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া চলিয়া আসিলাম।

ফেব্রুয়ারি মাসে 'বসন্ত-উৎসব' উপলক্ষে আবার কবি কলিকাতায় আসিলেন। গানের রিহার্সাল একদিন শুনিয়া আসিলাম। আর-একদিন রবীন্দ্রনাথ ছোটো ছোটো মজলিশে নিজের নূতন ও পুরানো লেখা অনেকগুলি পড়িয়া শুনাইলেন।

বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ-সংগ্রহের কাজে প্রায়ই ঘুরিতেন। এপ্রিলের গোড়ার দিকে এইরকম এক ভ্রমণ সাঙ্গ করিয়া কলিকাতায় ফিরিলেন। দিদির সঙ্গে দেখা হওয়ায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সীতা এখন খুব লিখতে ব্যস্ত বুঝি?' 'লেখা'টা অবশ্য সাহিত্যচর্চা

হিসাবে তিনি ব্যবহার করেন নাই। খবর পাইলাম যে কাথিয়াওয়াড় বেড়াইতে গিয়া, সেখানকার মেয়েদের রঙিন সাজ দেখিয়া কবি খুব মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছেন। বাঙালির মেয়েরা খালি সাদা কাপড় পরে, দেখিতে ভালো লাগে না, বলিয়া তিনি আশ্রমের মেয়েদের বকিতেছেন। ইহার পর আশ্রমেও রঙিন কাপড়ের কিছু প্রাচুর্য লক্ষিত হইয়াছিল।

এপ্রিল মাসে আমাদের Social Fraternity প্রথম আরম্ভ হয়। এই সময় তাহার বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-উৎসব করার কথা উঠিল। প্রশান্তচন্দ্র আলিপুর মিটিয়রলজিক্যাল অফিসে কাজ লইয়া, সেইখানেই বাস করিতে আরম্ভ করাতে, স্থানাভাবে আমাদের ক্লাবটির অধিবেশন আর তেমন নিয়মিত হইত না। এইবারে আলিপুরেই উৎসবের আয়োজন হইল। রবীন্দ্রনাথ আসিবেন বলিয়া কথা দিলেন। প্রশান্তচন্দ্রের নূতন বাড়িতে সুন্দর বাগান ছিল, সেইখানেই সব ব্যবস্থা করা গেল। বাগান তো আর সাজাইবার দরকার হয় না, তবু অল্প-কিছু সাজানোও হইল, এবং মেয়েরা সকলে রঙিন কাপড় পরিয়া সাজিয়া গেলেন, কারণ কবি সাদা সাজের বিরুদ্ধে এই সময় যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যথাসময়েই আসিলেন, সঙ্গে প্রতিমা দেবী ও নন্দিনী। নন্দিনীকে সেই প্রথম দেখিলাম। ক্লাবের প্রতিষ্ঠা-দিবস যদিও, তবু ক্লাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন এমন অনেকে আসিয়াছিলেন। প্রশান্তচন্দ্রের তখন বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাঁহার পত্নী অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার ভার লওয়াতে আমি নিষ্কৃতি পাইলাম। রবীন্দ্রনাথ আমাকে দেখিয়া অনেকপ্রকার অভিযোগ করিলেন। আমি তাঁহাকে আর দেখিতে যাই না কেন? এইপ্রকার ব্যবহারের মূলে যে কোন মনোভাব আছে তাহা তিনি জানেন। মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে আমার আর জ্ঞান কতটা হইল তাহাও একবার জিজ্ঞাসা করিলেন। গল্প লেখা ভালো, না গল্প হওয়া ভালো, সেও ছিল তাঁহার একটা প্রশ্ন।

জলযোগের আয়োজন ছিল। রবীন্দ্রনাথকে কিছু খাইতে অনুরোধ করায় তিনি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, 'এইরকম করে ফাঁকি দেবার চেষ্টা বুঝি?' আমি বলিলাম, 'ফাঁকি দেবার চেষ্টা তো কিছু করছি না।' কবি বলিলেন, 'বেশ, দেখো যথাকালে যেন এ কথাটা মনে থাকে। থাকবে তো?' মনে যে থাকিবে তাহা দুই-তিনবার বলিয়া তবে তাঁহাকে কিছু খাওয়ানো গেল।

প্রোফেসর উইনটারনিজও এই উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি এই সময় আমাদের কাছে আসিয়া বসাতে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সহিত গল্প করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, আমি অন্য অতিথিদের খাওয়ার তদারক করিতে গেলাম।

গানের আয়োজন ছিল। শ্রীমতী সাহানা বসু দুই-তিনটি গান করিলেন, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংও কয়েকটি গান গাহিয়া শুনাইলেন। অতঃপর সভা ভঙ্গ করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

দিন-দুই পরে জোড়াসাঁকোয় গেলাম তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে। সেদিন ঘরে অনেক লোক, তবু জনান্তিকে দুই-চারবার রসিকতা করিলেন। মনস্তত্ত্বের জ্ঞান ক্রমেই আমার

গভীর হইতেছে কি না, সে প্রশ্ন আজো একবার শুনিলাম। ইহার পর কিছুদিনের জন্য তিনি শিলং চলিয়া গেলেন।

ফিরিয়া আসিলেন জুন মাসের মাঝামাঝি। শুনিলাম নূতন একখানি নাটক লিখিয়া আনিয়াছেন, সকলকে শুনিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন। নাটকটির প্রথম নামকরণ হয় 'যক্ষপুরী', পরে বদলাইয়া 'রক্তকরবী' নাম দেন।

নাটক পড়া হইল, পাঠান্তে একটু আলোচনাও হইল। ইহার পর অনেকে উঠিয়া গেলেন। কবি আমার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দিনক্ষণ কিছু ঠিক করেছ ?' বলিলাম, 'না।' রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তবে কি ঝগড়া করেছ ?'

আমার ভবিষ্যৎ গৃহে আমি যে তাঁহাকে একেবারেই ডাকিব না, সে বিষয়ে দেখিলাম তিনি নিশ্চিত। বলিলেন, 'বিবাহের পর মেয়েরা আর কাহারো intrusion সহ্যই করতে পারে না।'

এই সময় হইতেই 'বিসর্জন' অভিনয়ের আয়োজন চলিতে লাগিল। প্রতিমা দেবী একদিন বিকেলে চা খাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন, সেই সুযোগে রিহার্সালও দেখিয়া আসিলাম। আমার খুড়তুতো ভাই শ্রীমান হেমন্ত ও শ্রীমান অশোক দুজনেই দলে ভিড়িয়াছেন দেখিলাম। হেমন্ত গ্রামবাসী সাজিয়াছেন ও অশোক সাজিয়াছেন চাঁদপাল। রবীন্দ্রনাথ সেদিন রঘুপতির ভূমিকায় অভিনয় করিলেন। এ তাঁহার এক নূতন রূপ দেখিলাম। অভিনয় তো তাঁহাকে অসংখ্যবার করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু তাহা অভিনয় বলিয়াই প্রায় বোধ হইত না। যেন তিনি রবীন্দ্রনাথরূপে দাঁড়াইয়া নিজেরই কথা বলিয়া যাইতেছেন। কিন্তু রঘুপতির ভূমিকায় তাঁহার নূতন মূর্তি দেখিলাম। পরে অবশ্য সব বদলাইয়া গেল, রঙ্গমঞ্চে তিনি রঘুপতি না সাজিয়া সাজিলেন জয়সিংহ। আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা দুই ভূমিকাতেই তাঁহাকে অভিনয় করিতে দেখিলাম। ইহার পর আর-একদিন রিহার্সাল দেখিতে গিয়া শুনিলাম, অনেকেরই ভূমিকার অদল-বদল হইয়া গিয়াছে। রিহার্সালের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ একবার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া গেলেন, 'কী সীতা, তোমার latest কি ?' বলিলাম, 'earliest যা ছিল তাই।'

ইহারই মধ্যে মধ্যে বিশ্বভারতীর উদ্যোগে নানা স্থানে সভা-সমিতিও হইত। রামমোহন লাইব্রেরি আমাদের বাড়ির খুবই কাছে ছিল, সেখানে কিছু হইলে সর্বদাই উপস্থিত হইতাম। ২৫ অগাস্ট রবীন্দ্রনাথ এইখানে নিজের পুরানো রচনা অনেকগুলি পড়িয়া শুনাইলেন। ব্যাখ্যাও করিলেন কয়েকটি কবিতার।

অগাস্ট মাসের একেবারে শেষে এম্পায়ার থিয়েটারে 'বিসর্জন' অভিনীত হইল। রবীন্দ্রনাথ যুবক জয়সিংহ সাজিয়াই নামিলেন, যদিও বয়স তখন ৬২ বৎসর। যে-কেহ তাঁহাকে তখন দেখিয়া যুবক বলিয়া ভ্রম করিতে পারিত, এমন সতেজ চলাফেরা, দৃপ্ত কণ্ঠস্বর। রঘুপতি সাজিলেন দিনেন্দ্রনাথ। রক্তাম্বরপরিহিত তাঁহার ভৈরবমূর্তি এখনো মানসনেত্রে দেখিতে পাই। রাজা সাজিলেন রথীন্দ্রনাথ, রানী গুণবতী সাজিলেন সংজ্ঞা দেবী। আমরা যেদিন দেখিতে গেলাম সেদিন অপর্ণার ভূমিকায়

অভিনয় করিলেন মঞ্জুশ্রী দেবী, দ্বিতীয় দিনে ঐ ভূমিকায় অভিনয় করিলেন প্রীতি অধিকারী। নয়নরায় সাজিয়াছিলেন ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। গ্রামবাসীদের নৃত্যগীতগুলি অতিশয় উপভোগ্য হইয়াছিল। একটি নৃত্য মনে করিয়া এতকাল পরেও হাস্য-সংবরণ করিতে পারি না।

দুই রাত্রি অভিনয় দেখিয়াও কলিকাতাবাসীর আকাঙ্ক্ষা মিটিল না, আরো দুইদিন অভিনয়ের আয়োজন হইতেছিল, এমন সময় স্বয়ং কবি, রথীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র ইনফ্লুয়েঞ্জা বাধাইয়া শুইয়া পড়াতে অভিনয় আর হইল না।

পরিশিষ্ট

১৯২৩ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আমার বিবাহ হয়। ইহার পর বহুদিনের জন্য বাংলা ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মদেশে প্রস্থান করিলাম।

বিবাহে রবীন্দ্রনাথ আসিয়াছিলেন। আমাকে আশীর্বাদ করিয়া তাঁহার কাব্যগ্রন্থাবলী উপহার দিয়া গেলেন। প্রথম খণ্ডের প্রথম পৃষ্ঠায় দুই লাইন কবিতা লিখিয়া দিলেন। বিশ্বভারতীর কাজে তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতে হইত, তবুও বউভাতেও খানিকক্ষণের জন্য গিয়াছিলেন।

বিদেশ যাত্রার পর তাঁহার সহিত বাহিরের যোগসূত্র অনেকদিনের মতো ছিন্ন হইয়া গেল। কিন্তু অন্তরের কোনো পরিবর্তন হয় নাই। তাঁহাকে চিরদিনই দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতাম। শেষদিন পর্যন্ত আমার প্রতি স্নেহও তাঁহার অক্ষুণ্ণই ছিল, ইহাই বিশ্বাস করি। আত্মীয়স্বজনের চিঠিতে প্রায়ই তাঁহার খবর পাইতাম। সকলের নিকট হইতে অতদূরে গিয়া আমি রহিয়াছি ইহা তাঁহার ভালো লাগিত না, বাবাকে কয়েকবারই সে কথা বলিয়াছিলেন। ফিরাইয়া আনার কার্যে সাহায্য করিতেও প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা তখন দেশে ফিরিতে পারিলাম না।

১৯২৪-এর মার্চ মাসের শেষে আমি একবার কলিকাতায় আসি। বেশ অসুস্থ অবস্থায়ই আসিয়াছিলাম। আসিয়া শুনিলাম যে রবীন্দ্রনাথ বিদেশযাত্রার আয়োজন করিতে তখন কলিকাতায় আসিয়াছেন, ব্রহ্মদেশ হইয়া চীন যাইবেন। দেখা করিতে গেলাম। জোড়াসাঁকোয় তখন মহা ভিড়। রবীন্দ্রনাথ তবু কয়েক মিনিটের জন্য কাছে আসিয়া কথাবার্তা বলিয়া গেলেন। বলিলেন, আমি রেঙ্গুনে থাকিলে আমার বাড়ি গিয়া অতিথি হইতেন। আমার ভ্রাতৃজায়া সঙ্গে ছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সীতাকে কি ওখানে নাপ্পি আর ডুরিয়ান ছাড়া কিছু খেতে দেওয়া হত না? ওর চেহারা অমন হয়ে গেল কেন?' ইহার কয়দিন পরেই তাঁহারা যাত্রা করিলেন।

কয়েক মাস পরে তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন। আমার প্রথমা কন্যাটি তখন জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহাকে দেখিবার জন্য একদিন তিনি আমাদের রামমোহন রায় রোডের বাড়িতে আসিলেন। খুকিকে কোলে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার কি নাম রাখা হইয়াছে। সুদক্ষিণা নাম দেওয়া হইয়াছে শুনিয়া নাম নির্বাচনের প্রশংসা করিলেন। তাহার পর ঘুমন্ত শিশুর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'ওকে আমার হিংসে হচ্ছে, কেমন নিশ্চিন্ত আরামে আছে, বিশ্বভারতীর ভাবনা ভাবতে হয় না।' আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এত দেশ থাকতে রেঙ্গুনে গিয়ে উঠলে কি কারণে বলো তো?' কেন যে গেলাম তাহার সংগত কারণ কিছু দিতে পারিলাম না। আবার বলিলেন, 'তোমার কবিটিকে এখানে ধরে আনো-না, আমরা কি আর কাজকর্ম দিতে জানি না নাকি?

তুমি একটু প্রেসার দিলেই হয়।' অল্পক্ষণ পরে তিনি চলিয়া গেলেন।

আমিও মাস-দুই পরে আবার ব্রহ্মদেশে ফিরিয়া গেলাম। শিশুকন্যাটি বড়োই অসুস্থ হইয়া পড়িল। তাহাকে লইয়া এমন ব্যস্ত থাকিতে হইত যে আর কোনো কাজ করিবার, কোনো কথা ভাবিবার সময় থাকিত না। সমাজ-সংসার হইতে একপ্রকার নির্বাসিতই হইয়া গেলাম।

মাসের পর মাস পীড়িতা কন্যাকে লইয়া ঘরের ভিতরেই কাটিয়া যাইত, বাহিরের মানুষের মুখই একরকম দেখিতে পাইতাম না। রবীন্দ্রনাথের খবর বাড়ির চিঠি হইতে মাঝে মাঝে পাইতাম, কাগজপত্রেও পাইতাম। বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহার্থে তিনি ক্রমাগতই দেশ-বিদেশে ঘুরিতেছেন, এই খবরটাই সবচেয়ে বেশি করিয়া পাইতাম।

১৯২৭ খৃস্টাব্দে জাভা বলি প্রভৃতি ভ্রমণ সাঙ্গ করিয়া অক্টোবর মাসে যখন দেশে ফিরিতেছিলেন, তখন রেঙ্গুনে দিন-দুই-তিন থাকিয়া আসেন। আমার বাড়িতে একদিন নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। আমার পীড়িতা কন্যার কি চিকিৎসা হইতেছে তাহার খবর লইলেন ও বায়োকেমিক চিকিৎসা করাইতে উপদেশ দিলেন। আমায় বলিলেন, 'চেহারাটা অনেকখানি বদলে ফেলেছ।' তাঁহাকে বিশেষ কিছু খাওয়ানো গেল না। পাড়ার নানা শ্রেণীর নরনারী তাঁহার দর্শনলাভের জন্য উৎসুক হইয়া আসিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্তা বলিলেন।

১৯৩০ খৃস্টাব্দে ব্রহ্মদেশ-বাসের পর্ব সাঙ্গ করিয়া আবার দেশে ফিরিলাম। রবীন্দ্রনাথ তখন ইউরোপে। পূজার ছুটির সময় একবার শান্তিনিকেতনে গিয়া মাসখানিক কাটাইয়া আসিলাম। কোনার্ক-ভবনটি তখন খালি ছিল, সেইখানেই ছিলাম। রবীন্দ্রহীন শান্তিনিকেতন কেমন যেন অদ্ভুত লাগিল। দেখিলাম আশ্রমের বাহিরের চেহারা আগাগোড়াই প্রায় বদলাইয়া গিয়াছে।

১৯৩১-এর জানুয়ারি মাসে তিনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সহিত দেখাসাক্ষাৎ আর আগের মতো হইত না। নিজে তখন সংসারভারে ভারাক্রান্ত, গিয়া যে দেখা করিব সে উপায় ছিল না। কবিও বিশ্বভারতীর কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতেন। স্বাস্থ্যও তাঁহার ভাঙিয়া পড়িতেছিল, আগের মতো ঘোরাঘুরি করিতে পারিতেন না।

১৯৩১-এর ডিসেম্বরে রবীন্দ্র-জয়ন্তীর সময় কয়েকবার দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম। 'নটীর পূজা'য় ভিক্ষু উপালীরূপে তাঁহাকে দেখিয়া একটু চমকিত হইয়া গেলাম। চেহারায় তখন বার্ধক্যের আক্রমণ ফুটিয়া উঠিয়াছে, কণ্ঠস্বর কিন্তু আগেরই মতো সতেজ। টাউন-হলের অভিনন্দনের দিন দূর হইতে দেখিলাম।

১৯৩২ খৃস্টাব্দের জানুয়ারি মাসেই বোধ হয় কবি খড়দার একটি বাগানবাড়িতে বাস করিতেছিলেন। সেইখানে গিয়া একদিন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিলাম। হাঁটা-চলা করাও তাঁহার পক্ষে ক্রমেই কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে বোধ হইল। এই সময়ই বোধ হয় কলিকাতা আর্ট কলেজে তাঁহার অঙ্কিত চিত্রাবলীর একটি প্রদর্শনী হয়। তিনি তখন শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে-র অতিথিরূপে কলিকাতায়ই ছিলেন। দ্বিতীয়া কন্যাকে লইয়া দিদির

সঙ্গে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। শিশুটিকে দেখিয়া তিনি অতিশয় প্রীত হইলেন ও অনেক আদর করিলেন। সেইদিন 'নটীর পূজা' ফিল্মটি তাঁহাকে দেখাইবার জন্য নিউ থিয়েটার্সের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। নাতনীস্থানীয়া কয়েকটি বালিকা উপস্থিত দেখিয়া কবি বলিলেন, 'এদের কিছু খাইয়ে দিলে হত। আচ্ছা চলো, বায়োস্কোপ দেখিয়ে আনি।' রবীন্দ্রনাথ আমাদের সকলকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন ছবিখানি দেখাইতে। বহুকাল পরে মনে হইল, তাঁহার স্নেহ কিছুই কমে নাই, সংসারের আবর্তে পড়িয়া বাধ্য হইয়া দূরে চলিয়া গিয়াছি তাই আগের মতো এই ঐশ্বর্য প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে পারি না।

এই বৎসরই তিনি পারস্য-যাত্রা করিলেন। দমদম এরোড্রমে তাঁহার যাত্রা দেখিবার জন্য গেলাম। অনেক লোক সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সহাস্যে সকলেরই সঙ্গে বাক্যালাপ করিলেন, তাহার পর পাইলটের সাহায্যে এরোপ্লেনে উঠিয়া গেলেন। প্লেন তাঁহাকে লইয়া যখন শূন্যে উঠিল তখন মনটা একপ্রকার ভয়মিশ্রিত বিস্ময়ে ভরিয়া গেল। আকাশ-যান একবার বহু উর্ধ্বে উঠিয়া হঠাৎ যেন ঘুড়ির মতো গোঁৎ খাইয়া একেবারে গাছের ডালে আসিয়া ঠেকিল, আবার সোঁ করিয়া উপরে উঠিয়া গেল। শুনিলাম উহা নাকি এরোপ্লেনের salute, প্রথমে ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া একটু ভয়ই পাইয়া গিয়াছিলাম। শ্রীমতী প্রতিমা দেবী ও শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী তাঁহার সঙ্গে গেলেন। পারস্য হইতে তিনি জুন মাসে ফিরিয়া আসেন। নানা উপলক্ষে কলিকাতায় কয়েকবারই আসেন, দুই-একবার তাঁহার সাক্ষাৎলাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল। ডিসেম্বর মাসে প্রফুল্ল-জয়ন্তীতে তাঁহাকে সভাপতিরূপে দেখিতে পাইলাম।

১৯৩৪ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে 'চণ্ডালিকা' অভিনয় দেখিতে গেলাম। রবীন্দ্রনাথ সমস্ত নাটকটি পড়িয়া শুনাইলেন। রামমোহন-শতবার্ষিকীতে একদিন তাঁহার বক্তৃতা শুনিলাম। দাঁড়াইতে বা বেশি হাঁটিতে এই সময় তিনি কষ্টবোধ করিতেন, বসিয়াই বক্তৃতা দিলেন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ইংরেজিতে তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম অবাঙালি শ্রোতাদের বুঝাইয়া দিলেন। এই বৎসরেরই বিভিন্ন সময়ে, 'দুই বোন' 'মালঞ্চ' ও 'বাঁশরী' এই তিনটি রচনা করেন ও কলিকাতাবাসী ভক্তদের পড়িয়া শোনান। কলিকাতায় আসিলে এই সময় প্রায়ই তিনি প্রশান্তচন্দ্রের বরানগরের বাড়িতে বাস করিতেন। সেখানে যাওয়া সহজ ছিল না, তবে ঐ তিনটি রচনা শুনিতে গিয়াছিলাম।

১৯৩৫ খৃস্টাব্দের শেষে কলিকাতায় 'রাজা' অভিনয় হয়। ৭৪ বৎসর বয়সেও তিনি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন। ঠাকুরদাদারূপে, আড়াল হইতে 'রাজা'র ভূমিকায়ও অভিনয় করিলেন। ইহার পর তিনি বোধ হয় আর অভিনয় করেন নাই। ১৯৩৬ খৃস্টাব্দে নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে যখন 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনীত হইল তখন তিনি স্টেজে আসিয়া বসিয়াছিলেন বটে, তবে অভিনয়ে কোনো অংশগ্রহণ করেন নাই।

এই সময় বিশ্বভারতী-সম্মিলনী নাম দিয়া বিচিত্রা-ভবনে আবার একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম। ১৯৩৭ খৃস্টাব্দের শেষের

দিকে যে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন তখন হইতে স্বাস্থ্য তাঁহার একেবারেই ভাঙিয়া পড়িল। আরো যে চার বৎসর ভগবান দয়া করিয়া তাঁহাকে আমাদের মধ্যে রাখিয়াছিলেন, সে চার বৎসর অনেকাংশেই তাঁহাকে রোগীর মতো কাটাইতে হইয়াছিল। অসাধারণ মানসিক শক্তি তাঁহার ছিল, তাই কাজ করিয়া যাইতেন, মধ্যে মধ্যে সভা সমিতিতেও উপস্থিত হইতেন। কিন্তু দেশবাসীর নিকট হইতে তিনি অনেকদূরে চলিয়া গেলেন, তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া ক্রমেই অসম্ভবের পর্যায়ে গিয়া পড়িল। আমরা পূর্বকালে তাঁহার ঘরের মানুষের মতো ছিলাম, যখন ইচ্ছা হইয়াছে তাঁহার কাছে গিয়াছি, কখনো বাধা তো পাইই নাই, সাদর অভ্যর্থনাই পাইয়াছি। কিন্তু ক্রমে দেখিলাম অবস্থার সহিত ব্যবস্থার পরিবর্তন হইতেছে। এত বিধিনিষেধের গণ্ডি এড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতে যাওয়ার মধ্যে কোনো আনন্দ পাইতাম না। দুই-একবার চেষ্টা করিয়া দূরেই সরিয়া গেলাম। তিনি ইহা লক্ষ করিয়াছিলেন কি না জানি না, করিলেও এ বিষয়ে কি ভাবিয়াছিলেন তাহা জানিবার সুযোগ হয় নাই। তবে কালেভদ্রে কখনো যদি হঠাৎ কাছে গিয়া পড়িতাম, মনে হইত তিনি আনন্দিতই হইয়াছেন, আগেরই মতো আদর করিতেন, আগেরই মতো রসিকতা করিতেন। যে দেবদুর্লভ ঐশ্বর্য একদিন আমাদের ছিল, বিশ্বাস করি শেষের দিন পর্যন্ত তাহা হইতে বঞ্চিত হই নাই; তবে অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ছিল না, তাই সাক্ষাৎভাবে মনপ্রাণ দিয়া আর তাহা অনুভব করিতে পারি নাই।

বিশ্বভারতী-সম্মিলনীর কয়েকটি অধিবেশনে গিয়াছিলাম মনে আছে। কিন্তু বাল্যকালের ডায়েরি লেখার অভ্যাস উত্তরজীবনে আর রাখি নাই, কাজেই কবে কি হইয়াছিল তাহা বলিতে পারিব না। গীতবাদ্য-নৃত্যাদি কয়েকবার হইয়াছিল। শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েরাই এ-সব বেশির ভাগ করিত, কলিকাতার দুই-চারিজনও কিছু কিছু করিয়াছিলেন। একদিন রবীন্দ্রনাথ 'ছেলেবেলা' হইতে অনেকখানি পড়িয়া শুনাইলেন। আমার দ্বিতীয়া কন্যাকে সেদিন লইয়া গিয়াছিলাম, তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, 'এটি যে কার মেয়ে তা আর বলে দিতে হবে না।'

আর-একদিন নূতন কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন। শ্রীযুক্ত জওয়াহরলাল নেহরু একদিন অধিবেশন আরম্ভ হইবার ঠিক আগেই তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। সেদিন আমরাও কিছু আগে গিয়াছিলাম তাঁহার সহিত দেখা করিবার আশায়। বিচিত্রার দোতলার একটি ছোটো ঘরে তিনি বসিয়াছিলেন, সেখানে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই দুই-চারিটি কথা বলিতেছি, এমন সময় একজন আসিয়া খবর দিলেন, যে সভার সময় প্রায় হইয়া আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'সীতা, আমাকে এইবার সাজতে হবে। ভেবো না যে সাজসজ্জা তোমাদেরই দরকার, আমাদেরও দরকার।' আমরা তো চলিয়া আসিলাম, কিন্তু ঠিক সেই সময় পণ্ডিত নেহরু আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় কবির সাজসজ্জার আরো দেরি হইয়া গেল বোধ হয়।

আর-একদিন গিয়াছিলাম দেখা করিতে, উপলক্ষটা কি ছিল মনে নাই। সেদিনও দেখিলাম বিচিত্রার উপরের একটি ছোটো ঘরে বসিয়া আছেন, অবনীন্দ্রনাথ কাছে বসিয়া।

ঘরে যথেষ্ট চেয়ার ছিল না বলিয়া আগেরই মতো ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সেদিন অতিরিক্ত অতিথিসমাগম না কি সকাল হইতেই চলিতেছিল। তাঁহাদের ভিতর অনেকগুলির সহিত সাক্ষাৎ করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, অথচ তাঁহার সেক্রেটারিরা ভাবিয়াই পাইতেছিল না যে, কি ছুতায় তাঁহাদের বিদায় করা যায়। অবনীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'মিথ্যে কথা বলবার জন্যে তোমাদের রাখা, তাও একটু গুছিয়ে বলতে পার না?'

কবির রচনাবলীর কথা উঠিল। এ সম্বন্ধে ভালো একখানা বই কেহ লেখে নাই বলিয়া কালিদাসবাবু দুঃখ করিতেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'দাঁড়াও-না, যাবার সময় যা-কিছু লিখেছি সব সঙ্গে করে নিয়ে যাব, দেখি তোমরা কি কর।'

১৯৩৯-এর ডিসেম্বরে ৭ই পৌষের উৎসবে একবার শান্তিনিকেতনে গেলাম। ১৯৩০-এ ব্রহ্মদেশ হইতে ফিরিয়া একবার সেখানে গিয়াছিলাম, তাহার পর এইবার। কবির স্বাস্থ্য অতি দুর্বল দেখিলাম। তখন 'পুনশ্চ' নামক ছোটো একতলা বাড়িটিতে বাস করিতেছিলেন, 'উদীচী' সবে শেষ হইয়াছে। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, কানেও ভালো শুনিতে পান না দেখিলাম। এখানে আসিয়াই শুনিলাম, বেশি লোকজন গিয়া ভিড় করিলে কবি বিরক্ত হন। ভাবিলাম, সে যাহাই হউক, তাঁহাকে দেখিতেই যখন আসিয়াছি, তাঁহাকে না দেখিয়া যাইব না। ৬ পৌষ দুপুরবেলা গেলাম তাঁহার কাছে। মুখ তুলিয়া তাকাইলেন— ঘরটি প্রায় অন্ধকার, মনে হইল যেন চিনিতে পারিতেছেন না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমাকে চিনতে পারছেন না?' কণ্ঠস্বরেই চিনিলেন, রসিকতা করিয়া বলিলেন, 'আয়তনে চিনছি।' আমি বলিলাম, 'আমার চেয়ে বিপুলায়তন মানুষ তো অনেকগুলিই আপনার এখানে দেখলাম।'

তাহার কয়েকদিন আগেই তিনি মেদিনীপুর ভ্রমণে গিয়াছিলেন, খানিকক্ষণ তাহারই গল্প করিলেন। মেদিনীপুর ও মেদিনীপুরবাসীদের তাঁহার খুব ভালো লাগিয়াছে বলিলেন। বাঙালি শহুরে ছেলেদের কিঞ্চিৎ নিন্দা করিলেন।

৭ই পৌষ সকালে তিনিই মন্দিরে উপাসনা করিলেন। এই শেষ তাঁহার উপাসনা শুনিলাম। বিকালের গাড়িতে চলিয়া আসিতেছিলাম, ভাবিলাম দুপুরে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া আসি, না হইলে সময় হইবে না। সকালে তিনি নূতন বাড়ি 'উদীচী'তে উঠিয়া গেলেন, ঠিক উপাসনার পরেই। দৈহিক দৌর্বল্য উপেক্ষা করিয়া নিজেই হাঁটিয়া উপরে উঠিলেন দেখিলাম। সকাল হইতেই লোকের ভিড়, শুনিলাম ক্রমাগত তাঁহার কাছে মানুষ গেলে হয়তো বিরক্ত হইতে পারেন। ভাবিলাম যাইয়াই দেখা যাক, কখনো তো আদর বৈ অনাদর তাহার কাছে পাই নাই, না হয় এবার বকুনিই খাইয়া আসিব। আমি ও আমার ভ্রাতৃজায়া গেলাম। উদীচীর বারান্দায় তখন বসিয়াছিলেন, হাসিয়াই বসিতে বলিলেন। আমাকে বলিলেন, 'পালাচ্ছ বুঝি? খুব জব্দ হয়েছ তো ভিড়ের মধ্যে এসে? আমি কিছু জানি নে বাপু, যেমন এসেছ বিনা নেমন্তন্নে।' আমার ভ্রাতৃজায়াকে বলিলেন, 'কলকাতায় আবার 'চিত্রাঙ্গদা' হবার কথা হচ্ছে, তুমি সাজবে চিত্রাঙ্গদা?' আমি হাসাতে বলিলেন, 'সীতা, এরকম করে হাসা বড়োই অসৌজন্যের পরিচায়ক, আমি সিরিয়সলিই

বলছি।' বেশিক্ষণ কথা বলিলে ক্লান্ত হইয়া পড়িবেন, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম। অ্যান্ড্রুজ সাহেবকে এইখানে দেখিলাম। আমাকে দেখিয়া খুশি হইয়া সকলের খবর লইলেন, ও আমাদের সঙ্গে শ্রীনিকেতনে বেড়াইতে গেলেন। শান্তিনিকেতনের চেহারা দেখিয়া বুঝিলাম, সেই পুরানো দিনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নাই। পুরাকালের অধ্যাপকদের ভিতরেও বিশেষ কেহই আর সেখানে নাই, দুই-তিনজন ছাড়া। বিকালের গাড়িতে চলিয়া আসিলাম। ডিসেম্বরের শেষে তাঁহার নাতনী নন্দিনীর বিবাহে নিমন্ত্রিত হইলাম, কিন্তু নানা বাধা পড়ায় তখন আর যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না।

১৯৪০ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ কালিম্পঙে গিয়া দারুণ পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসা হইল চিকিৎসার জন্য। শিয়ালদা স্টেশনে গেলাম একবার দেখিতে পাইবার আশায়, কারণ একবার বাড়িতে গিয়া পৌঁছিলে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া আমাদের পক্ষে একরকম অসম্ভবই হইবে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। স্টেশনে লোক খুব বেশি হয় নাই, বোধ হয় কখন কোন ট্রেনে তিনি আসিবেন তাহা বিশেষ কেহ জানিতে পারেন নাই।

দার্জিলিং মেলে তিনি আসিলেন। স্ট্রেচারে করিয়া বহন করিয়া তাঁহাকে বাহিরে আনা হইল। স্টেশনের কর্তৃপক্ষগণ যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছেন দেখিলাম। তখন তাঁহার জ্ঞান হইয়াছে, নিজের হাত দিয়া একবার মুখ আড়াল করিলেন। অ্যাম্বুল্যান্সের গাড়িতে করিয়া তাঁহাকে জোড়াসাঁকোতে লইয়া যাওয়া হইল। আমরাও জোড়াসাঁকো পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। বাড়ির উঠানে যখন রবীন্দ্রনাথকে স্ট্রেচারে করিয়া গাড়ি হইতে নামানো হইল তখন সকলের দিকে একবার তিনি তাকাইয়া দেখিলেন। চিনিতে পারিলেন কি না ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। এইখানেই কয়েকদিন থাকিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হওয়ার পর তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া গেলেন।

১৯৪১ খৃস্টাব্দে নববর্ষের উৎসবের সময় মেয়েদের লইয়া একবার শান্তিনিকেতনে গেলাম। রবীন্দ্রনাথকে তাহারা একটু ভালো করিয়া দেখুক এই ইচ্ছা লইয়াই গিয়াছিলাম। তাঁহাকে আমিও বহুদিন দেখি নাই, দেখিয়া আসিব। তিনি তখন আর বাহিরে আসিতে পারেন না, দেখা করাও অতি কঠিন, তবু গায়ের জোরে বাধা কাটাইয়াই গেলাম, কারণ কতদিন আর তাঁহাকে ভগবান আমাদের মধ্যে রাখিবেন সেই বিষয়েই সন্দেহ ছিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তাঁহার ঘরে গেলাম। আমাদের দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কানে তখন খুব কম শোনেন, চোখেও বিশেষ ভালো দেখেন না, তবু অনেকক্ষণ গল্প করিলেন। দিদির বড়ো মেয়েকে দেখিয়া বলিলেন, 'তোমার মাও এত লম্বা নয়, তোমার বাবাও এত লম্বা নয়, তোমার দাদামশায়ও এত লম্বা নয়, তুমি এত লম্বা কি করে হলে?'

মহাত্মা গান্ধী ও মার্শাল চিয়াং কাই শেকের অভিনন্দনসূচক টেলিগ্রাম এই সময় আসিল। গান্ধীজির টেলিগ্রামটির একটি রসিকতাপূর্ণ উত্তর তখনি-তখনি দিয়া দিলেন।

তাঁহার সেক্রেটারি কি কাজের কথা বলিতে আসাতে তাঁহাকে বলিলেন, 'সৎসঙ্গ ভাগ্যে মেলে, এখন এঁদের সঙ্গে আলাপ করছি।' আমাকে বলিলেন, 'এই দেখো, তোমাদের নিয়েই তো যত বিপদ, তোমরা ভীম নাগের সন্দেশ খাবে, না দ্বারিকের সন্দেশ খাবে, তাই এখন আমাকে ঠিক করতে হবে।'

বেশিক্ষণ কথা বলিয়া পাছে ক্লান্ত হইয়া পড়েন এই ভয়ে আমরা খানিক পরেই চলিয়া আসিলাম।

পরদিন নববর্ষে তাঁহার জন্মোৎসব। বিকালের দিকে উদয়নের সম্মুখের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে উৎসব হইল। নৃত্যগীতগুলি অতিশয় মনোহর হইয়াছিল। শারীরিক অসুস্থতা ও দুর্বলতা উপেক্ষা করিয়া রবীন্দ্রনাথ বাহিরে আসিয়া বসিলেন এবং শেষ পর্যন্ত বসিয়াই রহিলেন। অভিনন্দনের উত্তরে মুখে কিছু বলিলেন। যে কণ্ঠস্বর তূর্যনিনাদের মতো সহস্র সহস্র লোকের কর্ণে গিয়া বাজিত, বিশালতম জনসমাগমেও যাহা কখনো হার মানিত না, আজ তাহা ক্ষীণবল, কয়েক গজ দূরে বসিয়াই তিনি কি বলিতেছেন তাহা শুনিতে পাইলাম না। 'সভ্যতার সংকট' ক্ষিতিমোহনবাবু পড়িয়া শুনাইলেন।

উৎসবান্তে তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলাম। তখনো ঘরে যান নাই, বাহিরেই বসিয়াছিলেন। বৈশাখ মাসের 'প্রবাসী'তে আমার একটি লেখা বাহির হইয়াছিল—১৯১১ খৃস্টাব্দে তাঁহার জন্মোৎসবের বিবরণ। ইহারই মধ্যে সেটি পড়িয়া ফেলিয়াছেন দেখিলাম। আমি কাছে যাইতেই হাসিয়া বলিলেন, 'সীতা, কী-সব বাজে কথা লিখেছ বল দেখি? আমি নাকি তোমাদের আনতে স্টেশনে গোরুর গাড়ি পাঠিয়েছিলুম? ছি ছি, কি লজ্জার কথা!' আমি বলিলাম, 'গোরুর গাড়ি ছাড়া আপনার আর কিছু তখন ছিল না তো, কি পাঠাবেন? বাজে কথা আরো ঢের জমা হয়ে আছে, পরে লিখব।' বলিলেন, 'ও বাবা! আরো লিখবে নাকি?'

ইহজীবনে শেষ এই তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিলাম। বিধাতা মানুষের কাছে ভবিষ্যৎ অন্ধকারই রাখিয়াছেন, তাই নিজের জীবনের একটা দিকের উপর যে শেষ যবনিকা পড়িল, তাহা না বুঝিয়া, প্রফুল্লচিত্তেই তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। রাত্রে তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষে আশ্রমের ও শ্রীনিকেতনের সকলকে খাওয়ানো হইল। ভোররাত্রের ট্রেনে আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

তাহার পর আর কিই-বা লিখিব! শেষ বিদায়ের স্মৃতি যে বেদনাময় রেখায় হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে তাহাকে ভাষা দিয়া প্রকাশ করিতে পারি এমন ভাষা কোথায়? অস্ত্রোপচার হইবার পর দুইদিন জোড়াসাঁকোয় গিয়াছিলাম। প্রথমদিন শুনিয়া আসিলাম তিনি ভালোই আছেন, অস্ত্র করায় উপকার হইয়াছে। হঠাৎ অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে শুনিয়া আবার যেদিন গেলাম সেদিন বুঝিতেই পারিলাম, ডাক আসিয়াছে, আর দেরি নাই। তবু মন সে কথা বুঝিতে চাহিল না। এই পৃথিবীতে আমরা সকলেই থাকিব, অথচ তিনি থাকিবেন না, ইহা কখনো কল্পনা করি নাই, তাই তখনো যাহা নিশ্চিত বলিয়া বুঝিলাম তাহা জোর করিয়া বিশ্বাস করিলাম না। রোগীর ঘরের দ্বারের কাছে গিয়া দেখিলাম,

তন্দ্রাচ্ছন্ন মূর্তি, যেন ঘুমাইয়া রহিয়াছেন।

শেষদিন সকালে জোড়াসাঁকো হইতে ডাক আসিল, আর দেরি নাই। যাইতে পা উঠিতেছিল না, কিন্তু না যাইয়াই বা থাকিব কি করিয়া? দিদিদের সঙ্গে গেলাম। তাঁহার ঘরের সামনে যাইতে বা ভিতরে যাইতে আজ আর কোনো বাধা নাই। দ্বারের সমুখে দাঁড়াইয়া একবার ভিতরের দিকে চাহিলাম। অনন্তধামযাত্রীর সে মূর্তি সহ্য করিতে পারিলাম না, ছুটিয়া চলিয়া আসিলাম।

তিনি চলিয়া গেলেন। শেষ অবধি বিশ্বাস ছিল যে অলৌকিক কিছু ঘটিয়াও তিনি থাকিয়া যাইবেন, আমাদের ত্যাগ করিবেন না। বিধাতা সে বিশ্বাস ভাঙিয়া দিলেন। সূর্যহীন পৃথিবী যেমন মানুষ ধারণা করিতে পারে না, রবিহীন বঙ্গভূমি আমরা তেমনি কখনো কল্পনা করি নাই। কিন্তু তাহারই ভিতর তো বাস করিতেছি। তিনি কোথাও নাই, ইহা বিশ্বাস তো হয় না, কিন্তু কোথায় আছেন ব্যাকুল মন তাহার সন্ধানও পায় না।

বাল্যকালে ভাবিতাম ভগবান বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের মতো দেখিতে। এখন জীবনের অনেক পথ মাড়াইয়া আসিয়াছি, তবু সেই শৈশবের বিশ্বাস যেন নূতন একটা রূপ ধরিয়া মনে জাগিয়া আছে। তাঁহার দর্শন আর কোথাও মিলিবে না এ বিশ্বাস কিছুতেই হয় না; ভাবি, যে ভগবানের ভিতর তিনি বিলীন হইলেন, তাঁহারই মধ্যে আমাদের চিরপরিচিত সেই দিব্য জ্যোতির্ময় মূর্তিতে আবার তাঁহাকে দেখিতে পাইব।

রবীন্দ্রকথা

গ্রন্থ

রচনা

পত্রিকা

ইংরেজি গ্রন্থ, রচনা ও পত্রিকা